এবং
জলবাংলার
মনচিত্র

অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য

দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশ : আগস্ট ১৯৬২

প্রকাশক : সানুশ্রী ভট্টাচার্য
পোঃ—বালি-দুর্গাপুর

মুদ্রক : গীতা প্রিন্টার্স,
২১, পঞ্চানন ঘোষ লেন,
কলকাতা-৯।

প্রচ্ছদ : দোলা বসুরায়

স্বত্ব : অধ্যাপিকা সানুশ্রী ভট্টাচার্য
পোঃ—বালি দুর্গাপুর
জিলা—হাওড়া

এবং

জলবাংলার

মর্নাচিত্র

মা-কে

—সূচীপত্র—

।। বলতে চাই ।।

কিছু কিছু ঋণ আছে যা শোধ করা যায় না। এই বইটির কল্পজন্ম-মুহূর্ত থেকে ছাপার পাঠ্য আলোর প্রকাশ দিনটি পর্যন্ত আমি অনেকের কাছেই অনেক অনেক ঋণ করে ফেলেছি। অপরিশোধ্য বলেই তা আনন্দের। রামেশ্বর-হেমলতা (স্মরণে), সুনীল-সমীর, সানুশ্রী-কৃষ্ণা এবং শ্রীজয় (বাস্তবে) —এদের কথা না বললেও অমৃষা পুবালি আর উপালির কথা বলতেই হবে। আর না বলে পারি না গীতা প্রিন্টার্স-এর অরুণের কথা। কিন্তু বলব না, কারণ কিছু বললেই তা অসম্পূর্ণ বলা হয়ে যাবে।

লেখক যা ইচ্ছে তাই লিখতে পারেন। সেসব যাচ্ছেতাই কিনা তা পাঠকের মূল্যায়নে স্থির হয়। লেখার কাজ শেষ হলেই কান পাতার সময় আসে। কান পেতেই থাকব।

চেষ্টা করে যদি সিদ্ধি লাভ নাই হয় তাহলে আমার দোষ কোথায়?

অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য

সংযোজন :

ভূমিকা লিখে দিতে কার কাছে যাব—এই ভাবনা এবং (আমার মতো অপরিচিত জনের কাছে) দুর্ভাবনার জটাজাল থেকে যিনি আমাকে মুক্তি দিলেন তিনি, সদাশয় শ্রীশৈবাল মিত্র মহাশয়; আমাকে ঋণীও করে দিলেন কাছেও টেনে নিলেন। তাঁর কথা কি ভাবে বললে ঠিক বলা হয় তা বুঝছি না বলেই থেমে গেলাম।

অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য

।। ভূমিকা ।।

নিত্য যাতায়াতের চেনা পথের ধারে হঠাৎ একদিন ফুলে বোঝাই একটা গাছ চোখে পড়লে যে কেউ থমকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবে, কোথা থেকে এলো এই গাছ ? কিভাবে দৃষ্টি এড়িয়ে পুষ্পাকীর্ণ হলো ? আরও পাঁচটা গাছের মতো সদ্য আবিষ্কৃত গাছটির জন্ম, বিকাশ, সমৃদ্ধির ইতিহাসও যে একই মৌলিক নিয়মের অংশ, অনুভব করতে পারে। আলো, জল, মাটি বাতাস থেকে রসদ সংগ্রহ করে গন্ধে রঙে উদ্ভাসিত গোলাপ, চাঁপা, বেল, যুঁই-এর মতো পথের ধারে অজান্তে ফুটে ওঠা ফুলগুলিও যে একই উপাদান জোগাড় করে আত্মপ্রকাশ করেছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না।

অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য-এর 'এবং জলবাংলার মনচিত্র' গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলি পাঠের সময়ে আচম্বিতে পুষ্পভারাবনত একটি গাছ আবিষ্কারের রোমাঞ্চ জাগলো। রচনাগুলি গল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, বিশুদ্ধ স্মৃতিকথা অথবা ব্যক্তিগত গদ্য নয়। জাতি নির্ধারণে শুরুতে কিছুটা বিভ্রম হলেও অল্পক্ষণে টের পেলুম সম্ভবত নিজের অগোচরে লেখক, এমন এক শৈলী উদ্ভব করেছেন, যার মধ্যে সাহিত্যের পরিচিত আঙ্গিকগুলির প্রায় সব লক্ষণ মিশে স্বতন্ত্র এক অবয়ব গড়ে তুলেছে। পাশাপাশি আছে লেখকের জীবন দর্শন। হয়তো পাশাপাশি নয়। রচনার গভীরে অন্তঃশীলা স্রোতের মতো যে জীবনদর্শন নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহিত হয়েছে, তার মূলকথা হলো নিসর্গমুগ্ধতা, বিশ্বচরাচর সম্পর্কে প্রগাঢ় অনুরাগ।

রচনাগুলি বাহ্যত স্মৃতিকাতর, অতীতচারী মনে হলেও, বস্তুত তা নয়। অর্ধেন্দুবাবু জানেন জীবনের অন্যনাম গতি।

"...তাই লেখার মধ্যেও সেই গতি। দ্রুত ধেয়ে চলার পদধ্বনি। অপেক্ষা নেই, চারদিকে দৃকপাত নেই। নদীর যেন প্রবাহটাই সত্যি, জলটা যেন আর ততটা প্রয়োজনীয় নয়। বিষয় যাই হোক, উত্থাপনটাই প্রধান।" (বাল্যকাল)। বিষয়ে, বিন্যাসে রচনাগুলিতে ফুটে উঠেছে শৈশব থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, উপলব্ধির নিগূঢ় উচ্চারণ।

পঞ্চাশ বছর আগেও যে অবিভক্ত বঙ্গভূমি, দৃঢ়োপিনদ্ধ যৌথ পরিবার, বিস্তীর্ণ প্রকৃতির কোলে লালিত শৈশব, কৈশোর বিদ্যমান ছিল, সেই পটভূমির পরিবর্তন ঘটেছে। শিউলি ফুলের সুবাসের মতো বাতাসে লেগে আছে বিলুপ্ত সময়ের স্মৃতি। স্মৃতিতেও রূপকথার আদল। সেখানে তিনটি কড়ির মূল্যে নাপিতানীর কাছে সন্তানকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। হস্তান্তরিত শিশুকে আবার একই দামে মা কিনে নেন।

অর্ধেন্দুবাবুর স্মৃতিচারণায় দার্শনিকতার সঙ্গে আছে সরসতা, সারল্য। নিসর্গপ্রকৃতির সৌন্দর্য, বিশেষ করে বর্ষণ সিক্ত আলোছায়াময় প্রতিটি মুহূর্ত তিনি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন। জলজঙ্গলের অন্তরাত্মাকে তিনি স্পর্শ করেছেন। এবং জলবাংলার মনচিত্র সম্ভবত অর্ধেন্দুবাবুর প্রথম প্রকাশিত রচনা সংকলন। প্রথম হলেও পরিণত, পোক্ত রচনা। পাকা লাঠিয়ালের মতো পয়লা আঘাতেই তিনি প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করেছেন। তাঁর নৈপুণ্যে পাঠক যে বিমোহিত হবেন, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

শৈবাল মিত্র

॥ পূর্বাভাষ ॥

সচেতনে বা অবচেতনে আবেশময় প্রকৃতির রসে সম্পৃক্ত হয়নি এমন বাঙগালীমনন সংখ্যায় সম্ভবত নগণ্য। আর সে পটভূমি যদি হয় পূর্ববাংলার দিগন্ত প্রসারী পরিবেশ প্রতিবেশ এবং মনীষা যদি হয় সৃজনমুখী-সংবেদনশীল তবে সেখানে ঘটে যায় মণিকাঞ্চনযোগ। পড়ন্ত বয়সের উজান পেরিয়ে'লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর'-এর অবরুদ্ধ সীমানার ওপারে লেখক অনায়াসে ফিরে গেছেন তাঁর শিল্পচেতনার সূর্যোদয়ের দেশে। সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দার্শনিক অভিজ্ঞার অমিত আলোকে তিনি স্পর্শ করতে চেয়েছেন তাঁর বাল্য-কৈশোরের চলমান জীবনকে যা ছিল হর্ষ-বেদনা-ভয়-দুরন্তপণার কৌতূহলমথিত এক বিশাল রহস্যময় সাম্রাজ্য। সেখান থেকে তুলে আনা কিছু সোনালী ফসলের সম্ভার নিয়ে এই বইটির আত্মপ্রকাশ। এর ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে থাকা মুক্তোর ঝিলিক পাঠককে আকৃষ্ট করবে। আর বাংলার সেই মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে যাঁরা কোনও সূত্রে সম্পর্কিত তাঁরা নতুন করে নিজেদের খুঁজে পাবেন; কারণ 'সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে।'

নীরস পাষাণের মধ্যেও রসের সঞ্চার করতে শিল্পী সাহিত্যিকের কৃতিত্ব সর্বস্বীকৃত। বর্তমান লেখকের বিষয় অন্য, কাল পৃথক এবং প্রেক্ষিত ভিন্নতর। রসসৃষ্টির নিরিখে তিনি চিরন্তনের পাষাণে নিজের আখর চিহ্নিত করেছেন নিঃসন্দেহে।

সুনীল আচার্য

।। লেখক পরিচিতি ।।

অর্ধেন্দু শেখরের জন্ম পূর্ববাংলার প্রত্যন্ত এক গ্রামে যেখানে আদরে ও উপেক্ষায় কেটেছে তাঁর দুরন্ত বাল্যকাল যৌথ পরিবারের বিচিত্রতাপ ও সন্তাপের আকর্ষণ-বিকর্ষণে। সেখানে খেলার মাঠ-প্রান্তর জাঙ্গাল-নদী আর ফলন্ত ফসলের উদার ক্যানভাসে নিকট দূরের সকলেই তাঁর মননে ফেলেছে গভীর ছাপ। কৈশোরে তিনি পরবাসী অংকন শিল্পী হবার একাগ্র প্রত্যাশায়, কিন্তু স্থানীয় ও পারিবারিক দুর্যোগের যুগপৎ আক্রমণ নান্দনিক জগৎ থেকে উৎপাটিত করে তাঁকে সরাসরি নিক্ষিপ্ত করে কোলকাতায় এবং পরে সেখান থেকে ঢাকায়। শূন্য পুঁজি নিয়ে জীবিকার সন্ধানে এক উদ্যোগ থেকে ভিন্নতর উদ্যোগের বাস্তব পটভূমিতে আশানিরাশার টানাপোড়েনে যথার্থ অবলম্বনের সন্ধানে তিনি তখন অস্থির। সেই সময় রাষ্ট্রবিপ্লবের বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝায় তাঁর জীবনধারা প্রবাহিত হয় ভিন্নতর খাতে। বৃদ্ধ পিতামাতা আর নাবালক ভ্রাতা ভগিনীরা সদ্য স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গে যাতে ছিন্নমূল আশ্রয়প্রার্থীর ভিড়ে অনেকের মত নিঃশেষে হারিয়ে না গিয়ে উন্নত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয় তার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার সতেরো বছরের এই তরুণকে নিতে হয় নিজস্কন্ধে। সেই কর্তব্য কঠোর ভাবে পালন করার পথে আর কোনও দিকে ফিরে তাকাবার ফুরসত তাঁর মেলেনি। ভিতরের ও বাইবের পর্বত প্রমাণ বাধাবিঘ্নকে সরিয়ে সরিয়ে এক অবস্থান থেকে উন্নততর অবস্থানে উত্তরণের অবিরাম যে ঘটনাপুঞ্জ তাঁর দৃঢ়চিত্ত যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের দিনগুলিকে সতত দুর্বার গতিসম্পন্ন করে রেখেছিল সেই পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর-পন্হার অনুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত অন্যতর এক প্রসঙ্গ! কিন্তু মানসিক ভাবে সুস্থিত হতে হতে আর না হতে হতে সময় তাঁকে পৌঁছে দেয় বার্ধক্যের মধ্যপর্বে যখন সরকারী কলেজের কৃতি অধ্যাপক হিসেবে তাঁর অবসর গ্রহণের সময় সমাসন্ন। আর এই পর্যায়েই তাঁর কোমল শিল্পীমনে সুদীর্ঘদিন ধরে জমে ওঠা বিচিত্র অনুভবগুলো প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সাহিত্যকেই অবলম্বন করে নেয়। অধুনা সুখ্যাত এক সাপ্তাহিকে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে, এবং অতঃপর আরও হতে থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস, কারণ অমৃতের সন্ধানে আজও তিনি এক ক্লান্তিহীন তরুণ পথিক। সাহিত্যের

অঙ্গনে অধ্যাপক অর্ধেন্দু শেখরের প্রবেশ বিলম্বিত অবশ্যই, কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। ঘটনার ঘনঘটা যদিও তাঁকে তাড়িত করেছে স্থান থেকে স্থানান্তরে যখন মাঝে মাঝেই ঘটেছে তাঁর আকস্মিক প্রান্তবদল, তবুও তাঁর শিল্পীসত্বা প্রত্যয়ের বর্তিকায় ভাস্বর হয়ে অনুশীলনে অর্জিত অভিধার ধারায় সুস্নাত হতে হতে সর্বদাই সৃষ্টিশীল থেকেছে তাঁর অন্তরের নিভৃত উপত্যকায়।

তাঁর রচনায় সমান গুরুত্বে উন্মোচিত একদিকে হৃদয়সঞ্জাত সূক্ষ্ম আবেগ অনুভূতি অন্যদিকে মেধানির্দেশিত শানিত বিচারবোধ। আর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির সবুজ, আকাশের নীল, পাখির গান এবং বাতাসের মৃদু ব্যজন। ছোট ছোট স্পর্শের মতো। (এবং জলবাংলার মনচিত্র। নারীর স্নেহ-বিশ্বাস-ভালবাসার প্রেরণা আশ্চর্য যাদুমন্ত্রের মত কি ভাবে পুরুষকে ও পরিবারকে সমৃদ্ধ করে তোলে তা যেমন তাঁর লেখায় উদ্ভাসিত, পুরুষ শাসিত সমাজে অত্যাচারিত নারীর যন্ত্রণার কথাও তেমনি তাঁর গল্পে নিপুণ-ভাবে বিধৃত। (এবং তুমি, এবং প্রেম-অপ্রেম)। আবার ভোগ্যপণ্যবাদী সামাজিক প্রেক্ষাপটে শূন্যগর্ভ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আত্মিক বিপন্নতার বিষয়টিও বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর লেখায় মর্মস্পর্শীভাবে বিশ্লেষিত। (এবং ভাঙ্গাকুলো ; দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও আমরা)। এমন কি যখন তিনি ছোটদের জন্য সাবলীল রচনায় মগ্ন তখনও মনে হয় একই সঙ্গে তিনি বড়দের বোধকেও প্রোজ্জ্বল করে তোলেন (এবং ভূত)। আন্তরিকতা ও সংবেদনশীলতার সার্থক মেলবন্ধন সর্বক্ষেত্রেই তাঁর উপস্থাপনাকে রসগ্রাহী করে তুলেছে যা আমাদের মত সাধারণ পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করে। জড়তামুক্ত প্রকাশভঙ্গির নিজস্ব টেকনিকটি এখন তাঁর আয়ত্বাধীন বলেই মনে হয়। তাঁর পরবর্তী রচনার জন্যেও আমরা তাই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকবো।

—**প্রকাশক**

লেখকের অন্য বই প্রসঙ্গে মতামতের উদ্ধৃতি

১। এবং তুমি

"আমি ওঁর [অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের] লেখা আগে পড়িনি ; পড়া উচিত ছিল। পাকা হাত, ছোট ছোট ছবি, ছোট ছোট ক্যানভাসে সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন, ভাষা মার্জিত, কাহিনী বলার রীতি আধুনিক এবং শেষমেষ মনটা আনন্দ-বিষাদে আপ্লুত হয়ে যায়।...আরও ভাল লাগে স্বর্ণলতার কাহিনী। কী চমৎকার লেখার ঢঙ্।...পাঠককে মুগ্ধ করে।..." —অমিতাভ চৌধুরী।

'এবং তুমি' প্রসঙ্গে শ্রী সুনীল আচার্য বলেন—

"চরিত্রগুলি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। ..কিন্তু নিতান্ত সাদামাঠা সাধারণত্বের মধ্যেও অসাধারণত্বের অন্বেষণে লেখকের আন্তরিকতা সুস্পষ্ট-ভাবে পরিস্ফুট। হৃদ্য আবেদনে সম্পৃক্ত চরিত্রগুলি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের স্পর্শে সাবলীল ও প্রাণবন্ত হয়ে গল্পকে এক বিশেষ মাত্রায় উন্নীত করেছে।"

"গল্পগুলিতে পুরুষের মত নারীও এসেছে অনিবার্যভাবেই, কিন্তু লেখকের কলমে তাদের ভূমিকা প্রায় ক্ষেত্রেই এক বিশেষত্বের দ্যোতনা পেয়েছে।" কোথায়ও পাঠক দেখতে পাবেন কেমন করে 'নারী তার আপন বৃত্তে সুস্থিত থেকেই পুরুষের প্রেরণাদাত্রী হয়ে উঠতে পারে' অথবা, 'স্নেহ ও প্রেমে পুরুষ ও পরিবারকে ভাঙনের সীমানা থেকে সরিয়ে এনে নিরাপত্তার রাজপথের দিকে চালনা করতে করতে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে', কোথাও পাঠক পাবেন 'লেখকের...অনবদ্য ভাবনার ফসল, মাতৃস্নেহের স্বরূপ উদ্ঘাটনের এক অসাধারণ মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা।' দেখবেন '...উপেক্ষিত শিশুদের স্নেহকাঙাল অন্তরের মন সমীক্ষণ ..একটি শিশুর অন্তর্লোক ও বহির্লোকের ক্রমবিকাশের কিছু উজ্জ্বল বিবরণই শুধু নয়, পরিবারের প্রেক্ষিতে প্রবীন ও শিশুর পারস্পরিক চিৎ-অনুভবের আনন্দিত আখ্যানও।' দেখবেন— 'একজনের সন্দেহের বিষ কি ভাবে একটি গোটা পরিবারের মানসলোককে এক বিষম ঘূর্ণাবর্তে দিকহীন করে' এবং পাবেন আরও কত মরমী অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি...।

"বইটি তাই সহজেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে,...কঠোর কঠিন এই বাণিজ্যিক যুগ হৃদয়ের নিরিখে কৃপণ বলেই...বিষণ্ণ পাঠকের অতৃপ্ত মন অনুভবে প্রশান্ত হবে"

২। এবং প্রেম-অপ্রেম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ভূমিকায় বলেন—

'অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের গল্প সংকলন 'এবং প্রেম অপ্রেম' এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলেছি। লেখক পেশায় দর্শনের অধ্যাপক নেশায় জীবনের রূপকার। তাঁর ছোট গল্প জাতে সত্যি ছোট গল্প। কয়েকটি অনু-গল্পও আছে।···শ্রীভট্টাচার্য ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া নরনারীর জীবনের প্রতি একটা গূঢ় আকর্ষণ বোধ করেন।···অনুচ্চকণ্ঠে নিরুত্তেজ ভঙ্গিতে এই সব ভাঙ্গা মাস্তুল নরনারীর ছবি এঁকেছেন লেখক।

"···রবীন্দ্রনাথের কলমে রচিত হয়েছে এমন কিছু ছোট গল্প যা কবিতা এবং এমন কিছু কবিতা যা ছোটগল্প। ··ছোট গল্পে কাব্যধর্মিতা বা কাব্যিক মেজাজ থাকলেও তাতে সোশ্যাল রিয়েলিটির প্রকাশ ঘটানো যায়।···শ্রী ভট্টাচার্য এই শিল্প সত্য জানেন এবং আয়ত্বে এনেছেন এর শিল্পপ্রকরণ। তাঁর পরিচায়ক প্রথম তিনটি গল্পে···বস্তুত এই তিনটি গল্পে যে জীবনানুভূতি, কাব্যময়তা, শিল্প দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে তা তারিফ করার মতো।···

"···শতাব্দীর সায়াহ্নে এমন সব গল্প পড়ার সুযোগ দিয়েছেন বলে গল্পকার শ্রী অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের কাছে পাঠক হিসেবে কৃতাজ্ঞতা জানাই।"

ঐ একই বই প্রসঙ্গে শ্রীসুনীল আচার্য পূর্বাভাষে বলেন—

"কিছু গল্প আর কয়েকটি ফিচার নিয়ে সংকলিত এই বইটি পাঠকের দরবারে উপস্থাপিত। কখনও কৈশোরের আবেগানুভব, কখনও যৌবনের হৃদয়ানুভূতি কখনও বা প্রৌঢ়ত্বের জীবন জিজ্ঞাসা রচনাগুলির কেন্দ্রমূল, কিন্তু সব কিছুকেই এক মানবিক মানদণ্ডে যাচাই করে নেওয়ার প্রয়াসে লেখকের আন্তরিকতা সর্বত্রই পরিস্ফুট। ভিন্নধর্মী স্বাদের বৈচিত্রে সমুজ্জ্বল লেখাগুলি পড়ে পাঠক তৃপ্তি পাবেন··আবেগের যে ঘূর্ণি নিরন্তর দ্বন্দ্বের অভিঘাত আনে···লেখকের বর্ণনায় তার পরিচয় পেয়ে আমরা অভিভূত হয়ে যাই।

"বইটিতে কিছু প্রেমের গল্পও আছে যার কয়েকটি আবার রোমান্টিক ধর্মী।···'তুমি ও সময়' গল্পে···আপ্লুত পাঠক অনায়াসে চলে যেতে পারেন রোমান্টিক কবি Keats-এর কাব্যভাবনায় যেখানে অনবদ্য চিত্রকল্পে কবি বলে ওঠেন—**Bold lover, never never canst thou kiss···For ever will thou love and she be fair.**"

৩। এবং ভাঙাকুলো

কবি প্রাবন্ধিক শ্রীসুনীল কুমার নন্দী বলেন—

"ব্যক্তিগত প্রবন্ধমালার একটি মনোগ্রাহী সংকলন।......ভাষারীতি সংযত গতিশীল ও তির্যক-তীক্ষ্ন ; কোথাও গুরুগম্ভীর নয়। ধূসর পাতার জ্ঞান, নীতিবাক্য বা অযাচিত পাণ্ডিত্য বর্ষণের চেষ্টা নেই তাঁর কলমে।"

"গ্রন্থটিতে সর্বসমেত ২৪ টি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সংকলিত। এক একটি গদ্য যেন জীবনের এক একটি দিকের পুনর্বিবেচনা। সেখানে ঘুরে ফিরে এসেছে শৈশবের মধুর স্মৃতি, বল্গাহীন তারুণ্য, প্রৌঢ়ত্বের স্থিরতা, বার্ধক্যের সংকট। কিছু গদ্য...জীবন সম্পর্কে এক সামগ্রিক চিন্তার সূত্র খুলে দেয়...যেন মৌলিক অনুভবের সংহত আবেগময় অভিব্যক্তি।"

"কী ভাবে এক জীবন পাল্টে যায় অন্য জীবনে—সংসারের নিয়মে, প্রকৃতির নিয়মে, রক্তের নিয়মে। একদিন বার্ধক্য এসে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে এবং মানুষ তখন 'ভাঙাকুলো' অথবা 'বেবিসিটার'। এই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লেখক পরিবেশন করেছেন প্রয়োজনীয় মানসিক আয়োজনসমূহ।"

"গ্রন্থটিতে সময় মনে হয় নিজেই একটি চরিত্র।......যৌবনে মানুষ সময়কে ঝড় হিসেবে পেতে চায়। আবার 'পারানির কড়ির প্রার্থনায় অঞ্জলিবন্ধ অপেক্ষা যখন অনিবার্য'—তখন যুদ্ধ নয় ; স্নিগ্ধ মধুর বাতাসের প্রত্যাশা সময়ের কাছে। এমনতরো মহৎ উপলব্ধির শরিক হবেন পাঠক গ্রন্থটিতে... ।"

এবং শ্রীসুনীল আচার্য বলেন—

"...তাই বোধহয় লঘুপদ প্রজাপতির মতই কখনও তিনি মুক্তপক্ষ, শুধুমাত্র বৈচিত্রের ব্যঞ্জনায় ঝংকৃত প্রগাঢ় অনুভূতিগুলিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন তখন তার নন্দিত সঞ্চরণ।.........বিষয় নির্বাচনে আকাশই তাঁর সীমানা। ......এক মনকে নিয়েই কত যে তাঁর বক্তব্য যার বর্ণালি পাঠককে আকর্ষণ করে রাখে। অসংখ্য কঠিন কথা তিনি পর্যাপ্ত সহজ করে বলতে পারেন। ...অভিজ্ঞতার উদ্ভাস রচনাগুলির ছত্রে ছত্রে দ্যুতি ছড়ায়, কিন্তু আলোর সেই ঝলকানিতে পাঠকচিত্ত ধাঁধিয়ে না গিয়ে ঝলমল করে ওঠে।......শান্নিত কৌতুকের ঔজ্জ্বল্যে স্নিগ্ধ তাঁর বাকভঙ্গিটির বাঁধন কখনও কখনও এমনই সহজ আর সাবলীল যে পাঠকের পক্ষে বিনা আয়াসেই চড়াই উতরাইগুলো পার হয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে যায় ; তখন তাঁর মনে হতেই পারে যে জীবনের বাঁকে বাঁকে এত যে কথা আছে পর্বে পর্বে এত যে অনুভাবনা আছে, সেগুলি একান্ত আপন হয়েও এমন করে তো ধরা দেয় নি এতদিন !"

৪। এবং ভূত

'এবং ভূত' প্রসঙ্গে পাণ্ডুলিপির শ্রোতা-পাঠকেরা কি বলেন ?

তুলিকা (৮)ঃ ডিটেকটিভ গল্প সব থেকে ভাল লেগেছে আমার। আমাদের মধ্যে যে কথা কাটাকাটি গুলো আছে, ঝগড়া আছে, সেগুলো খুব সুন্দর হয়েছে।

পাপাই (১০)ঃ অনেক মজা আছে। হাদান আর বনমালীর জন্যে কষ্ট হয়েছে। চোর ধরার ব্যাপারটা দারুণ ভাল লেগেছে। অন্য ভূতের গল্পে শুধু ভয় থাকে। তোমার গল্পে আমরা জড়িয়ে গেছি—এটা খুব ভাল লেগেছে। আমাদের ঝগড়াগুলো দারুণ জমেছে।

টুকান (১৩)ঃ ভূত, গোয়েন্দাগিরি, মিনি-পুষি এবং হাজুকাকার ভূত, ছিনাথের ভূত—সব একসঙ্গে এসেছে বলে বেশি ভাল লেগেছে। ছোটদের, আমাদের, ঝগড়া-তর্ক—এসব বেশ নোতুন, বেশ ইন্টারেস্টিং হয়েছে। লেখার মধ্যে একটা মজা যেন সর্বক্ষণ নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। বলার কায়দাটা সব সময়েই টেনে ধরে রাখে।

শ্রীজয় (২২, বিজ্ঞান-ছাত্র) ঃ জোর দিয়েই বলতে পারি যে এই গল্প সম্ভাবের প্রতিটা গল্পই নিজ নিজ বিষয় সাপেক্ষে এক একটি ব্যতিক্রম। বিশেষ করে ভূত সম্বন্ধীয় গল্পগুলো আমার পড়া অন্যান্য ভূতের গল্প থেকে একেবারেই আলাদা। আমাব মত অন্যান্য যুক্তি এবং বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের এই গল্পগুলি ভাল লাগবে।

সানুশ্রী (অধ্যাপিকা)ঃ কিশোর মনের এলোমেলো চলার সেই চিরচেনা পথে 'এবং ভূত' এক নতুন মোড় এনেছে। লেখকের চিন্তার পরিশীলনে এবং প্রকরণনৈপুণ্যে ফেলে আসা সেই ভূত-প্রেত, পুতুল-মিনির পুরোনো জগৎটাই নতুন চোখে দেখার সুযোগ পেলাম।

সমীর (৬২)ঃ 'এবং ভূত' শুধু ছোটদেরই নয়, বড়দেরও অনাবিল আনন্দ দেবে।

সুনীল (৬২)ঃ 'এবং ভূত' গ্রন্থের গল্পগুলিতে এক মোহময় অথচ দৃপ্ত সুরের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকটিই সুখপাঠ্য যা টানটান আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে পাঠককে শেষ পর্যন্ত সজাগ রাখবে। হাজুকাকার চরিত্রটি লেখকের অনবদ্য সৃষ্টি, যিনি অত্যন্ত নাটকীয় রোমাঞ্চ নিয়ে শেষ পর্যন্ত ছোটদের হাজুদাদু হয়ে সারাসরি গল্পের আসরে হাজির হয়ে সকলকে মাতিয়ে যান। এমন কি শ্রীনাথ বহুরূপীও এসে যায় তাঁর আকর্ষণে।

'এবং ভূত' গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে নবতম সংযোজনই শুধু নয়, এক অভিনব পরীক্ষা নিরীক্ষাও।

৫। দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও আমরা

"শ্রী অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য সুসাহিত্যিক, দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনা তাঁর পেশা। 'দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও আমরা' নামের যে পাণ্ডুলিপিটি তিনি অতি সম্প্রতি প্রকাশনার জন্য মিত্র এণ্ড ঘোষকে দিয়েছেন সেখানে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর সাহিত্য সত্তার হাত ধরে রমণীয় পদচারণায় স্বাভাবিক ভাবেই সাবলীল। বস্তুতঃ আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে এখানে ঝংকৃত হয়েছে বিজ্ঞান ও কলার দুটি ভিন্নমুখী সুরের যুগলবন্দী, যা পাঠক সমাজের সম্মুখে এক মনোরম অর্জন এবং উপভোগের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এই শাস্ত্রটি সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের অনীহার কারণগুলি সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল, তাই যুক্তি তর্কের তাত্ত্বিক উপস্থাপনাগুলি নিছক পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্যে কোথাও নীরস বা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি ; বরঞ্চ ব্যবহৃত উপমাগুলিও মাঝে মাঝেই শানিত কৌতুকের ছটায় রং মশালের দ্যুতি ছড়ায় যা সর্ব শ্রেণীর পাঠকের ঔৎসুক্যকে শেষ পর্যন্ত সজাগ রাখে।

দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মত গুরুগম্ভীর বিষয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করার এমন যে এক আলো উদ্ভাসিত সহজ সরল সরণী থাকতে পারে সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্যের লেখায় আমরা অবশেষে তার হদিস পেয়ে যাই। বাংলাভাষী পাঠকের দরবারে এ বিষয়টিতে তাঁর স্থান নিঃসন্দেহে পূর্বসূরির আসনে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।"

—শ্রীসুনীল আচার্য ।।

।। ক'এক টুকরো আমি ।।

ঘরের বাইরে পদশব্দ। কে? উত্তর হল 'আমি'। বাগানের উপান্তে কাউকে আবছা আবছা দেখা যায়। কে ওখানে? সেই 'আমি'। একমনে কলম নিয়ে লিখছি, দরজায় করাঘাত। কে? আমি। ছোটবেলায় বাবা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন আমি-তো সকলেই। প্রশ্ন হল এই আমি'টা সমগ্র আমি-গোষ্ঠীর মধ্যে কোন্ 'আমিটি' বাবা? তখনই আবছা-আবছা বুঝেছিলাম 'আমি' বলে আসলে কেউ নেই; কারণ আমরা সকলেই প্রতিনিয়ত একএকটি চলতি-ফিরতি আমির বাণ্ডিল।

"ক'এক টুকরো আমি" সেই চলতি-ফিরতি একটা 'আমির' আয়নায় ক'একটি টুকরো। টুকরো গুলোও সব আমি-র অংশ। জীবন সেই আমি-আয়নায় ছোট-ছোট ছবি ফেলেছে, ফেলছে। আমার আমি তাকে যেমন দেখেছে আপনার আমি-ও তাকে সেরকম দেখবে। অন্ততঃ দেখতে পারে তো? শৈশব বাল্যের প্রকৃতিতে সব আমি গুলোই প্রায় এক। প্রভেদ যা কিছু তা স্থান-কাল-পাত্র-মিত্রের। যদি আমার টুকরো 'আমিতে' আপনি আপনার খন্ড 'আমিকে' এক-আধ ঝলক দেখতে পান তা হলেই আমি আপনার মধ্যে আমাকে, আর আপনি আমার মধ্যে আপনাকে খুঁজে পাই / পাবেন। সার্থক হবে তখনই।

সুখকে কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যায় না। শান্তি? মুক্তি? কোথায় পাই, "কোথা পাবি তারে"? ভালবাসা? কারে কয়? সে তো কেবলি যাতনাময়। তাহলে কি এরা সব মরীচিকা? তা তো নয়! মনের মধ্যেই কি মধু আছে? তাহলে তো সেই মন-মৌচাকটাই ঘরে নিয়ে এলে সবপাওয়ার দেশে পৌঁছে যেতে পারি। এই বিশ্বটাই যখন আমির মধ্যে আর সেই আমিটি যখন জুড়ে দেওয়া হয়েছে এই বিশ্বের অনির্দেশ্য প্রান্তরে, জীবনের সেই প্রথম প্রভাতে, তখন সকলেরই তো একটিই দায়ঃ সেই নিখোঁজ আমির খোঁজ।

হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে আমরা সকলেই যখন শ্রান্ত-ক্লান্ত তখন জানতে পারি যে গোটা আমিটা আর সেই সম্পূর্ণটি হয়ে বাস্তবে কোথায়ও নেই।

সবই বাস্তবের আঘাতে-সংঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। হাহুতাশ করে কপাল চাপড়ানোর চাইতে নিপুণ হাতে নিজের নিজের টুকরো-টুকরো আমি গুলো সংগ্রহ করে মালা গাথলে কষ্টের কিছু লাঘব হতে পারে। পুঁতির মালাটি ছিঁড়ে গিয়ে যখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় তখন নাবালিকা মেয়েটির চোখের জল যেমন সত্য, মায়ের সাদর সংগ্রহ-একত্রও তেমনি মিথ্যা নয়।

"ক' এক-টুকরো আমি" আমার সেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া আমার পুঁতির মালা। যদি এটা আপনার হয়, কোনও প্রতিবাদ নেই আমার। নেই কোন ক্ষেদ। লেখক। লেখক, না পাঠক ?

———

।। শিউলি সকাল ।।

সকলেই জানেন যে বয়স বাড়লে ঘুম কমে, দুশ্চিন্তা বাড়ে ; দিনের জেগে থাকার সময়গুলোর অনেকখানিই আচ্ছন্ন ভাবে কেটে যায়। আবার এই ঘোর ঘোর অবস্থার মেঘগুলো হঠাৎ হঠাৎই চারপাশের অনাচার-কু আচারের ধাক্কায় বিড় বিড় করে মনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। দিনের ঘুম দীর্ঘ হয় না, রাতে ঘুম পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। অবসর দীর্ঘ অবসন্নতার ছায়া ফেলে। দিন তাই লম্বা মনে হয়, রাত তাই আর কাটতে চায় না। অতীত বারে বারে এসে এসে বর্তমানের বুকে-পিঠে আঁচড় বসাতে থাকে, কখনও হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চায় মাঠে-প্রান্তরে, জলে-জঙ্গলে, মেঠো পথে আর পাঠশালার কচিকাঁচা দিনে। বর্ষার ভেসে চলা কচুরিপানারা চোখে ডাকে, আকন্ঠ জলে গা ডুবিয়ে ধানের শীষগুলো যেন হাতছানি দেয়, চলমান নৌকো থেকে ভেসে আসা ভাটিয়ালির সুর অন্তরের গভীরে ঝংকার তোলে। অতীতের আফিং-সেবন-বিচরণ সময়ে পুত্রের সমস্যা, পুত্রবধূর জলখাবার পরিবেশন অথবা কচিকাঁচাদের দাদুপ্রীতি ছন্দপতন ঘটায়, অবসরের আমেজটুকুকে কুলোর বাতাস দেয়! বিরক্তি যদি চোখে-মুখে শুধু ফুটে ওঠে তাহলে বাঁচোয়া, আর যদি কন্ঠে-শব্দে অথবা হাতের আন্দোলনে প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে বিষম বিপদ, অকারণ দুর্দৈব ঘটে যাবার সম্ভাবনা।

বিলম্বিত রাত্রির গভীরে মন যতই ক্লান্ত হয় ঘুমের অভাবে, ততই যেন বয়স তার স্থূলত্বের ভার বিছানায় ফেলে রেখে হালকা পায়ে ঘুরে বেড়ায় ছাদের কার্নিসে, আমগাছের ডালে, বটগাছের তলায়। ছোটবেলার মনটি নিয়ে বয়স তার বর্তমান ভুলে আশ্বিনের ভোরে ফুলের সাঁজি হাতে, শিশিরে পা ভিজিয়ে, শিউলি সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একা নয়, অনেকের সেই মিলিত সকাল, ফুলের হাসিতে আর মনের আনন্দে ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে। সূর্যের নয়, পূব আকাশের উদয়-পূর্ব আলোর ছটা যেন সকলকেই রাঙিয়ে দিয়ে যায়। ভূমিশয্যায় যত্রতত্র অপেক্ষমান ফুলগুলো যেন আমাদের অপেক্ষাতেই রজনী শেষের প্রহর গুনছিল, যারা তখনও নীচে নেমে আসে নি, অপেক্ষাকে বৃন্তের মূলে একাগ্র করে রেখেছিল তারা আমাদের দেখেই যেন

খিল্‌খিল্‌ করে বাতাসে সাঁতার কেটে নেমে আসে। নেমে আসে শিশির ভেজা ঘাসের ডগায়, আমাদের ঘাড়ে পিঠে মাথায়; আর দু' একটি তো একেবারে সোজা সাঁজির মধ্যে, সঞ্চিত দলের মধ্যেই! কোথায় গেলে সেই দিন আবার খুঁজে পাওয়া যায়? পাওয়া যায় কি আদৌ?

তখন আনন্দ ছিল আনন্দেরই মধ্যে; শিউলি সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই, হেলে পড়া রাতের অবশিষ্ট অংশটুকু জেগে থেকে পাখিডাকা ভোরের জন্যে উৎকর্ণ হয়ে বিছানায় এপাশ ওপাশ করার মধ্যেই ছিল আনন্দের ভোরের রাগিনী, আর সেই অস্পষ্ট রাত্রিশেষের সংগে যখন শৈশবরবির হামাগুড়ি মিলন-মুহূর্তটি সমাসন্ন হত তখন যেন দীর্ঘ সংগীত মিশে যেতো আমাদের মনের মালায়। দরজার খিল খুলতে সবুর সয় না, দৌড়-দৌড়-দৌড়!

ভোরের সেই সুন্দরের সব সংগ্রহই তো নিঃশর্তে দিদি-মাসিদের হাতে তুলে দিয়ে তৃপ্তির আর আদরের স্পর্শসম্ভার সম্বল করে স্বর্গ হাতে পেতাম! সমর্পণে যে এতো সুখ, দিতে পারার মধ্যে যে এতো আনন্দ সে তো আর অমন করে কোনওদিনই মনকে নাড়া দিল না; দীর্ঘ জীবনের সুদীর্ঘ পথে আপনজনদের এবং পরজনদের তো কম কিছু দেই নি, কিন্তু সেই স্বর্গ-সুখ তো কৈ আর কখনও তেমন করে পেলাম না! বোধহয় সে সব তেমন নিঃশর্ত ছিল না, আকাঙ্ক্ষার বীজ বোধহয় সব দেওয়ার মধ্যেই কীটের মতো লুকিয়ে ছিল। কে জানে? প্রতিদানের দায় সব পাওয়ার মধ্যে?

ফুলের সাঁজি, ফ্রকের কোচড় আর খসে পড়া আট-হাত শাড়ির আঁচলে সেই সংগ্রহ যেন ছিল আমাদের কচিকাঁচা মনের টুকরো টুকরো সংগ্রহ। প্রতিটা ফুলই ছিল স্বতন্ত্র, সুন্দর, প্রাণবান। আঙুলের আলতো আদরে তারা আমাদের নিজ নিজ সংগ্রহের ঝাঁপি পূর্ণ করে তুলতো। এক গাছের তলা থেকে অন্য গাছের তলায়। শিশিরে ভেজা সজল পা, দু'এক টুকরো ঘাসের ডগা গোড়ালি বা পায়ের পাতায় সঙ্গী। বাসন্তী বোঁটায় শুভ্র হাসিটি আমাদের মাতোয়ারা করে দিত। গাছের তলায় এই সংগ্রহ অভিযানে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো কখনও কখনও; কিন্তু মারামারি কখনও নয়। যে যার সংগ্রহ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়তো। প্রকৃতির নিজস্ব সম্পদ এই ভোরের শিউলি, সকলেরই সমান অধিকার। আসলে বোধহয় এই অধিকার-বোধটাই

তখন অন্যরকম ছিল—সেই শৈশবে।

গাছে ঝাঁকুনি দিলে ঝর্ ঝর্ করে ফুলেরা হাসি হয়ে মাথার চুলে, কাঁধের আঁচলে অথবা নাকের ডগায় নেমে আসতো। ফুলের হাসির সংগে আমাদের খিল্ খিল্ হাসি যোগ হয়ে ভোরের আকাশের হাসিটির মধ্যে মিলিয়ে যেতো। পাখিরা গান গেয়ে উঠতো। কেউ বা এক গাছ থেকে অন্য গাছে গিয়ে বসত; আবার কোনও পাখি ঝাঁক বেঁধে এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে উড়ে যেতো। ওরা কি ওদের দিদিদের জন্যে শিউলি সংগ্রহ করতে ছুটে যেতো?

তার পরে অনেক অনেক দিন ধরেই তো সংগ্রহ করে করে চলেছি। পুতুলের সংসারের জন্যে সংগ্রহ, খেলাঘরের জন্যে সংগ্রহ, এবং তারও পরে সংসারের জন্যে যাবতীয় সংগ্রহের মিশ্র ইতিহাস। সেই সব সংগ্রহের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে স্বার্থ, প্রয়োজন, আত্মচেতনা। নিজের করে পাওয়ার তাড়নায় সব সংগ্রহই আনন্দ হারিয়েছে, কর্তব্যের ছাপ আষ্টেপৃষ্ঠে লেপে নিয়ে তারা আর অন্যের জন্যে নিঃশর্ত হতে পারে নি। শিউলি সংগ্রহের কষ্টটা অনায়াসেই আনন্দে রূপান্তরিত হয়ে গেল, আর কর্তব্যের সারাজীবনের সংগ্রহের পেছনের কষ্টগুলো জমে জমে যন্ত্রনার পাহাড় গড়ে তুলল। এই পাহাড়টার নামই কি বয়স?

সেই সকালেই, সেই শিউলি-ভোরেই এখন ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু সকালগুলো কতোই না আলাদা। এখন আর পায়ে শিশিরের ছোঁয়া লাগে না, ঘাসের দু'একটা ছেঁড়া শীষ শীকরসিক্ত হয়ে পায়ে জড়িয়ে থাকে না, ত্বরিত পদে প্রিয়জনকে সকল সংগ্রহ সমর্পণ করে আনন্দের অনুভবটুকু এখন আর জোটে না! এখন ভোর হলেই বয়সের ব্যথা নিয়ে শরীর আড়মোড়া ভাঙে, ঊষার আলো এখন চা'এর নেশা জাগায় আর সারা জীবনের অসার সংগ্রহের অর্থহীন ভীড়ে আর একটা দিনের যাত্রা শুরু হয়।

আবার এখনকার শিশুদের শৈশব আছে কিন্তু নেই ওদের কোনও শিউলি সকাল। শহরে একেবারেই নেই; গ্রামে অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে। এখন সকাল থেকেই পড়াশুনোর চাপ, 'হোমটাস্কের' রক্তচক্ষু তাড়না, সময় মতো, রুটিন মাফিক্, ঘড়ি ধরে আহ্নিক গতির সংগে প্রতিযোগিতা। ওদের জন্যে দুটো শিউলিগাছের ব্যবস্থা করলে হয় না? বইপত্রের চাপ একটু কমিয়ে

ঘাসের বিছানায় শুয়ে থাকা শিউলিদের সংগে দু'টি মুহূর্ত কাটানোর মতো কিছু সকাল ওদের দেওয়া যায় না? মোজা আর জুতোর আড়াল থেকে মুক্ত করে ওদের পা দুটোকে ছেড়ে দেওয়া যায় না ভোরের শিশিরে ভিজিয়ে নিয়ে জীবনকে আর দৃষ্টিকে একটুখানি সহজ, সরল এবং সরস করে নিতে?

বয়স তো আমাদের চোখে ছানি ফেলবেই; অন্যরা কি স্বচ্ছদৃষ্টির অধিকারী নয়? আমাদের সকল অনুভবই অলস, অকর্মন্য; তোমাদের? তোমরা যারা শৈশব ফেলে এসেছো অনেকদিন কিন্তু অলস অনুভবের দিনগুলোতে পৌঁছতেও অনেকদিনই বাকী আছে?

———

॥ বাল্যকাল ॥

মানুষের তো কতো কথাই বলার থাকে। সব কি সে বলতে পারে? আর লেখা? সে তো এক বিরাট ব্যাপার। আমি যা বলতে চাই তা হয়তো যা-করে হোক বলে দিতেও পারি, কিন্তু লেখার বেলায় অন্য নিয়ম নয় কি? একবার যা লিখে ফেললাম সেইই লেখা হয়ে গেল। আর যদি তা ঠিক ঠিক ঝংকারটি না তুলতে পারে তাহলে তো পাতা মুড়েও নয়, এমনিই সশব্দে বন্ধ করে দূরে, আলমারীর এককোণে ছুঁড়ে দেবে। অপাঠ্য! কেন যে লেখে?

জীবনের সকাল বেলায় গুরুজনদের লেখা পড়েছি। বলা যায় অবগাহন করেছি। সেই সব সাহিত্যের দীঘিতে সরস শান্তির সংগে গভীর তাৎপর্যের ওতঃপ্রোত তন্নিষ্ঠতাকে উপলব্ধি করেছি। তাঁরা লিখেছেন কেউ বা নিজেকে প্রকাশ করার ঐকান্তিক ভাবদীপ্তিতে। সৃষ্টি হয়েছে গান, কবিতা, ছোটগল্প। কখনও বা ঝর্ণা হয়ে ছোট-বড় সকলের জন্যেই সুপেয় জীবনদায়িনী সাহিত্য-কৃতি হয়ে ফুটে উঠেছে। আবার কখনও সমাজচেতনাকে ঋজু-ঋদ্ধ করে, মূল্যবোধের দিক্-নির্দেশ বহন করে উপন্যাস-প্রবন্ধ-পত্রগুচ্ছ হয়ে চিরকালিন আলোকবর্তিকা হয়ে স্থির হয়ে আছে।

আবার জীবনের এই অপরাহ্নে এসে গতিশীল দিক্‌বিদিক্ ধেয়ে চলা অজস্রধারায় সাহিত্যকৃতি দেখলাম, দেখছি। গতি? এখন জীবনের অপর নাম; তাই লেখার মধ্যেও সেই গতি। দ্রুত ধেয়ে চলার পদধ্বনি। অপেক্ষা নেই, চারদিকে দৃকপাত নেই। নদীর যেন প্রবাহটাই সত্যি, জলটা যেন আর ততটা প্রয়োজনীয় নয়! বিষয় যাই হোক, উত্থাপনটাই প্রধান।

কিন্তু আমার তো বিষম জ্বালা। বিষয়ও নেই, উত্থাপনের বৈশিষ্ট্যও নিজস্ব করে তৈরী হল না। চিন্তা-ভাবনা-অনুভবের গভীরতাও নেই যা একটা দীঘিকে সম্ভব করে তুলবে, আবার কলম কোনও শৈলীকে খুঁজে পায় নি যা দিয়ে সে হরিণের মতো ছুটে চলতে পারে!

তাহলে তো মিটেই গেল। কলম বন্ধ করে নিজেও শান্তি পাও, অপরের অশান্তিকেও বাড়িও না! কিন্তু মন মানে না। ভেতরে ভেতরে যে কষ্ট বোধটা আছে? কি যেন একটা প্রকাশের তাড়নায় অস্থির এপাশ-ওপাশ

করে আমাকে প্রতিনিয়ত বেদনাক্লিষ্ট করে তুলেছে! তাকে নিয়ে কি করি?

প্রতিদিনই তো শত শত শিশুর জন্ম হয়। হচ্ছে। এটা না কোনও ঘটনা, না কোনও দুর্ঘটনা। স্বাস্থ্য বিভাগের বুলেটিনে, সামাজিক পরিসংখ্যানে এবং বিশ্বময় মানুষের খতিয়ানে জন্ম বা মৃত্যু শুধুমাত্র সংখ্যার উত্থান-পতন। অথবা রেখা-চিত্রের, গ্রাফের। যুক্তির প্রয়োগে, উদাহরণের তাৎক্ষণিক তাৎপর্যে এই সব সংখ্যাতত্ত্ব দ্রুত কাজে লাগে। কিন্তু খুব ছোট বেলাতেই যে দেখেছি অন্য রকম, অন্য কিছু? একটি জন্ম সম্ভাবনায় বা মৃত্যুর শনৈঃ পদক্ষেপে, কতো দিনই তো দেখেছি, উৎকর্ণ উৎসুক নিকটজনের অধীর পদচারনা? অপেক্ষা? সেই সব জন্ম বা মৃত্যুকে তো তখন ঘটনা বলেই মনে হয়েছে, সংখ্যামাত্র কখনই মনে হয় নি! তার পর তো কেটে গেল কত দিন। মাস-বছরের হিসেব নেই। কিন্তু হিসেব আছে যে যতবারই এই জন্মমৃত্যুর কাছাকাছি এসে পড়েছি ততবারই তাকে ঘটনা বলেই মনে হয়েছে। যে চিত্র দেশের গ্রাম্য পরিবেশে প্রসবঘরের বেড়ার বা টিনের দরজার বাইরে, বারান্দায়, ঔৎসুক্যে-উৎকন্ঠায় পদচারনা করেছে, 'পথের পাঁচালী'তে ঝুঁকে পড়া চিত্র-কল্পে চলমান দেখিয়েছে, সেই একই চিত্র তো এখনও দেখি শহরের সব নার্সিং হোমেব সন্তর্পণ নিঃশব্দ একাকী ঘরের বাইরে, চেয়ারে, বেঞ্চে বা করিডোরে স্তূপ-স্তূপ হয়ে অপেক্ষারত, তাহলে কেন এগুলো ঘটনা নয়? আর কেন নয় দুর্ঘটনা যখন দুঃখই একমাত্র প্রাপ্ত?

একটু দূর থেকে দেখুন তাহলেই বুঝতে পারবেন। জন্ম-মৃত্যুর ঘূর্ণি চলেছে যেটুকু ক্ষেত্রে তাকে বাদ দিয়ে যে বিশ্বচরাচর সে তো তার নিজস্ব বেগে ধেয়ে চলেছে নিজেরই খেয়ালে। সেখানে বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় নেই, পরিণাম নেই, পরিবর্তন নেই। একটা জন্ম যে আনন্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে, আর একটা মৃত্যু যে বেদনার ঢেউ তৈরী করে তা কি জীবনের, বৃহত্তর চলমান জীবনের, তটপ্রান্তকে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে? সাধারণ জন্ম-মৃত্যুর কথা বলছি অসাধারণ ক্ষেত্রে তো কাছের ক্ষেত্রেও ঘটনা, দূরের ক্ষেত্রেও ঘটনা। এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটা জন্ম বা একটা মৃত্যু যুগ-যুগান্তের ঘটনা হয়ে মানবেতিহাসে ধ্রুব হয়ে জ্বল-জ্বল করে। সে জন্ম বা সে মৃত্যু পাশে থাকা আপনজনের কাছেও ঘটনা, অন্য গোলার্ধে থাকা সর্বজনের কাছেও ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। একজন যীশু যখন জন্মান, তখন

'পূর্বদেশীয় তিনজন পণ্ডিত' তাকে ঘটনার মর্যাদা দেন। একজন মাদার টেরেসা যখন অসুস্থ হন তখন বিশ্ব তাঁর খোঁজ নিতে ব্যস্ত হয়। একজন রবীন্দ্রনাথ যখন অন্তিম যাত্রা করেন তখন বিশ্বাত্মা মানুষের ঢেউ হয়ে সমাজের সমুদ্রে আছড়ে পড়ে।

কিন্তু যারা 'দাগ রেখে যেতে পারে না' জীবনের বেলাভূমিতে তারা সাধারণের প্রত্যক্ষে পরিসংখ্যানের বস্তু মাত্র। তারা ঘটনা নয়, নয় দুর্ঘটনা। তারা জন্মমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে তুলতে পারে নি। বরং জন্ম ও মৃত্যুই তাদের প্রত্যেককে পায়ের তলায় অকাতরে পিষ্ট করেছে। এই সহস্রকোটি সাধারণের মিছিলেরই অঙ্গ হয়ে একদিন কোনও এক প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যে ছিটকে এসে একটা একক হয়ে হাজির হলাম। একটা চীৎকৃত কান্নার প্রতিবাদ দিয়েই, সব জীবনই যেমন, নিশ্চয়ই সুরু করেছি। সুরুর সে সব জীর্ণ-শীর্ণ দিনগুলো মনে থাকার কথা নয়। অনেকগুলো দিনই তো প্রত্যেকের জীবনে হারিয়ে যায়। তাদের খুঁজে পেতে দরকার কোনও দিদিমা-ঠাকুমা-পিসিমাদের। আর থাকলেই হয় না, তাদের সংবেদনশীল নৈকট্যের ও দরকার হয়। যাদের ঘষা কপাল, যাদের জন্মে সূর্যোদয় ঘটেনা, অন্ধকার দিনের দরজা খুলে যায়, তাদের মতো আমার কপালেও তারা কেউ স্মৃতিমন্থনের সংবেদ্য নৈকট্য দেয় নি। ছিলই না! সেই সব হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো টুকরো টুকরো কথা আর ছোট ছোট ঘটনা দিয়ে নোতুন করে সাজানো, বানানো। বহুদিন পরে বহু জনের কাছে শুনে শুনে এবং মাকে কাছে পেয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেওয়া।

ল্যাণ্ডিং

জমিজমা ছিল। ছিল তেজারতি কারবার। লেনদেনের সম্পন্ন জীবন। আমার জন্মের পরেই, কিছুদিনের মধ্যেই, ঋণ সালিসী বোর্ড! ধ্বস্ নেমে এলো আমাদের আর্থিক জীবনে। আর যায় কোথায়! নবজাতকের জন্যেই তো এরকমটি হল! জমিজমা সবই বর্গা ব্যবস্থায় ছিল। কি যেন সব নিয়মকানুন প্রচলিত ছিল। সেই প্রথায় জমির মালিক উত্তরোত্তর সম্পন্ন

হত ; যাদের মুঠোয় চাষ-আবাদের শক্তি তারা ক্রমশঃই নিঃশেষিত হত। কি হল সেই গ্রাম দেশে কে জানে, কার্ল মার্কস-এর বাতাস ছাড়াই নাকি কৃষকেরা বেঁকে দাঁড়াল। তাহলে ? জ্যেঠিমা নিশ্চিত হয়ে ঘোষণা করলেন ঃ এই ছেলের জন্যেই এই সর্বনাশ ! হবেও বা। ওদিকে মামাবাড়িতে যখন আমার জন্মের পরেও বেঁচে থাকার খবর পেঁছিল তখন নাকি সেখানে কৌরব-সভার যাবতীয় ব্যবস্থা হয়ে গেল নিমেষেই ! দিদিমার সম্পত্তি বাঁচানো যে তার সন্তানদের আশু কর্তব্য সেই একমাত্র বিষয়েই মামারা-মাসিরা একমত হয়ে একাট্টা হয়ে গেল। মিটে গেল তাদের নিত্যদিনের ঝগড়া এবং নৈমিত্তিক ঈর্ষাদ্বেষ। সেখানে দীর্ঘ ঘন্টা দিন সপ্তাহ ব্যাপী মিলনের ললিত-মধুর হাওয়া ঝিরি ঝিরি বইতে লাগল এবং তাদের অভ্যন্তরীণ জ্বালা-যন্ত্রণা অগ্নুদ্গারী চেহারা নিয়ে আমার বেচারী মা এবং তারই অধিকতর বেচারী পুত্রের দিকে নিক্ষেপযোগ্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তবেই বুঝুন দেবকুলে কতবড় দানবটি হয়ে ল্যাণ্ড করেছিলাম !

না, এটাও ঠিক নয় যে আমার এই ল্যান্ডিং সর্বজনের কাছেই অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল। এই শতাব্দীর কৈশোর কালে আমাদের সমাজে পরিবার পরিকল্পনা ব্যাপারটা মাথা চাড়া দেয় নি। ভাগ্যিস্ ; তা না হলে আমার এই ল্যান্ডিং-টাই অসম্ভব হয়ে 'নেবুলা'-পর্যায়েই মহাবিশ্বের কোনও প্রত্যন্ত প্রান্তে ঘুরপাক খেতে থাকত। শুনেছি আমার জন্যে অষ্টম 'রাণওয়ে' ধার্য ছিল। তার আগে যারা যারা চেষ্টা করেছে তারা সকলে সফল হয় নি। যে দুজন মাত্র 'সেফ্-ল্যান্ডিং' পেয়েছিল তারা দু'জনই কন্যা সন্তান। তাই কংসপরিবেশে কোনও বিপদঘন্টা বাজে নি। আমার গলা এবং উপস্থিতি-উভয়ই নাকি 'সাইরেনের' ধ্বনিময়তায় বিশিষ্ট ছিল। অর্থই অনর্থের মূল !

'হলে কি হয়, ও বাঁচবে না'—এ-মতো একটা বিশ্বাস অনেক উৎকণ্ঠিত স্বজনের মনের ভার অনেকাংশেই লাঘব করেছিল। আগের আগের গুলোর মতো এ-টারও ভরসা নেই। হাড় জির্‌জিরে, পেটে-পিলে, শীর্ণকায়, বিদীর্ণ কণ্ঠ, এ ছেলের দিন তো গুন্‌তির মধ্যে। চাপা অশান্তির রাজ্যে বেশ একটা অন্তঃসলিলা তৃপ্তির তির্‌তিরানি !

কিন্তু আমার জননী মোক্ষম চাল চাললেন। তার গর্ভের সন্তান বাঁচে না, তাই সোজা বিক্রি করে দিলেন, বোধহয়, নাপিতানী বৌ-এর কাছে !

সম্ভবতঃ সেই বুদ্ধিটিও ক্রেতার 'ষোল চোঙা'বুদ্ধির কোনও একটি থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকবে। মা'র হয়তো মনে হয়েছে : আহারে, এতো কষ্টে যাকে পেলাম তাকে হারানোর চাইতে নাপিতানীর কাছে থাকাও ভাল। অন্ততঃ মাঝে মাঝে দেখা তো যাবে। নিজের বলে মনের শান্তিতো পাওয়া যাবে। কিন্তু সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিঃশেষ করে দিয়ে, অন্য কোনও 'চোঙা' থেকে যে মোক্ষম প্ল্যানটি সেই নাপিত-বৌ মাকে দিল তা আরও সমৃদ্ধ। মা এক কথায় রাজী। তিনটি কড়ি-তে লেনদেন সমাপ্ত। আমি, একটি মানব শিশু, হস্তান্তরিত হয়ে গেলাম তিনটি কড়ি-তে। ব্যাস্! কিন্তু না। তা হল না। শূণ্যদৃষ্টি পুত্র-হস্তান্তরিতা আমার মাকে আশ্বাস দিয়ে দ্বিতীয় বার হস্তান্তরিত হলাম। এবারে ক্রেতা আমার জননী। এখনও ভাবি কেমন লেগেছিল এই বিক্রয় এবং ক্রয়ের পর্বগুলিকে? আর সারাজীবনের জন্যে আমার নামের মধ্যেই সেই ভোরবেলায় সামাজিক-অর্থনৈতিক ডেবিট-ক্রেডিটের ছাপ পড়ে গেল। ভাষার নিজস্ব সংক্ষেপীকরণ পদ্ধতিতে 'তিনকড়ি' হ্রস্ব হয়ে 'তিনে' হ'ল এবং আদরের প্রলেপ লেগে এ-স্থানে উ-এর আগম হত। মা'এর আদরে যে ছিল 'তিনু' সেই আবার অনেকের, বিশেষ করে পণ্ডিত মশাই-এর ব্যাঙ্গে আর বিদ্রুপে লাল-অন্ত হয়ে ফুটে উঠতো!

আমার কপালে এতোসব হেনস্থা জুটছে দেখেই বোধহয় আমার বাবা অর্দ্ধেন্দু এঁকে দিলেন। অর্দ্ধেন্দু শেখর হয়ে যেটুকু স্বস্তি আমার পাওনা হল তার অনেকটাই আবার 'ট্রান্সফরমেশন অব ওয়ার্ড' হয়ে, 'অর্ধ-চন্দ্র' হয়ে, আমার ঘাড়ের অন্বেষণে ব্যাপৃত হতে লাগল। কপাল যায় সংগে! আর ঘাড়-ও তো বেশী দূরে নয়, সম-চলনে অভ্যস্ত! তা সেই ঘাড়ে-গর্দানের চাইতে ঘাড়ে-কপালে হয়ে আমার নিজেকে পন্ডিত পন্ডিত মনে হত— সর্বনাশ উপস্থিত হলে তাঁরা অর্ধেক ত্যাগ করেন বলে শুনেছি!

কবি অপরাজিতাকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছিলেন। নিজেকে নিয়ে আমার অনেক প্রশ্ন ছিল এবং আছেও। কিন্তু সেই বাল্যকালেই আমার রাঙা ঠাকুমা আমাকে নিয়ে একটা অনুরূপ কবিতা লিখে ফেলতে পারতেন। যোগ্যতা ছিল না বলে কবিতা লেখেন নি : কিন্তু জিভের অসাধারণ ধার ছিল, অনেকটাই তার গাত্র-বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের মতো, (নামেই প্রকাশ!) তাই আমাকে 'নাপিত' নয় শূদ্রসন্তান বলে মনে করতেন! এই মনে করাতে তার

যতটা না দোষ ছিল তার চাইতে আমার গুণ ছিল বেশী। বর্ণ, চেহারা, পোষাক। মেলা মেশা, ওঠা-বসা, চলা ফেরা। হাদান এবং গুরুবরদের কোলেপিঠে যাকে অধিক সময় কাটাতে হয়, যার দেখাশুনার সিংহভাগই মানদাদের হাতে থাকে তাকে আর যা'ই দেখাক 'ললিপপ' দেখায় না। আমি ওদের অত্যন্ত আদরের ছিলাম ; আর তাই সবিশেষ বাঁদরের মতো চেহারাটি সহজেই করে নিতে পেরেছিলাম। আদুড় গা, ধুলো-ময়লা, মাঠ-ঘাট, খড়-বিচালি, হাদান-মানদা—সব মিলে প্রকৃতির অন্দর মহলের খাস তালুকের বাসিন্দা হয়ে পড়েছিলাম। আর কে না জানে যে সকালটাই দিনটার ঘোষণা নিয়ে আসে!

আমাদের ছোট্ট পরিবারে আমি একটা ঘটনা বই কি। নিজে না হলেও অনেক ঘটনার কারণ হিসেবে কারণ-ঘটনা। আবাব চারপাশের পটভূমিতে একটা দুর্ঘটনাও বটে। অনেক বাড়া-ভাতে আমি ছাই-এরই মতো। আবার দূর থেকে 'লঙ্ শটে' দেখুন, দেখবেন লাবণ্য কত সত্য। শেষের কবিতায় কতো সুন্দর করে রবীন্দ্রনাথ লাবণ্যের মুখে এই সত্যটি চিরায়ত করে দিলেন। এই মাত্র যে ব্যাঙটি টুপ্ করে জলে লাফ দিল, অনাদি অনন্ত কালের মধ্যে এই ঘটনাটি আর কখনও ঘটবে না। অমিতের আংটি-প্রসঙ্গ-বেলুনটিতে পিন-প্রবেশ করল! যা অনাদি অনন্ত কালের মধ্যে একবারই মাত্র ঘটে সেই ঘটনা তো সবিশেষ! কিন্তু কি অসীম অর্থহীনতাই না এই 'স-বিশেষ' ঘটনাকে তুচ্ছতা-সণ্ডিত করে যখন আদিগন্ত জীবন-নিরীখে একে দেখা যায়?

আমার ল্যান্ডিংটি ব্যাঙের ব্যাঙ্গে সবিশেষ ঘটনা, অনাদি অনন্ত কালের মধ্যে এমনটি আর কখনই ঘটবে না, ঘটতে পারে না। মহাবিশ্বের, মহাজীবনের, কী এসে যায় তাতে? আমারই বা কী এসে যেতো যদি আমার এই আমিত্বটা একদিন আদো ল্যান্ড নাই করত? কিন্তু হেমলতাদেবীর জীবনে অনেক শূণ্যতা তার অনেক একাকী মুহূর্তকে যন্ত্রণাময়, রিক্তাক্রান্ত অর্থহীন করে ফেলত! যদিও আমি একটা সম্ভাবনাময় 'প্রসেশনের' নেতৃত্ব দিয়েছিলাম পরবর্তী কালে, তবুও সেতো হেমলতার জানা ছিল না!

এই আমিই আমার ঘটনা, আমার দুর্ঘটনা। একই সংগে স-বিশেষ এবং অর্থহীন নির্বিশেষ। টুপ্ করে লাফিয়ে পড়ার তাৎপর্যে ধ্রুব, আবার নিঃশেষে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় নৃত।

জীবন চরৈবেতি। বিশ্বের অলক্ষ্যে, পরিসংখ্যানের অংকে সেই যে এক সরস্বতী পুজোর দিন টুপ্ করে না হলেও চীৎকার করে সুরু করেছিলাম তার পর থেকে কতোবারই তো বীনাপাণি এলেন এবং সংগীতমূর্ছনায় বহুজনকে অবগাহন করিয়ে সার্থক করলেন, প্রাণবন্ত করলেন। আর এই আমি কতো পথ আর পথের মোড়ে মোড়ে নিজেকে খুঁজে বেড়ালাম, হারিয়ে গেলাম এবং আবার সন্ধান পেলাম। কতো মাঠ কতো প্রান্তর পার হতে হতে নিজের নিজেকে নোতুন চেহারায় দেখে চমকে গেলাম, পেছনে ফেলে আসা পুরোনো নিজেকে আর কখনই সামনে দেখতে পেলাম না, এই আমিটাকে নিয়ে ব্যস্ততায় অস্বস্তিতে আর স্ববিরোধে ঝালাপালা হয়ে বিরক্ত-বিমর্ষ-বিষণ্ণ হলাম, আবার সার্থকতার হাতছানিতে উজ্জ্বল আনন্দে সিঞ্চিত হলাম, এই হতে-হতে কিছু-না-হতে পারা আর কিছুই না-হয়েও নিজের মধ্যে কিছু-কে খুঁজে পাওয়ার অনুভব আমাকে কিছুদিন ধরেই ভেতরে ভেতরে নাড়া দিচ্ছিল। বাস্তবের সীমা রজ্জুবদ্ধ করে বাস্তবের আমিগুলোকে। কল্পনায়, স্বপ্নে কিন্তু পঙ্গুর কোনও বাধা থাকে না গিরি লঙ্ঘন করার, অন্ধের দৃশ্য অনুভবের এবং বোবার গান গাওয়াতে!

তাই আমার দেখা আমি আর আমার লেখায় আমি অন্ততঃ আমার কাছে আত্মজ তুল্য মূল্য ধরে। আমার সেই বিভিন্ন পোষাকের আমিগুলো আমাকে বিরক্ত করে। বিরক্ত করে বাইরে বেরিয়ে আসার, সকলের সামনে হাজির হবার, একটা সামাজিক অস্তিত্বে নড়াচড়া করার বাসনায়। এই সব পঙ্গু-অন্ধ-বোবাদের বোঝানো দায়। এবং এটাই আমাকে কিছুদিন ধরেই বিব্রত খোঁচাচ্ছে।

———

।। জল ।।

জল আমার জীবনের অনেক অভিজ্ঞতাকে স্থান দিয়েছে। জলের এক-নাম প্রাণ। পূর্ববাংলায় শৈশব-তারুণ্য এ সত্যকে জীবন দিয়েই অনুভব করেছে। এখনকার ছেলেরা এখানে জলকে ভয় করে, জলকে এড়িয়ে চলে। যেসব মা-বাবারা সচেতন তারা ছেলেমেয়েদেব সাঁতার শেখাতে জলের কাছে নিয়ে যায়। আর, আমাদের ছোট বেলায় জল আসত আমাদের কাছে, ঘরের দুয়ারে, রান্নাঘর, ঢেঁকিঘরের পাশে। সেখানে সারাক্ষণ ছলাৎ ছলাৎ করে হাতছানি দিয়ে ডাকত। কতোই রঙ্গ করত, কতো খেলা, কতো উদ্দাম দাপাদাপি ছিল সেই জলের দিনলিপিতে। আমাদের অত সময় ছিল না, ছিল না জলের মতো অনাবিল স্বাধীনতা। আষ্টেপৃষ্ঠে শাসনের রজ্জু বাঁধা আমাদের সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে অভিভাবকের শ্যেন দৃষ্টির বেড়াজালে আটকা পড়ে যেতো। তারই মধ্যে ফাঁক খুঁজে নিয়ে আমরা চলে যেতাম জলের কাছে, জলের মধ্যে, জলের নীচে।

সেই একেবারে ছোটবেলায়, যখন বন্ধন ছিল খুবই আলগা বা প্রায় অনুপস্থিত, প্রায় আমাদের জামাকাপড়ের মতোই, তখন ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা জলে থেকেছি। জলে ভিজেছি, জলে ডুব গেলেছি। এখানে কেমন যেন পুকুর গুলো হঠাৎই গভীর, অপরিষ্কার। দীঘি বলতে প্রায় কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায় না, নদীগুলো কেমন যেন যান্ত্রিক। আমাদের ওখানে জল ছিল বেশ ঢালু, মাঠের প্রায় সমতলে, জাঙ্গালের বালুতল মস্থনতায় নিঃশঙ্ক। শুকনোর সময়ে যে মাঠে ফুটবল খেলেছি সেখানেই আমরা থপ্‌থপ্‌ করে জল ছিটিয়ে দৌড়েছি বর্ষার প্রথম জলের দিনগুলোতে। জলের যেমন প্রথম উচ্ছ্বাসের দিন, আমাদেরও তেমনি প্রথম প্রথম হাঁটাথেকে দৌড়োনোর দিন। টলে যাই, পড়ে যাই, গড়িয়ে পড়ি। জলের সঙ্গে, জলের মধ্যে। সকলেই, একসঙ্গে। জলের ছলছলাৎ ছিটানির সঙ্গে আমাদের হাহা-হিহি-র পিচকারী। তখন আমরা কেউ ইজের পরি, কেউ বা পরিনা, কেউ এক চিলতে গামছা কোমরে, কেউবা তাও নয়! এই শৈশবের জল বিহার দু'এক মিনিটের কখনই হত না, ঘন্টায় মাপা হত সেই অবস্থান। হঠাৎ হঠাৎ আমাদের সঙ্গী

সংখ্যা কমে যেতো। একহাত ধরে উগ্রচন্ডী মূর্তি কারো মা-এসে হিড় হিড় করে কাউকে টেনে নিয়ে যেতো। বেশীর ভাগ সময়েই শূণ্যে ঝুলতে ঝুলতে যেতে হতো। এবং সেই সংগে চলত একদিকে শিশুর হাত-পা-ছোঁড়া আর তারস্বরে চিৎকার, অন্যদিকে মা-এর হাতের খেল চলত শূন্যমার্গে ঘোঝুল্যমান সন্তানের পৃষ্ঠদেশে, কানে চুলের মুঠিতে। অনেক পরে ভেবেছি কি করে নিজের সন্তানকে চিনে নিতে পারতো সেই মা'এরা! আমরা তো সবাই একই রকম কিম্ভুত-চেহারার ছ্যাতলা মুখে রক্ত-আঁখি বাঁদরে রূপান্তরিত থাকতাম। এবং জামা-প্যান্টে-ইজেরে যে চেনা যেতো না তা নিশ্চিত, কারণ সেগুলো আর ততক্ষণে কারো অঙ্গেই লেগে থাকতো না, ডাঙগার উপর ছুঁড়ে দেওয়া থাকত! তবুও তারা চিনে নিতে পারত এবং সে বোধহয় কোনও অলৌকিক শক্তির বলেই!

একমাত্র শীতকাল ছাড়া জল আমাদের অত্যন্ত আপন ছিল। জড়োসড়ো হয়ে আমরা এই সময়টা কাটিয়ে দিতাম। সকাল সন্ধ্যা বুড়োমানুষের মতো কাপড়ের খুঁটে, চাদরে, কাঁথায় আমরা পাটিসাপ্টা হতে চাইতাম। সকালের পড়াশুনো আর সন্ধ্যার পাঠাভ্যাস ছিল জুজুর মতো ভয়াবহ একটা ব্যাপার—হাত বার করতে হবে যে! কিন্তু দুপুরে স্নান করার সময়? আগের শীত বাঘেব গায়! সে ছিল এক অন্য বাঘের খেলা। জলে নামাটাই ছিল সমস্যা, একবাব ঝাঁপ দিতে পারলে আর কে কাকে পায়! কতো রকমের প্রক্রিয়ায় শীতের জলকে আপন করতে হয়েছে! রোদে পিঠ দিয়ে পাড়ে বসে অপেক্ষা। দেরি, দেরি, দেরি! তখন গামছা ফেলে দাও গোল পাকিয়ে, বা লম্বা করে, বা ভাঁজ করে। গামছার অবস্থাটি নির্ভর করবে কত দেরিতে জলে নামতে চাই; নামাতো নয় ঝাঁপিয়ে পড়া। গামছা তো ভিজতে সুরু করল, তারপরে একটু একটু করে ডুবতে লাগল, টিকি দেখা যায় কি যায় না, দে'লাফ, দে'ঝাঁপ! নাহলে ঐ গামছাটা খুঁজে পেতে বেলা হবে অনেক। আর যদি না পাওয়া যায়? গামছার শোক ভুলতে গামছার মালিককে অন্তত দশ-বিশ ঘা তো সন্তানের পিঠে দিতেই হবে! তাই পিঠ বাঁচাতে 'ঝাঁপ'। আর একবার শীতের ভয় ভেঙ্গে গেলে? চলবে তান্ডব, গা' যতো গরম হবে, স্নানের সময় ততই দীর্ঘ হবে। শেষ মুহূর্তে দৌড়, দৌড়, দৌড়। স্কুলের সময় তখন যাই যাই করছে।

তবে কালবৈশাখীতে যে ভেজার সুরু তার শেষ হবে আশ্বিন-কার্তিকের কৈমাছ, শিঙি মাছ ধরার মধ্যে দিয়ে। সে এক দীর্ঘ পরিক্রমা। মাঠ-প্রান্তর ভেঙে স্কুলে যাওয়া। খেলার মাঠও দূরে। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরতে যদি ঈশানের পুঞ্জ মেঘ দেখা গেল ঘোঁট পাকাচ্ছে তাহলেই আমাদের পা মন্থর হতে থাকলো। একদল একসংগে দলাপাকিয়ে ভিজে-কাঁথা হয়ে বাড়ি। দিশেহারা, উষ্কখুষ্ক চুল ধুলোয়-জলে মাখামাখি। সেই ঘাড় নীচু গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর দু'চার ঘা পিঠে পড়লেও তা মধুর লেগেছে বৃষ্টি-জলে ভিজতে পারার সার্থকতায়। বইখাতার প্রতি দরদ, পিঠের প্রতি দরদের মতোই, সেই সব বিকেলে একেবারেই তলানিতে ঠেকে থাকতো! যা থাকে কপালে, ভিজেতো নেই!

তার পরথেকেই সুরু হত স্কুলে যাবার সময় ভেজা, স্কুল থেকে ফেরার সময়ে ভেজা, খেলার মাঠে ভেজা আর খেলাশেষ হলে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফেরা। জলে বৃষ্টিতে ভেজার মহোৎসব সুরু হয়ে যেতো সেই সময় থেকেই। ভাবলে এখনও শিহরণ জাগে। মাইলের পর মাইল ফাঁকা প্রান্তর পেরিয়ে বৃষ্টি জলের করুণা-ধারা ধেয়ে চলে আসছে। আসছে আমাদেরই দিকে, সাদা সাদা ধোঁয়া-ধোঁয়া দিগন্ত ঢাকা বৃষ্টি এদিক-ওদিক ছুটছে। গ্রামগুলো একের পর এক অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। গ্রাম ছাড়িয়ে, মাঠ-ঘাট-জাঙ্গাল পেরিয়ে সেই দামাল বৃষ্টি-ঢেউ ছুটে চলেছে, ছুটে আসছে। আমরা অবশ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। যারা একটু ভীতু তারা দৌড়ে বাড়িমুখো ছুট দিতো, যারা ভিজতে চায় না তারাও কোনও আশ্রয়ে চলে যেতো। আমাদের মতো যারা জলের পোকা আর বৃষ্টি-মাতাল ছিলাম, তারা সেই আগুয়ান বৃষ্টি সমারোহের জন্যে অপেক্ষা করে থাকতাম। বড় বড় এক দু' ফোঁটা বৃষ্টি যখন টপাস্ টপাস্ করে মাথায়, কপালে হাতে আছড়ে পড়তো তখন যে কী আনন্দ হত তা বলা যায় না। তার পরেই এসে পড়তো ঝাঁক বাধা বৃষ্টির দল। ঝপ্ ঝপ্ করে খানিকটা ঝরিয়ে দিয়েই যেন খিলখিল করে হেসে চলে যেতো। যেন বলত "কেমন হল?" ততক্ষণে আমাদের হাতে, পেটে, পিঠে জামা লেপ্টে গেছে। জামার নীচে বই পত্র। আমরা নিজেদের অবস্থা বোঝার আগেই এসে যেতো মূল বৃষ্টি। চারদিক ঝাপসা করে দিয়ে বালতি বালতি মতো অঝোরে ঝরে পড়তো। কাক-ভেজা আমরা ধেই ধেই

করে ঘুরে ঘুরে নাচতাম আর ভিজতাম, ভিজতাম আর বেশী করে নাচতাম। বৃষ্টির অভিষেক!

যখন একা থাকতাম তখন বড্ড অসহায় বোধ হোত। হয়তো বসে আছি পূবদিকের দোতলার বারান্দায়। বৃষ্টি আসছে এলাকা জুড়ে। গভীর কুয়াশাচ্ছন্ন সেই ছুটে-আসা বৃষ্টির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতাম। পট্ পট্ করে সুরু করে কখন যেন ঝরঝর করে ওরা নেমে পড়তো। মা-এর শাসনে অথবা দৃষ্টিতে হাত-পা বাঁধা। সামনের পুকুরের চকচকে নিস্তরঙ্গ জলের উপর দিয়ে ছুটে চলে যাবার সময় বৃষ্টির ছর্ ছর্ ফোঁটাগুলো যে সঙ্গীত তুলে গেল তা শুধু দেখলামই, উপভোগ করতে পারলাম না! আশুপতন-সম্ভব বৃষ্টিতে যদি পুকুরের মাঝখানেই না থাকা যায় তা হলে যে জীবন বৃথা সে কথা শহরের ছেলেরা জানে না।

তাই সুযোগ পেলেই স্নান করতে ছুট দিতাম যদি দেখতাম বৃষ্টি দূরের গ্রাম ধরো ধরো হয়েছে। থমকে-থাকা পুকুরের মধ্যে চলে যেতাম, মাঝখানে। প্রথম-পড়া দু'চার ফোঁটাকে চোখে-মুখে-কপালে ল্যান্ড করিয়েই জলের তলায় সামান্য নীচে ডুব দিয়ে তাকিয়ে থাকতাম আকাশের দিকে, বৃষ্টির দিকে। স্বচ্ছজলের উপরে তখন পট্-পটাপট্ আদরের চাবুক চালিয়ে বৃষ্টির প্রথম দমক চলে যেতো। কী মধুর সেই শব্দ, সেই গান, সেই ছন্দ! আর দৃশ্য? পড়ছে, ফাটছে, ছুটছে, ছিটকাচ্ছে। জলের উপরে যেন চলমান ছবিরা দ্রুতলয়ে ছুটে চলেছে। এ-বারে মাথা তুললেই জলের আদর আপ্যায়নের মতো বৃষ্টি ধারার স্নেহকরস্পর্শ। ঝাঁকে ঝাঁকে আদর। চুল বেয়ে, নাক বেয়ে, চোখ ছাপিয়ে সেই আদর গড়িয়ে পড়ছে। তার পর সাঁতার কাট আর মাঝে মাঝেই জলের নীচে ডুব দাও। ভেসে উঠলেই বৃষ্টির একটানা শোঁ শোঁ সঙ্গীত, ডুব দিলেই তবলালহরার মতো অনুভব। একই অঙ্গে এতো রূপ, ধ্বনি, কথা, আর সুর একমাত্র জলে-বৃষ্টিতেই সম্ভব।

দিনের বৃষ্টিকে তো দেখতে পেতাম, অনুভব করতাম, অভিসিক্ত হতে পারতাম। রাতের বৃষ্টি বয়ে আনতো অপার বিস্ময়। কাল বিকেলে যে মাঠে খেলা করেছি, আজ সকালে সেখানে পা-পাতা-ডোবা জল। মাঠ কখন যেন জলে ভরে গেছে। সেই সেখানেই বিকেলে প্রায় হাঁটুজল। কেমন করে হয়? সকালথেকে তো বৃষ্টি নেই। জল গড়াচ্ছে, আসছে, জমছে। সাজ

সাজ রব পড়ে যেতো। জল যত বাড়ছে ঘাস লতাপাতাও ততই বাড়ছে। ধানক্ষেত হঠাৎ যেন জীয়ন-কাঠির ছোঁয়ায় ঝলমল করে উঠেছে। পাটক্ষেত আকাশকে আপন করে নিতে চায়। এই জল বাড়ার সময় থেকে সব ডুবে সমুদ্র হওয়া পর্যন্ত মাসাধিক কাল সময় আমাদের অভিযানের সময়। জল থেকে জলের মাছকে তুলে আনার অভিযান।

মাছ ধরারই তো কতো বিচিত্র প্রক্রিয়া ছিল আমাদের। ছয় থেকে দশ ইঞ্চি মতো জল হয়ে গেছে মাঠে। ঝুড়ি-ঝুড়ি কুঁচো মাছ তাদেব সহস্র সহস্র সন্তানসন্ততি নিয়ে ছুটোছুটি করছে। বাড়িঘর খুঁজছে যেখানে সংসার পাতবে, আমরা গামছা নিয়ে, সেই সব দিশেহারা উদ্বাস্তু মাছ-সংসারগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছি। আর হাঁড়িতে করে তুলে আনছি আমাদের রান্নাঘরের গন্ধকে ক্ষুধা উদ্রেককারী এবং রসনাকে তৃপ্ত করার জন্যে। প্রচুর তারা, আর সুপ্রচুর তাদের স্বাদ। ভাজা খাও, পাতলা ঝোল কর, অথবা পাতুড়ি! ভুলতে পারবে না জীবনে!

বাইরের জল ঢুকছে পুকুরে। নালা কেটে দাও। সেই জলের বিপরীত দিকে ছুটে যেতে চাইবে আবদ্ধ জলের পরাধীন মাছগুলো। পাগলের মতো তারা দল বেঁধে ছুটে যেতে চায় নোতুন জলের সন্ধানে। আমরা ছপ্ ছপ্ জল কাদায় ঝপ্ ঝপ্ বৃষ্টিতে ভিজে খপ্ খপ্ করে সেই সব পাগলপারা মাছেদের তুলে আনি আমাদের রন্ধনশালায়। তারা ছিল পুকুরের চার পাড়ের বাঁধনে আটকা, মেঘের ডাকে আর বৃষ্টির গানে তারা ছুটে চলেছিল নোতুন জলের স্বাধীনতায়। আমরা তাদের, কত না কৌশলেই, তুলে আনি পাষাণহৃদয় খাদকের নির্মমতায়। তবে, সেই ছোট বেলায় ঘরের বাইরের আকর্ষণ, জলে কাদায় চরে বেড়ানোর আনন্দ আর বৃষ্টিতে ভিজতে পারার স্বাধীনতা আমাকে বেশী আকর্ষণ করত। মাছ উপলক্ষমাত্র!

জলঘাঁটার অপার স্বাধীনতা পেতাম রাত্রে, এবং সকালে। বিশ্বাস না হয় তো আমার মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। অনুমতি নিয়েই চলত সেই অভিযান। সন্ধ্যায় বড়শী পাতা হত, আর প্রতি আধঘন্টা অন্তর সেই বড়শী থেকে মাছ ছাড়িয়ে হাঁড়িতে, খালুইতে বা অন্যকোনও পাত্রে তুলে আনতে হত। সংগে হারিকেন বা টর্চলাইট। মাছ দেখার জন্যে, ছাড়ানোর জন্যে আর নোতুন করে বড়শীতে 'আধার' সংযোজন করার জন্যে আলো চাইই।

তাছাড়া সাপের উপদ্রব! তা থেকে বাঁচার জন্যেও আলো আবশ্যিক ছিল।

তাজা নোতুন জল। ছ' থেকে আট ইঞ্চিমতো গভীর। জমির আলের ধারে, পুকুরের পাড় ঘেঁষে অথবা ঢালু জমির প্রান্তে। সন্ধ্যার সময় থেকেই শিঙি, মাগুর, ল্যাটা, কই, ট্যাংরা ইত্যাদি জিওল মাছ সব ধারে চলে আসতে থাকে। খাদ্য পেয়েই তারা বড়শীতে আটকে যায়। ছট্‌ফট্‌ করে, জল ছেটায়। সেই শব্দে আমরা টের পেয়ে যাই। মাছ ছাড়িয়ে আবার খাদ্য, 'আধার' দিয়ে পেতে দেই। ওইটুকু সময়েই অন্য বড়শীতে ছট্‌ফটানি সুরু হয়ে গেছে। ছোট সেখানে ; একটা ছাড়াতে ছাড়াতেই অন্যটায় ঝাঁকুনি। মাছ আর মাছ। আনন্দ আর আনন্দ যেন দলা দলা হয়ে মনের পাত্রে জমা হয়।

ফুট তিনেক লম্বা সরু বাঁশের ছিপ ; কঞ্চিকেও ব্যবহার করা যায়। মাথায় ফুট দেড়-ফুটের মতো সুতো, সেই সুতোর মাথায় ছোট্ট বড়শী। বড়শীতে কেঁচো গাঁথা, অথবা শামুকের মাংসল টুকরো। সেই বড়শী এক ইঞ্চি মতো জলের তলায় থাকে! ছিপটা থাকবে ৪৫ ডিগ্রী মতো কোণ তৈরি করে। গোড়াটা মাটিতে পোঁতা। সুতো লম্বভাবে ঝুলবে জল পর্যন্ত। অত্যন্ত সহজ সেই প্রক্রিয়া। এরকম ২০/২৫/৩০ বা তার চাইতেও বেশী বড়শী তিন চার ফুট অন্তর অন্তর জলের ধারে পুঁতে রাখ। এবং মাছ ধর। এই জলঘাঁটা, কাদা ঘাঁটা আর মাছ সংগ্রহ চলত রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত। রাত্রে উঠতে পারলে একবার যাও এবং মাছ তুলে নিয়ে আস। সকাল বেলায় মাছ ও বড়শী দুই-ই তুলে আনার পালা। দিনে মাছ খায় না।

এরকম অল্পজলে জাল ফেলেও মাছ ধরার ব্যবস্থা ছিল। সে একটু বড় হলে করেছি। জাল সকলের থাকত না। আর জাল রক্ষণাবেক্ষণও বেশ কষ্ট এবং কুশলতা দাবী করে। এক হাঁটু জলের মধ্যে জেলেদের মতো জাল নিয়ে এখানে সেখানে ফেলতে হত। ঝোপ জঙ্গল থাকলে জাল ফেলা যায় না। তাই যেমন পথে বা জায়গায় মাছেদের যাতায়াত এবং আড্ডা সেই সব জায়গায় আমরা ঘাস জঙ্গল দিনের বেলায় সময় মতো পরিষ্কার করে রেখে দিতাম। পরে সময় বুঝে সেখানে জাল ফেলতাম। জাল তুললেই জালময় সাদা চকচকে মাছের ছড়াছড়ি। মজা হত যখন জাল ফেলতে বেরিয়ে বৃষ্টিতে

ভিজতাম। নীচে জল, উপরে জল, এবং সামনে পেছনে জলের অফুরন্ত সম্পদ সংগ্রহের সেই অভিজ্ঞতা আজীবনের সংগ্রহ। অভিজ্ঞতার সংগ্রহ।

একটা সময় আসতো যখন হুহু করে মাঠে-প্রান্তরে জল বেড়ে চলত। পাট ক্ষেত একদিন দুদিন ডুবে থেকে ভেসে উঠতো। কিন্তু ধানের ডগাগুলোর কী তীব্র জীবনী শক্তি! তারা ডুবে যেতো না কখনই। কিছু সবুজ দেখা যেতোই। এবং পরদিনই খিল্‌খিল্ করে মাথা উঁচু করে সেই জলসমুদ্রের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ত, দুলে দুলে হাতছানি দিত। আর কাছে দূরের বড় বড় গাছগুলো তাদের অসহায় মুন্ডুগুলো ভাসিয়ে রেখে ভবিষ্যতের অপেক্ষা করত।

ছোট ছোট মাছের বাচ্চারা আর তখন ছোট নেই। তাই জলের গভীরতা আর মাছেদের যৌবন প্রাপ্তির কারণে তখন মাছ ধরার ব্যবস্থা-প্রক্রিয়াও পাল্টে যেতো। আমাদের সেই জ'লো দেশে বর্ষার সময় নৌকোই ছিল একমাত্র যোগাযোগের, যাতায়াতের, চলাফেরার, মাধ্যম। নৌকোয় করে তাই আমরা স্কুলে যেতাম, মামাবাড়ী যেতাম, মাছ ধরতেও যেতাম। সকাল বেলায় প্রস্তুতি চলত। চালের কুড়ো আর ভাত মিশিয়ে দলা পাকান হত। বেশ শক্ত হত সেই টেনিসবলের মতো মৎসখাদ্যটি। একটা দেড়-দু' ফুট লম্বা পেটো দড়িতে বা সুতোয় তাকে ঝোলান হত। সেই সুতোর প্রান্তটি পাট কাঠির সংগে বেঁধে দেওয়া হত কাঠিগুচ্ছের মাঝ বরাবর। এর ফলে একটি খুড়োর কল তৈরী হত মাছেদের জন্যে। জলে কাঠিগুচ্ছের সাহায্যে খাদ্য-গোলকটি ভাসতে থাকত। মাছ তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে সেই খাদ্যের লোভে জলের মধ্যে ঝুলে-থাকা সেই 'বড়েল'টিকে ঠোকরাতে থাকত। খাদ্যগোলক দুলছে, দুলছে আর সরে সরে যাচ্ছে! স্বচ্ছ জল। সব দেখা যায়। ঝাঁকবাঁধা মাছের দল উপরে নীচে পাশে খাদ্যগোলকটিকে নিয়ে তোলপাড় করে চলেছে। তাদের চিকন্ মসৃণ উজ্জ্বল খাদ্যান্বেষণ শিল্প সৌন্দর্যে ঝক্‌ঝক্ করে উঠছে। কিন্তু কবির জন্যে, কবিতার জন্যে এতো ব্যবস্থাতো করা হয় নি! তাই সুরু হয় হনন! পাকা ব্যবস্থা। ছোট্ট একটি ছিপ। তার ডগায় বাঁধা সুতোয় বড়শী আটকানো। বড়শীতে মিনি পরিমাণ খাদ্য লটকিয়ে দিয়ে জলের মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা মাত্র। ভীড়ে বিরক্ত মাছেরা ছুটে আসে সেই পতন-উন্মুখ বড়শীর খাবারের লোভে।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু! তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় না বটে তবে উত্থান ঘটে। এক ঝট্‌কায় নৌকোর খোলের মধ্যে। টপাটপ্‌। হন্তারকের দ্রুততায় এবং কৌশলে অচিরেই নৌকোর খোলে রুপালীছটা ঠিকরিয়ে পড়ে। সে এক অফুরন্ত মজা আর আনন্দের ভোজ চলে। অরণ্যদেব যেমন গাছের উপর বসে চলমান ঘোড়সওয়ার দস্যুকে হাইজ্যাক করে নেয় আমরা তেমনি বকধার্মিকের নৈঃশব্দে বুভুক্ষাতাড়িত জলচরদের হাইজ্যাক করে করে সংগ্রহ করতাম। বৃষ্টি হলেও নিস্তার নেই। কারণ সঙ্গে ছাতা থাকবেই। নৌকোর গলুইয়ে বসে নিশ্চিন্ত নীরবে এই মৎস্য-উৎপাটন প্রক্রিয়া ছাতার আড়ালে নির্বাধ চলতে থাকবে। সন্ধ্যা পর্যন্তই এ'কাজটি চলতে পারবে। এবং স্ফীতবক্ষ গৃহ প্রত্যাবর্তনটি হাস্যমুখ ভোজনের সম্ভাবনায় সর্বদাই উল্লাসের কারণ।

গুরুরা আর হাদানবা ইউক্লিড ছিল না, ছিল না আর্যভট্টের মতো গণিতজ্ঞ। কিন্তু লম্ব, কোণ, দূরত্ব এবং কর্ণ-প্রলম্ব বিষয়ে ওদের কারো কারো এমন নিশ্চয়তাবোধ ছিল যে একমাত্র দেখলেই বিশ্বাস করা যেতো। আমি বা আমরা তখন সে কৌশলের অ আ ক খ-ও জানি না। দাদা জানতেন। জীতেনদা। কৌশলটি অত্যন্ত সরল কিন্তু তরবারি-তীক্ষ্ন নৈপুণ্যের দাবী রাখে। জলের গভীরতা দশ পনেরো ফুট। ধানের ক্ষেতে ধান গাছগুলো সেই অনুপাতে তের-আঠারো ফুট লম্বা। স্রোতের গতিতে সেই সব ধানের গাছগুলো স্বাভাবিকভাবেই হেলে থাকতো। ধানের মাথা দেখে তার গোড়া কোথায় তা নির্ণয় করতে হবে। এবং সেই ধানশীষ যখন তির্‌তির্‌ করে ঝলকে ঝলকে নড়তে থাকবে তখন বুঝে নিতে হবে কোথায়, কত নীচে সেই জলজ প্রাণীটি শেওলাকে তার খাদ্য করে নিয়েছে। একবার ভাবুন কী অসীম অভিজ্ঞতা, ক্ষুরধার নৈপুণ্য দরকার সেই পোনা রুই কাতলা বোয়াল বা আ'ড় মাছটির জলতলে অবস্থানের গ্রীড রেফারেন্স নির্ণয় করা। দাদা এবং গুরুবর শতকরা নব্বুই ভাগ ক্ষেত্রে একবারে নির্ণয় করতে পারতো! এবারে পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং যন্ত্র। একটি সরু বাঁশের, প্রায় পাঁচ সাত ফুট লম্বা, ডগাদিয়ে যন্ত্রটি তৈরী। তার অপেক্ষাকৃত মোটা দিকে একটি লোহার এক নালি বা ত্রি-নালি সংযুক্ত করা হত। বড়শীর মতো আটকালে ছাড়ানো অসম্ভব করে সেই লৌহশলাকার অগ্রভাগ বিপরীত মুখী

হুক করে বানানো হত। এই বাঁশের ডগায় একটি দড়ি বাঁধা হত। কারণ বৃহৎ হলে মাছের শক্তিও অনেক হবে এবং বিদ্ধ অবস্থায় সে অনেক দূর দৌড় দেবে। এই যন্ত্রটিকে বলা হয় 'এড়া' বা 'যুতি'।

এবারে কল্পনার চোখে দেখুন। নৌকো করে দুজন যাচ্ছে। (একজনেও হয় তবে একটু অসুবিধা।) একজন চালক এবং সদাজাগ্রত অনুসন্ধানী। অন্যজন সামনের গোলুইতে দাঁড়িয়ে 'এড়া' হাতে সন্ধানীদৃষ্টি। নৌকো যাচ্ছে। মনে করুন ঘন্টায় আধমাইল বা তারও কম। মনে হবে জলও টের পাচ্ছে না যে একটা নৌকো চলছে। বকের চাইতেও সন্তর্পণে এগুতে হবে। ধানগাছ নড়ছে; সেই নড়া চড়ার তীব্রতা, জলে তৈরি তিরতিরে রিপলস্ বা ঢেউ মাপা এবং ইত্যাদি দেখে মাছের প্রকৃতি এবং অবস্থান নির্ণয় করা, নৌকায় এতটুকু কম্পন না তুলেই সেই এড়াকে 'মিসাইলের' মতো তীব্র গতিতে জলের নীচের সেই অ-দৃষ্ট মাছের দেহে প্রোথিত করে দিতে হবে। শব্দ-ভেদী এড়া নয়, জ্যামিতিক অনুভবেই এড়া ক্ষেপন সম্ভব। এবং মাছ যদি বড় সড় হয় তাহলে তার পেছনে পেছনে নৌকো নিয়েই ছুটতে হবে যদিও হাতে দড়ি রয়েছে। দু আড়াই সের থেকে দশ বার সের পর্যন্ত জলচর বাঙগালীভক্ষ্যদের সংগ্রহ করে আনা ছিল অনেকেরই 'বাঁয়া হাত কা খেল' মাত্র। দেখেছি কিন্তু কখনও চেষ্টা করার সুযোগ হয় নি। দেশছাড়া হয়ে গেছি। সেকি মাছেদের অভিশাপেই?

তবে ওতপেতে বসে থেকে মাছ ধরেছি। নৌকোর মাঝখানে বেশ পাকাপোক্ত আসনে বসে জলের তলার যে জগৎ সেই জগৎ দেখতেও ভাল লাগতো, মাছ ধরতেও শিহরণ জাগতো। রাস্তার পাশে খাল। খালে স্রোত। স্রোত বেয়ে ছোট বড় মাছেদের যাতায়াত চলত। পাশে হয়তো ধানক্ষেত। অনেকদূরে থেকে বেড়া দিয়ে দিয়ে মাছেদের গতিপথকে সংকীর্ণ করে একটা দরজামতো পথ দিয়ে যেতে বাধ্য করা হত। সরলমতি সেই সব জলচরদের মাথায় মানুষের শয়তানী বুঝে-ওঠার মতো ঘিলু ছিল না। ইলিশমাছ ধরা জালের মতো কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত জালের মুখ সেই দরজার কাছে খুলে রাখা হত। একটি অত্যন্ত হাল্কা কিন্তু সরু বাঁশের মাথায় জালের নীচের কাঠামোটি বাঁধা থাকতো। উপরের কাঠামোটি নৌকোর সঙ্গে বাঁধা। যেন জালটি শক্ত কাঠামো-ঠোঁটে হাঁ করে মুখব্যাদান করে পড়ে আছে। জালের আবদ্ধ অংশ

স্রোতের টানে অনেক দূর পর্যন্ত প্রায় গোলাকার হয়ে অপেক্ষায় আছে। এটাকে উদর বলা ভাল। নৌকোটি নিথর বাঁধা। মাঝখানে উবু হয়ে বসে একটা ফুটো দিয়ে জলের একেবারে নীচে পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যাচ্ছে। আশে পাশে আলো ঢোকার সব রাস্তা বন্ধ করা। কচুরিপানা শ্যাওলা ইত্যাদি দিয়ে এ কাজটি করা আছে। জায়গাটা এমন ভাবে পরিষ্কার করা যে একটা আলপিন মাটিতে, জলের নীচে, থাকলেও তাকে দেখা যায়।

এই অবস্থায় নৌকোর মাঝখানে হাঁটু মুড়ে উবু হয়ে চোখের দু'পাশে দু'টো হাত দিয়ে আলো বন্ধ করে মাছেদের যাতায়াত দেখতে হবে। সেই যে বাঁশের ডগাটির কথা বলেছি, যার নিম্নপ্রান্তটি জালের নীচের ঠোঁটের সংগে বাঁধা, সেই বংশদন্ডটি মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় দৃঢ় করে ধরা আছে হাতে। এই পদ্ধতিটি মাছের জন্যে যেমন মর্মান্তিক, মেছুড়ের জন্যেও। কারণ অপেক্ষাই এখানে প্রধান অস্ত্র। ঠিক সময়ে মাছের ঠিক ঝাঁকটিকে যদি আটকানো না যায় তাহলে সবই বৃথা! ছোটবড় নানান দলে মাছেরা দলবদ্ধ যাতায়াতে অভ্যস্ত। একটা ছোটদলকে আটকাতে গিয়ে একটা বৃহৎ এর দলকে হারাতে হতে পারে। আবার অতি লোভে তাঁতি নষ্ট হবার সম্ভাবনাও আছে। বড়র লোভে সারা দিন বসে থেকে একমাত্র জলের প্রভাবে ফোলা ফোলা চোখ নিয়ে, বৃষ্টিভেজা শরীর নিয়ে দিনান্তে ঘরে ফেরা ব্যাপারটাও অসম্ভব নয়। তাই এখানেও অনেক অভিজ্ঞতা সিদ্ধান্ত এবং ইনট্যুইশনের প্রয়োজন। তাছাড়া একবার টান দিলে প্রায় একঘন্টা লেগে যাবে নোতুন করে সব ব্যবস্থা পত্তন করতে। তবে এ ব্যবস্থায় একটি টান দিতে পারলেই মাৎ। নৌকো ভর্তি জীবন্ত রুপো নিয়ে ঘরে ফেরা সম্ভব! অনেক করেছি, অনেক ভিজেছি, অনেক পেয়েছি এবং হতাশ হয়েছি। আবার জল যখন সরে যায়, নেমে যায়, কমে যায় তখন সব ব্যবস্থাটাই পাল্টে যায়। পুকুরের কানা দেখা দিয়েছে। মাঠের কোথায়ও কোথায়ও ছপ্‌ছপে জল, কোথায়ও বা ডাঙগায় পাখিদের মহোৎসব চলছে। গ্রামের ছোটছোট ছেলেমেয়েদের শামুক, ঝিনুক আর কাঁকড়া খোঁজের ধুম লেগে গেছে। বাড়ির ঘাটে ঘাটে ছেলে-মেয়ে-বৌদের বাসনমাজার ফাঁকে ফাঁকে লম্বাছিপ বড়শী দিয়ে ট্যাংরা-পুঁটি ধরার কসরৎ চলছে। বড়দের দৃষ্টি এড়িয়ে বৌ-ঝিদের এই মাছধরার অভিযান যত না মাছের জন্যে তার চাইতে অনেক বেশী হাসিতামাসা হৈহট্টগোলের অনাবিল স্বাধীনতা ভোগের

মানসে। এমনি করে গ্রামের দ্বিপ্রহর কেটে গিয়ে যেমন সন্ধ্যা আসে তেমনি পুকুরের জলও ক্রমশ কমে গিয়ে আমাদের জলকেলি আর মৎস শিকারের আওতায় চলে আসে।

তার আগে আমাদের পানকৌড়ি অস্তিত্বের কথাটা বলে নেওয়া যাক্। ভরন্ত বরষায় যখন দিকদিগন্ত জলে জলময় হয়ে যায়, কোথায়ও কোনও সীমানা থাকে না, মাঠঘাটের অতীত চেহারাগুলো ভবিষ্যতে নিয়ে যাবার জন্যে আ-চিবুক নিমজ্জিত বড় বড় গাছগুলো তখন জলে আকাশে খাবি খায়। যে সব বড় গাছের ডালগুলো মই ছাড়া ধরার কথা ভাবতেই পারি না সেইসব ডালগুলো চলে আসে জলে ভাসমান আমাদের হাতল হয়ে। হাঁপিয়ে পড়া ছোট ছোট সাঁতারুরা সেই সব মগডাল ধরে ধরে বিশ্রাম নিতে পারে! এখন আধঘন্টা থেকে একঘণ্টার কম সময়ে স্নান শেষ হতে চায় না। এবাড়ির পুকুর থেকে সেবাড়ির পুকুর হয়ে আমরা ডুব গেলে আর সাঁতার দিয়ে, ডিগবাজি খেয়ে আর ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে আমাদের চাঞ্চল্য প্রকাশ করি। সেই আমাদের পানকৌড়ি জীবন হঠাৎই এক সাতচল্লিশে হারিয়ে গেল।

নৌকো 'বাইচ' ছিল তখনকার এক অন্যতম আকর্ষণ। প্রতিযোগিতা একদিকে ছিল দৈনন্দিন। স্কুলে যেতে এ-নৌকোর সংগে সে-নৌকোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই করতে গিয়ে জল ছিটিয়ে আর নৌকো ডুবি করে কতদিনই যে ভিজে-বেড়ালের মতো শিক্ষকের সামনে ছুটির আবেদন করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কখনও বৃষ্টিতে ভিজেছি কখনও বা নিজেরা পরস্পরের লগিবৈঠার তাড়নায় ভিজে-ভিজিয়ে দিয়েছি। জলে ডোবা আর জলে ভেজা তাই আমাদের নিত্যেও ছিল নৈমিত্তিকও ছিল।

এই প্রসঙ্গে অন্য দু'টো কথা বলে নি। ডুব দিয়ে গভীর পুকুরের তলা থেকে মাটি তোলা আর একডুবে পুকুর পাড়ি দেওয়া। এ-দু'টোর মধ্যেই একদিকে ছিল ফাঁকি আর শয়তানী, অন্যদিকে ছিল চেষ্টা আর কষ্ট। মনে আছে একবার এক এঁদো পুকুরে মাটি তোলার বাজি ধরে মাটি তুলতে গিয়ে প্রায় সর্বনাশের দুয়ার ছুঁয়ে এসেছিলাম। যেহেতু বাজি তাই, বহু পাহারার চোখের সামনে ফাঁকি না দিয়ে সত্যিই মাটি তুলতে জলের গভীরে চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তল কোথায়? দম শেষ, আরও নীচে নামছি, নামছি, নামছি! ফেরার রসদটুকুও প্রায় যখন নিঃশেষ তখন পায়ে মাটি ঠেকল।

দম শেষ ! মাটিকে হাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে পায়ে পৃথিবীকে ধাক্কা দিয়ে যখন উপরের দিকে উঠছি তখন চেতনা প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। অবশ দেহ, শূন্য মস্তিষ্কে, আলুথালু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সেই পুকুরের জল ছিল রৌদ্র-আলো-হাওয়া হীন। তাই ভীষণ ঠান্ডা এবং ভারি। সেই অবশ শরীরে অবশিষ্ট যে চেতনাটুকু ছিল তা পূর্ণ ছিল কর্ণপটাহের বেদনাবোধে। হাতুড়ির ঘা পড়ছে কানের মধ্যে ; টন্-টন্ করছে মধ্য কর্ণ। আমি যে বেঁচে আছি তা বুঝেছিলাম ভেসে থাকতে পারছিলাম বলে, এবং তখনও হাতের মুঠো খুলে যায় নি বলে। ক'এক মিনিট দম নিয়ে যখন চোখ মেলতে পারলাম তখন বুঝলাম এ-যাত্রায় ফিরে এসেছি। প্রতিজ্ঞা করলাম, সেই জলশয়ানেই, জীবনে আর কখনও অজ্ঞাত পুকুরের মাটি নয় ! বেঁচে থাকা আর প্রায় মৃত্যুর মধ্যে যে সব ফুল চোখের পর্দায়, বন্ধ থাকলেও, ভেসে ওঠে তাদের অনেকগুলোই সে যাত্রায় আমার দেখা হয়ে গেছে। ফুলের, তারার ছড়াছড়ি। তবে তার মধ্যে একটিই মাত্র চিনতে পেরেছিলাম। সর্ষেফুল !!

তবে একডুবে এপার ওপার নয়, প্রকৃতই একডুবে এপার থেকে ওপার যাওয়াটাও একটা বড় অভিজ্ঞতা। দম রাখা, দ্রুততা এবং সবচাইতে বড় কথা গতিপথ সোজাসরল রাখাটা একটা সমস্যা। অন্যথা অকারণে অনেক পথ অতিক্রমণ করতে হয়। একাজটি অনেকবারই করেছি। কী উত্তেজনা, কী আনন্দ পেতাম ! সাফল্যের চাইতে সফলতা নেই ! যে কোনও প্রতিযোগিতায়ই তো জয়টাই সবচাইতে বড় নেশা। সেই নেশায় আমাকে পেয়ে বসেছিল। তার পরে, অনেক বড় হয়েও, সাঁতরিয়ে এপার ওপার করাটা নেশা ছিল। সঙ্গী পেলে তো কথাই নেই, দর্শক পেলেও চলতো। পুকুর ছেড়ে দিঘি, দিঘি ছেড়ে নদী। একেবারে ছেড়ে দিলাম খবরের কাগজে গঙ্গায় দুর্ঘটনার খবর পড়ে। আর তাছাড়া সময়, মন এবং সুযোগ একবার সরে গেলে ফিরে আসে না। তাই জল আমাকে অনেক বারই হাতছানি দিয়েছে কিন্তু কখনই আর ধরে নামাতে পারে নি। এখন তো প্রশ্নই ওঠে না।

একটা ঘটনার কথা বলি। নৌকো বাইচের ফাইনাল রাউন্ড। আমরা বলতাম 'বাচাড়ী', অন্যে বলে 'ছিপ'। প্রত্যেক নৌকোয় সমসংখ্যক বৈঠাল এবং একজন হালি। প্রতিযোগিতায় রেষারেষি ঢুকে পড়াটা অস্বাভাবিক নয়। খেলার অঙ্গই হয়ে গেছে। সরখেল চক্রবর্তী ভট্টাচার্যদের পরপর

পুকুর পার হয়ে সমাপ্তিরেখা। সুরু অনেকখানিই পশ্চিমে সাধারণ সড়কের ধারে। এই জল-পথের এখানে সেখানে আকণ্ঠ জলে দাঁড়ানো গাছের মাথা দেখা যায়। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ধাবমান নৌকোগুলোর ডানদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে যথাক্রমে সরখেলদের, চক্রবর্তীদের এবং ভট্টাচার্যদের বাড়ি। পূর্বদিক অফুরন্ত ফাঁকা জলরাশিতে সুপরিসর। প্রত্যেক বাড়ির ঘাটে একাধিক নৌকো। তারই একটা নৌকো, সেটা ছিল আমাদের নিজস্ব, খুলে নিয়ে কখন খেলা করতে করতে একটু বেশী জলে চলে গেছি। খুবই ছোট তখন। নৌকোকে একা বাগমানানোর মতো হাতের জোর বা অভিজ্ঞতার পুঁজি কোনওটাই ঘটে নাই। ওদিকে সকলের দৃষ্টি দূরে দৃশ্যমান ধেয়ে আসা ছিপদু'খানির দিকে। তারমধ্যে যেখানা বা দিকে, পূর্বদিকে, সে চেষ্টা করছে তার ডানদিকের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিপখানাকে ক্রমশই কম জলের দিকে সরে যেতে বাধ্য করতে। চেপে দিতে চাইছিল বোধ হয়। এ সব আমার পরে শোনা। অবস্থা যখন নিশ্চিত সংঘাতের তখন চারদিকের 'গেল গেল' রবে আমার সম্বিৎ এলো। জীবন্ত ছুটন্ত দানোর মতো ছিপ দু'খানা আমাকে গ্রাস করতে এসে পড়ল আমারই ঘাড়ের উপর। লাফ দিয়ে জলে ডুব! খানিকটা দূরেই আকন্ঠ নিমজ্জিত একটি গাছ ছিল। বোধহয় আমাকে আশ্রয় দেবার জন্যেই! সেখানে তো নিশ্চিন্ত হয়েছি। কিন্তু ওদিকে যে ধুন্ধুমার কান্ড লেগে গেছে। প্রতিযোগিতা শেষ, চারদিকে লোকের ছুটোছুটি সাঁতার। নৌকোর দল আমাব খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। জাল আন, খুঁচিয়ে দেখ, ডুব দাও। কতো রকমের নির্দেশ তান্ডবের মতো ঘটে যেতে লাগল। প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি বৈঠাবৈঠি অবস্থা। তার সঙ্গে দর্শকরা মিলে সে এক নরক গুলজার, সর্বনাশা পরিস্থিতি। কেউ আমার অবস্থান জানে না। আমি তো ভয়ে থ' হয়ে গেছি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। চারদিকের ভূমিকম্প-পরিস্থিতির কতটা বুঝেছিলাম জানি না, কে আমাকে শুভবুদ্ধি দিল তাও আজ আর জানা যাবে না। হঠাৎই আমি কেঁদে উঠে চিৎকার করলাম "আমি মরি নি, আমি এখানে"। উত্তাল সমুদ্রে যেন তেলের প্রসার ঘটল। "পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে" বলে সকলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠতেই চতুর্দিকের তান্ডব থেমে গেল। সকলেই অন্যসকলের দোষ দিতে থাকল; আমাকে কেউ দোষী করল না দেখে আমার চোখের জল

আর মনের ভয় ঘুচে গেল। সেদিন যে কেন কারো কাছে মার খাই নি, এমন কি আমাব মায়ের কাছেও না, তা অনেক দিন পর্যন্ত আমার কাছে চীনের ধাঁধা হয়ে বাসা বেঁধে ছিল!

মাছে জলে মাখামাখি এ লেখায় আর একবার মাছের আসা দরকাব। বলতে বলতে থেমে গেছিলাম। জল যখন কমে যায়, পুকুরের পাড় যখন ভেসে ওঠে তখনকার মাছ শিকারের প্রকৌশলও কম উদ্দীপনাময় নয়!

খ্যাপলা জাল সকলেরই জানা এবং দেখা। তাকে বাদ দিলাম। যদিও যারা শিখে নিতে পারে তারাই বেশ গোল করে জালকে জলে ছড়িয়ে দিতে পারে। একটু ত্রুটি হলেই জাল দলা পাকিয়ে যায়। আর জাল ব্যবহারের সব থেকে যন্ত্রণাদায়ক অংশ হল জালের রক্ষণাবেক্ষণ, রিপেয়ারিং। অত্যন্ত কুঁড়ে কাজ কিন্তু আবশ্যিক।

দ্বিতীয় পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। কচুরিপানারা ততদিনে ধার ঘেঁষে বেশ দূর পর্যন্ত তাদের পরিবার বিস্তার করে ফেলেছে। যেখানেই কচুরিপানা আছে সেখানেই, তাদের নীচে এবং দাড়ির মধ্যে মাছেরা বাসা বেঁধে আছে। ছোটদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ এবং উদ্দীপনাময় এই কচুরিপানার ঝুঁটি টেনে পাড়ে তোলা এবং মাছ সংগ্রহ কবা। কৈ, শিঙি, মাগুর, রয়না-ভ্যাদা। কপাল ভাল হলে দু'চার গুচ্ছের ঝুঁটি টেনেই সংসারের দু'বেলার সংস্থান হয়ে যাবে!

চিংড়িরা তো রানীর মতো। তাই তাবা বেশ আরামে জলজ-ঝাঝির মধ্যে বাসা বাঁধে। ঝাঝিগুলোও তো রানীদের ঠ্যাং-এর মতো. তাই চিনে নিতে অসুবিধা হয় অনভিজ্ঞদের। একটু কাছে চোখ নিলেই দেখা যাবে ফর্সা ফর্সা সুন্দরীরা চারদিকে গিজগিজ করছে। ধরা হবে কি করে? 'হোচা', গামছা বা একেবারে সোজাসুজি ঝাঝি স্তূপকে মুষ্টিবদ্ধ করে তড়িৎগতি পাড়ে তুলে আন। পালাবার পথ থাকলেও সময় পাবেনা। তাছাড়া চিংড়িরা জলে বেশ গতিশীল হলেও ডাঙগায় একবার তুলতে পারলে অষ্টবক্র-চলন এবং সুতরাং মন্থর! তুলে নাও আর জিভের জল তখনকার মতো রুদ্ধ করে ঘরে ফের!

অল্প জলে, কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে ছিপ ফেলে বকের মতো ধর্ম সাধনা করতেও পার। ফল পাবে, তবে অপেক্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে না-ও হতে পারে। তাই দিনান্তে যেখানে হতাশার সম্ভাবনা আছে সেখানে

কোনও পরামর্শ দেব না। ছিপ দিয়ে মাছ ধরা তখন বেশ কুঁড়ে কাজ। বুড়োদের সাজলেও আমাদের জন্যে কদাপি নয়।

জলের মধ্যে নৌকো ডুবিয়ে রাখ। এখন তো আর নৌকো চলবেনা। তাই নৌকোও ভাল থাকবে মাছেরও সংস্থান হবে। কি ভাবে? কিছু খড় বা নাড়া নৌকোর খোলের মধ্যে পেতে দাও। আর দাও দু'চার খানা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ডালপালা। এবারে নৌকোকে জলে ডুবিয়ে দাও। চার পাঁচ দিন পরে আস্তে আস্তে সেই নৌকোকে অপেক্ষাকৃত গভীর জল থেকে পাড়ের দিকে টেনে আন। দেখ যেন মাছেরা টের না পায়। এই জিওল মাছগুলো বড়ই চালাক। ছুট্-ছাট্ লাফ দিয়ে নৌকো থেকে বেরিয়ে যাবে। তাই অত্যন্ত সন্তর্পণে ধারে এনে দু'চার জন মিলে এক ঝটকায় টেনে জমিতে তুলে ফেল। এই সময়ে দু'চারটে দশ-বিশটা লাফিয়ে পালাবে তো বটেই তবে যা থাকবে তাতে চক্ষুস্থির হয়ে যাবে এখানকার যেকোনও হোলসেল দোকানদারের! গুছিঁয়ে রাখ, পুষে রাখ, দান-বিলি-মোচ্ছব কর। নৌকোকে আবার অবশ্যই সাজিয়ে গুছিয়ে জলের নীচে ফাঁদ করে পেতে রাখ। দেখবে মাছ-ভাতের কষ্ট হবে না।

অনেকেই পুকুরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় এমন করে তৈরী করেন। মাঝখানের বাঁধটি একটু নীচু। এবারে যখন দু'ভাগ হয়ে গেল, কারণ জল বেশ নেমে গেছে, তখন এক পাশের জল অন্য পাশে চালান করে দাও। ক্রমশ দেখতে পাবে মাছের আড়ত! তুলে নাও আর চালানের ব্যবস্থা কর। এভাবে এক সঙ্গে সব মাছ তুলে দিলে ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক। তাই অনেকেই এটা পছন্দ করতেন।

জল আরও কমে গেছে? তাহলে সুরু হল হাত দিয়ে সোজাসুজি মাছকে তুলে আনার কলাকৌশল। বেশ 'রিস্কি' ব্যবস্থা। যাদের কাঁটা আছে, শিঙ্গি মশাই, মাগুর বা অন্য কাঁটাওয়ালা জলজ প্রাণীরা শিং উঁচিয়ে তাড়া করবেই তো! অর্থাৎ সুযোগ পেলেই কাঁটার আঘাত করবে। সে বড় মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। তবে কাঁটা হেরি কে কবে ক্ষান্ত হয় কমল রূপ মৎস তুলিতে? তাই মাছও যেমন হাত দিয়ে তোলা আমাদের নেশা ছিল, কাঁটার আঘাতে জর্জরিত (জ্বর-জ্বরিত ও) আমরা আছাড়ি-পাছাড়ি চোখের জলে নাকের জলে উলটিপালটি গড়াগড়িও কম দেই নি পুকুর পাড়ে, সিঁড়ির ঘাটে,

মেঝেতে আর দাওয়ায় ! কিন্তু কুহকিনী জল যে কি মন্ত্র আমাদের কানে দিত, আমরা আবারও নেমে যেতাম সেই মাছের আশায় জলের মধ্যে।

প্রক্রিয়াটা কেমন ? আস্তে আস্তে পা বাড়াও, কোমর থেকে শরীরকে অনুভূমিক করে জলের উপর ভাসিয়ে রাখ। দুটো হাতকে 'এ্যনটেনা' বা রাডার-এর মতো তীক্ষ্ন অনুভবে সমৃদ্ধ রাখ। খুব ধীরে, শনৈঃ শনৈঃ এগুবে, হাতে-পায়ে মাছের অবস্থান অনুভব করতে থাকবে। মাছগুলো পায়ের চাপে তৈরী হওয়া পুরোনো গর্তের মধ্যে অবশ্যই বাসা করে থাকে। যেই টের পেলে অমনি বুঝে নাও কি মাছ, কত বড় এবং তার স্বভাব-চরিত্রটি মাথায় খেলিয়ে নাও। এবং অনুভবে নিশ্চয় করবে তার মাথাটা কোথায়, কোন দিকে রয়েছে। ঘোড়ার যেমন পেছনে যেতে নেই, জলের নীচে মাছেরও তেমন ল্যাজে হাত দিও না। এটা আপ্ত বাক্য জানবে। মাথা খাও, মাথাটাই চেপে ধরবে, কখনই হালকাভাবে নয়, বেশ চাপ দিয়েই। যেন নড়াচড়া করতে না পারে। এবারে তো নিশ্চয় হয়ে গেলে কাঁটাওলা না আঁষওলা ! আঁষওলা হলে হাল্কা মনে শিশ্ দিতে দিতে তুলে আন এবং পাত্রজাত কর। কিন্তু যদি দেখ পিছলা পিছলা ? খুব হুঁসিয়ার। একটু এদিক ওদিক হলেই তোমার দফা ঠান্ডা করে দেবে। তাই এবারে হাতের কৌশল। অনেক অভিজ্ঞতায় সে কৌশল রপ্ত করা সম্ভব। এবং অনেক কাঁটার জ্বালা সয়েই। চাপ রাখ হাতের তালুতে। মাছকে পেছলাতে বা নড়তে দেবে না। পুঁতে যাবে পাঁকের মধ্যে ? তা যাক, তোমার কি ? এবারে সেই অবস্থায় হাতকে স্থির রেখে তর্জনী ও মধ্যমাকে সাঁড়াশি করে তোল। ধীরে ধীরে সাঁড়াশি সেই পিছলা-প্রাণীর কানের পাশে বসিয়ে দাও। ভয় নেই কাঁটা দুটো অবশ্যই এরোপ্লেনের পাখনার মতো ছড়ানো অবস্থায় থাকবেই ! বিপদ দেখে সব প্রাণীর মতো ওরাও ওদের 'শিং' উঁচিয়ে, মানে, ছড়িয়ে রাখে। এবারে, নিশ্চয় হয়ে, আঙুল-সাঁড়াশিতেই তুলে আন। যদি দেখ আট-দশ ইঞ্চি পরিমাণ, তাহলে কী অসীম আনন্দ হবে ভাবতে পার ? মাছ-ধরা এ্যামেচারকুলে তোমার স্থান হবে সর্বোচ্চ। সে তো এক অপার আনন্দ। কি, পছন্দ হবে ?

হ্যাঁ, কখনও কখনও 'তারা' হাতের নীচে চলে আসে বৈ কি ! ওরাও তো মাছের ভক্ত ! যদি সেই সাপ পড়েও হাতে তাহলেও ঘাবড়াবে না। কারণ ওরা কেউই গোখরো বা কেউটে নয় ! কি আর হবে ? যদি কামড়ায়ই তাহলেও

দু'চার দিন ক্ষতটা থাকবে, ঘা-ও হতে পারে। কিন্তু সেরে যাবে। দুব্বো ঘাস দাঁত দিয়ে চিবিয়ে সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়ে দিলে মিটে গেল।

কিশোর তরুণদের একটা বিশেষ যন্ত্র ছিল। 'ফুলকুচি'। ছাতার সিক অর্ধেক করে কেটে নিতে হয়। প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা করে তীক্ষ্ন করে নাও। এবারে একটা কাপড়ের ছোট্ট বলের উপর পরপর এমন ভাবে সাজাও যেন একটা ঝাঁটার মত গোড়া সরু, মাথা ছড়ানো হয়। দড়ি দিয়ে বেশ কায়দা করে এবারে বাঁধা হবে। একটু কুশলতার প্রয়োজন আছে বৈকি। এবারে এই ফুলকুচিকে বেশ শক্ত করে প্রোথিত করতে হবে একটা সরু ল্যাজ বাঁশের লগির মধ্যে। যে মাথাটায় ঢোকান হবে সেই অপেক্ষাকৃত মোটা দিকটাকে চার পাঁচ চির করে দিলে আঁটোসাঁটো হবে এই বিদ্ধকারী অংশ।

মজা এই যে, যে কোনও ভাবেই এই ফুলকুচিকে ছোঁড়া গেলেও এর একটি বিশেষ প্রক্ষেপণ প্রক্রিয়া আছে যাতে সুফল পাওয়া যায়। যে কোনও ভাবে মাছকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলেই মাছ বিদ্ধ হবে। কিন্তু সে হবে একটি মাত্র যা পালিয়েও যেতে পারবে। দেশে ভরা বর্ষায় এক সময়ে এবং জল কমে গেলে এক সময়ে ছোট ছোট বিশেষ ধরনের মাছেরা দল বেঁধেই সাঁতার কাটতে থাকে। ঝাঁক ঝাঁক এই মাছের দল অত্যন্ত তৎপর। ক্ষুদ্রতম শব্দে বা পরিবেশ পরিবর্তনেই এরা আত্মরক্ষার জন্যে জল ছিটিয়ে হঠাৎই অন্তর্ধান করে। প্রতিক্রিয়ায় এরা অত্যন্ত তৎপর। বিশেষ করে মাছরাঙা, কাক, চিল আকাশে উড়তে থাকে আর ছোঁ মেরে এদের ধরে ফেলে। তাই একটুখানি ছায়াও এদের প্রতিক্রিয়ার কারণ। এরা ঝাঁকে ভাসে আর ঝাঁকেই তলিয়ে যায়।

জলের উপরে মাটির ভাঙ্গা খোলা, 'চাঁড়া', ছুড়েছেন? ছ্যার-ছ্যার করে পাঁচ-সাত-দশবার জলের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে ঘটিয়ে ছুটন্ত সেই 'খোলা' দ্রুত ধেয়ে যায় সামনের দিকেই একটা বিশেষ ভঙ্গীতে। জলের সঙ্গে খোলাকে একটি নিশ্চিত কোণ তৈরী করে ছুঁড়লেই এটা সম্ভব। প্রায় ০°—১° কোণে ছুঁড়তে হয় তো? এবারে বুঝবেন কেমন করে ফুলকুচি চালাতে হবে। একঝাঁক মাছ। ভাসছে। ১০-১২ ফুটের চাইতেও বেশী পরিসর নিয়ে তারা টাপুস টুপুস মুখ খুলছে আর বন্ধ করছে। ১° কোণ করে ফুলকুচি ধরুন, সবেগে প্রায় প্যারালাল করে ছুঁড়ে দিন হাতে যত জোর আছে, সাঁই সাঁই ঝাঁটা মুখ ফুলকুচি ছুটে যাচ্ছে জলের উপরিতল ছুঁয়ে ছুঁয়ে আর গিঁথে নিচ্ছে

একের পর এক দলবদ্ধ মাছের এককদের। দেখবেন ফুলকুচির মুখে রুপোর ফুল ফুটে আছে। একটু এদিক ওদিক হলেই দেখবেন সাদা মাটা লোহা-মুখ ফুলকচি মুখ কাল করে ফিরে আসবে, তার কারণ যন্ত্রের ল্যাজে, এক্ষেত্রেও, দড়িব অনুসরণ বাঁধা আছে যে! এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে শরীরের নমনীয়তা 'এক্রব্যাটিকস্' অত্যন্ত প্রয়োজন হবে। কিছুটা জলে নেমে শরীর বেঁকিয়ে কনুই থেকে বাঁ হাতকে ত্রিভঙ্গ করে এবং ডান হাতকে অনুভূমিক কোণে এনে তবেই যন্ত্রটি ক্ষেপণ করা সম্ভব। বাঁ হাত দেবে কোণ এবং ব্যালান্স, ডান হাত দেবে গতি শক্তি এবং ডাইরেকশন। এখানেও সাফল্যের চাইতে সফলতা নেই! মনে হবে কতই সহজ! দাও এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি! চালাতে গেলে দেখবে কতবারই ফস্কে যাচ্ছে!

ফাঁদ পেতে মাছ ধরবেন? তাহলে 'খুনখুনে' বা 'খুনখুনি' পাতুন। যন্ত্রটি অত্যন্ত সুন্দর দেখতে। বাঁশের খুব সরু সবু চোঁচ দিয়ে, সুতোর মাদুর-মতো বুনটে এর চারটি দেয়াল এবং উপর নীচ তৈরী হয়। দু'থেকে চারটি প্রবেশ পথ থাকে। সেই পথে ঢোকা যায় কিন্তু বেবুনো যায় না। এটা প্রধানত পুঁটি মাছ ধবাব কাজে লাগানো হবে। কতোই না সহজ এই মাছ ধরার পদ্ধতিটি। চালের কুড়ো আর ভাত দিয়ে মণ্ড বানান। অনেকটাই সেই 'বড়েলেব' মতো কবে। শক্ত আঠা আঠা হবে। খুন্‌খুনির প্রবেশ দ্বারে চেপেচেপে এঁটে দিন। এবারে এই খুন্‌খুনি গুলো নিয়ে নৌকোয় কবে ধানক্ষেতে চলুন। চার পাঁচটি ধানের গাছ হাত দিয়ে মুট করে ধরুন। তাদের গুচ্ছপাতায় এই খুনখুনে বেঁধে দিন। দেড়-দু' ফুট জলের নীচে ঝুলতে পারে এমন করে ধানগাছের গুচ্ছকে মটকে দিয়ে খুন্‌খুনেগুলোকে রেখে দিন। দু-চারটে শাপলাপাতা দিয়ে উপরটা ঢেকে দিন যাতে আলো বেশী এবং সোজাসুজি না পড়তে পারে। বাড়ি চলে আসুন। কিন্তু নিশ্চিত কোনও চিহ্ন দেখে রাখুন না হলে খুঁজে পাবেন না। চার-পাচ ঘন্টা পরে ওগুলোর ভরভরাট গর্ভ থেকে মাছেদের বার করে নিন এবং আবার পাতার ব্যবস্থা করুন। অনেক হয়ে গেলে তুলে নিয়ে চলে আসুন, কি হবে একদিনে অত পুঁটি মাছ দিয়ে?

দিনের পর দিন এই সব করলে পড়াশুনোয় মন বসে? কখনই বা সে সব করা হবে? তাই ছোটবেলাটাতো কেটে গেল ফুটবল ভলিবল হাডুডু একদিকে,

আর অন্যদিকে সারাবছরের জলে মাছে। প্রকৃতির পাঠশালায় আর তারুণ্যের চঞ্চলতায় যার সময় চলে যায় তার জন্যে শিক্ষকদের দেওয়া বেত্রাঘাতই সম্ভাব্য সঞ্চয়ের সম্ভার হয়ে ওঠে। সরস্বতী আমাকে অনেকবারই আভাসে ইংগিতে তার বীনার ধ্বনি শুনিয়েছেন, কিন্তু আমার সেই ছোটবেলার দিনগুলো অন্য বর্ণে-গন্ধে-গানে মেতে উঠতে বেশী আগ্রহী ছিল। তাৎক্ষণিক প্রশস্তির নেশায়, প্রাপ্তির তাড়নায় আর বহুজনের প্রশংসায় আমার আমিটা কেমন যেন কেন্দ্রাতিগ হয়ে গেছিল। দেশ ছেড়ে ভাসতে ভাসতে কখন যেন কি ভাবে এতোই কেন্দ্রাভিগ হয়ে পড়লাম যে সেই আমার আমিকে একেবারেই হারিয়ে এই আমার আমিকে আপন করে নিয়ে ফেললাম।

সে বোধহয় সেই গোয়ালঘরের সেই রাত্রি! কে জানে?

———

॥ ভূত ॥

ছেলেবেলায় প্রত্যেকেরই একটা করে আকর্ষণ কেন্দ্র থাকে। গল্পশোনার আকর্ষণ। আর সকলেই তো জানে যে সব গল্পের সেরা গল্প ভূতের। অন্যান্য গল্প টানে, জমিয়ে দেয়, আগ্রহ বাড়ায়। ভূতের গল্প নেশা ধরায়, বুঁদ করে দেয়। আর তেমন তেমন করে বলতে পারলে শ্রোতারা দলাপাকিয়ে গল্পবলিয়ের শরীরের সঙ্গে, কোলের মধ্যে ঢুকে যেতে চায়। ভয় পেতেও যে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, গা শিরশির করে পেটের মধ্যে দলা দলা ভয়ের উদয় হলেও যে ভাল লাগে তা একমাত্র ভূতের গল্প শুনতে শুনতেই বোঝা যায়। সত্যি-মিথ্যের এরকম একই আসনে উপস্থিতি আমাদের ক'একজনকে অত্যন্ত ছোটবেলা থেকেই হাজুকাকার ভক্ত করে তুলেছিল।

হাজুকাকা ভূতের গল্প বলার পক্ষে শ্রেষ্ঠ চেহারার লোক ছিলেন। একেবারেই লম্বা বললে ঠিক হয় না, শুধুই লম্বা বলা উচিত। দীর্ঘ ছ'ফুটের মতো দেহটার কোনও প্রস্থ ছিল না বলে পিঠের কাছে একটা বাঁক ছিল। ঘাড়টি একটু বেশীই লম্বা ছিল। এবং সেই দৈর্ঘ্য বকের মতো খানিকটা সামনে এগিয়ে গিয়ে আবার পেছিয়ে এসে মাথার বোঝাটিকে বহন করত। সম্ভবতঃ 'ব্যালেন্স' বা সমতা রক্ষার জন্যে প্রকৃতি-কৌশলে সৃষ্ট সেই শারীর-বিন্যাসটি সম্ভব হয়েছিল। এহেন হাজুকাকা যখন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে আমাদের জড়ো করে গল্প বলতেন তখন সেই গ্রাম্য পরিবেশে একমাত্র ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা তান ছাড়া অন্য কোনও শব্দই প্রায় থাকত না। কখনও কখনও কাছে দূরে কোনও কুকুরের ডাক বেড়ালের ম্যাঁও বা গোয়ালে গরুর হাম্বা গল্পের মাঝখানে যেন আমাদের চমকিয়ে সচেতন করে দিত। আবহ-কে কখনও আরও ভয়াল এবং আমাদের আরও ঘনিষ্ঠ করতেও সাহায্য করত।

সুতরাং ভূত বিষয়ে অনেক জ্ঞান আমরা বেশ ছোটবেলাতেই পেয়ে গেছি। ভূত কত রকমের হতে পারে, তাদের প্রত্যেকের চরিত্র কেমন, কে কি খেতে ভালবাসে, কোথায় থাকাটা কোন ভূতের বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন ভূতের ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠস্বর, বাচন ভঙ্গী—এ মতো অনেক তথ্য আমাদের প্রায় নখদর্পণে। তাছাড়া ভূতের সঙ্গে পেত্নীর তফাৎ কোথায়, রাক্ষস খোক্কসরা ভূতকে কোন চোখে

দেখে এবং ভূতেরা কেন রাক্ষস খোক্কসদের সহ্য করতে পারেনা —সে সবও আমাদের বেশ ভাল করেই জানা ছিল।

একটু বড় হতেই হাজুকাকা আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেলেন। কলকাতা যে ভাল জায়গা তা অন্যেরা যত জোর দিয়েই বলুক না কেন আমাদের ক'একজনের কাছে, সেই অল্পবয়সেই, কলকাতা শত্রু হয়ে দাঁড়াল। কলকাতা হাজুকাকাকে আটকে দিল বলেই তো আমাদের গল্প-আসর মার খেল! আমরা তখন 'ড্রাগ এ্যাডিক্ট', নেশাগ্রস্ত। আর সেই নেশাতে বস্তু রসদ যোগান দেবার উৎসটি কলকাতা কেড়ে নিল। পরে অবশ্য রাগ কমতে লাগল যখন দেখলাম হাজুকাকা বছরে ক'একবারই বাড়ীতে আসতেন। তখন আমরা গোগ্রাসে গল্প শুনতাম।

ভূতের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে এক একাকী অভিযানে। আমি তখন তের-চোদ্দ। রাতে ফিরছি। প্রায় ছ'মাইল পথ। সুরু করেছি মাজড়ায় খেলা শেষ করে। থেকে গেলে বাড়ীতে প্রাপ্তিযোগ মা ছাড়িয়ে বাবা পর্যন্ত পৌঁছোবে। তাই ভয় এবং পিঠ বাঁচানোর তাগিদেই প্রায় সন্ধ্যাতেই ঘর মুখো হয়েছিলাম। সূর্য নেই কিন্তু তার আলো ছিল। সেই সময়ে দু'টো গ্রাম আর একটা মাঠ পার হলাম। অন্ধকার আসেনি, আকাশের আলো আবছা আবছা সঙ্গ দিচ্ছে, এমন সময়ে আরও দু'টো গ্রাম পার হয়ে এলাম। আকাশ ক্রমশই মুছে গেল, আর অন্ধকার চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকল। যখন রওনা হয়েছিলাম তখন অন্ধকার হবে 'জানতাম' আর এখন অন্ধকারকে যখন নিজের হাতের তালুতে আর চোখের তারায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম তখন হঠাৎই যেন হাজুকাকার কথা বরফ-শীতল মনে পড়ে গেল। শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের সর্পিল আনাগোনা টের পেতে থাকলাম। কিন্তু সেই বয়সে যে দু'টি অস্ত্র অমোঘ বলে জেনেছিলাম তার একটি আমার কাছে ছিল না। আগুন! বিড়ি ধরিনি তাই দেশলাই ছিল না। আর তাছাড়া একটা দেশলাই কারো বাড়ি থেকে সঙ্গেও রাখতে পারতাম যদি তা মনে পড়ত। অতশত অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করার মতো বয়সও হয় নি মনেও পড়ে নি। সুতরাং দ্বিতীয় অস্ত্রটিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলাম। "রাম-রাম"। হাজুকাকা বার-বারই তাঁর গল্পের নায়ককে হয় আগুনের সাহায্যে নয়তো এই "রাম-রাম" উচ্চারণের মাধ্যমে ভূত-সাগরের অতল থেকে পাড়ে তুলে এনেছেন! সেই কথা স্মরণ করে সেই উচ্চারণের

ভরসায় রাস্তা পার হচ্ছিলাম। অদূরে সেই মাটির গ্রাম-গ্রামান্তর রাস্তার দু'ধারে অনেক ভিটে থাকত। সেই সব ভিটেগুলো গাছ-গাছালিতে জংলী দেখাতো। অপার-বিস্তৃত দিগন্ত প্রসারী দু'ধারের ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে ভিটে। আমার কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। সেই আমার জীবনে একক নৈশ পথপরিক্রমা। বুকের মধ্যে ভয়ের ঢিবঢিবানি যত বাড়ছে পায়ের গতিও ততই বাড়ছে। এবং সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দশরথ-তনয় আমার জিহ্বাগ্রে মন্ত্রের মতো অনুচ্চার-সোচ্চার প্রকাশ পাচ্ছে। আমার উপর পাটি দাঁতের সংগে নীচের পাটির যে এত শত্রুতা ছিল তা আগে কখনও টের পাই নি।

অনেকক্ষণই একটা আবছা অন্ধকারের বিশাল দলা দূরে, রাস্তার প্রায় মাঝখানেই দেখতে পাচ্ছিলাম। একবার মনে হল পথ ভুল করিনি তো? কিন্তু সে তো হবার জো নেই। রাস্তা তো শাখা-প্রশাখা হীন! তাহলে? হাঁটা থামানো যাবে না। হাজুকাকার নিশ্চিত নির্দেশ মনে পড়ল: থেমে গেলেই ঘাড় মটকে দেবে, বাঁচার আর কোনও পথই থাকবে না। তাছাড়া "রাম-রাম" তো খই ফুট্‌ছে মুখে। এখন আর বিড়্ বিড়্ করে নয় বেশ জোরে জোরেই প্রায় চিৎকাবের মতো করেই সীতাপতির নামোচ্চারণ চলছে! চোখ খোলা রাখার মতো মনের অবস্থা ক্রমশই কমে আসছে। হাঁটাটা এখন প্রায় ছোটার পর্যায়ে পেঁাছে গেছে।

এমন সময়ে হঠাৎই আমার বুকের খাঁচায় এতোদিনের পোষা পাখিটা যেন অকস্মাৎই থেমে গেল। পরিষ্কার চলাচলের শব্দ। সেই ঝোপ জঙ্গল ভেদ করেই আসছে মনে হল। থেমে গেলাম, ঘাড়ের মায়া ত্যাগ করেই থেমে গেলাম। ভয়ের একটা শির-শির অনুভব আমার টিকির প্রান্ত বেয়ে নীচে গড়িয়ে গড়িয়ে বরফের শীতলতায় নেমে আসতে লাগল। পায়ে পেঁাছে সে যেন আমার চলৎশক্তি কেড়ে নিল। অযোধ্যার রঘুপতি উঠে গেল মন-মুখ থেকে; জুড়ে বসল 'মা'। এবং পরিষ্কার আমার জননীর পা দুখানি চোখের উপর ভেসে উঠলো। ক্রমশ মুখ তুলতেই মায়ের মুখখানাও। অসীম বল পেলাম। সামনে তাকালাম। না, ঝোপজঙ্গলের হদিস নেই রাস্তার উপর। এক-পা দু'-পা করে গতি বাড়াতে লাগলাম। মায়ের ছবি আমার চোখজুড়ে রইল, মায়ের নাম করতে করতে সামনে এগুতে লাগলাম! ক্রমশ ভয়ের মেঘটা একটু একটু করে বাষ্প হয়ে যেন সরে যেতে লাগল।

আবার শব্দ ! চলছে যেন কিছু একটা। শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ,, জমিতে পায়ের শব্দ ! বাঁদিকে তাকিয়ে চক্ষুস্থির। বিরাট একটা গাছগাছালির অন্ধকার স্তূপ আকাশকে আড়াল করে কোত্থেকে যেন এক পলকেই আবার হাজির। এবং সেই অন্ধকার স্তূপের গভীরতম কেন্দ্র থেকে কে যেন ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপেই বেরিয়ে আসছে। সে কি গাছ থেকে পড়েছে ? সে কি আমাকেই অদ্য রাত্রের আহার বলে স্থির করেই ফেলেছে ? বালকের রক্ত কি তার কাছে সেই পরিমাণ উপাদেয় হবে যা হাজুকাকার বর্ণনা অনুসারে ওরা বয়স্কদের ঘাড় মটকে চুষে পেয়ে থাকে ?

দৌড়ে যে ওদের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই বরং মৃত্যুকে ত্বরান্বিতই করা মাত্র তা বহুবারই হাজুকাকার মুখে শুনেছি। ভয় এবং মৃত্যুচিন্তা যখন আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে, রাম নাম যখন হারিয়ে গিয়ে একমাত্র মাতৃনামে পর্যবসিত হয়েছে তখন হঠাৎই পায়ের ডগায় মাটির ঢিলি টের পেলাম। আমার মধ্যেকার ডানপিটে আর্মিটি দ্রুত কাজ করে গেল। দু'হাতে দুটো বড় ঢিল তুলে নিমেষেই একটা একটা করে দুটোই ছুঁড়ে দিলাম সেই অদেখা সম্ভাব্য উপস্থিতির দিকে। বোধহয় হঠাৎ 'রিফেলক্স'। নিভে যাওয়ার আগে দপ করে জ্বলে ওঠা। অথবা মায়ের নির্দেশ। ছুঁড়ে দিয়েই আরো দুটো ঢিল তুলে নিলাম। লহমায়।

কিন্তু ততক্ষণে অন্ধকার চিরে হ্রেষাধ্বনি সেই ভয়াল রাত্রিকে তীক্ষ্নভাবে চিরে-ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো ! দ্বিতীয় মিসাইল-এ্যাটাকের আগেই সেই জংলী-ভূত বা শেওড়া-ভূত একটি চার পেয়ে ঘোড়ার চেহারায় ভিটের প্রান্তে বেরিয়ে এলো। নেহাৎই একটা ছ্যাক্‌ড়া গাড়োয়ান ঘোড়া ! আস্তাবল ওর পছন্দ হয় নি বোধহয়, অথবা ছাড়া পেতেই সরে পড়েছে। তা ওর যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, তাতে আমাব কিছুই বলায় নেই। আর ঘোড়াকে বলে লাভই বা কি ? কিন্তু এই পাথার প্রান্তরে একা একা একটা ভিটের গভীরে শুধুমাত্র আমাকে আমার জীবনের প্রথম ভূতের অভিজ্ঞতাটি উপহার দেবার জন্যে ওত পেতে অপেক্ষা করাটা ওর নেহাৎই অনুচিত কাজ হয়েছে। মায়ের নাম স্মরণ না করলে সেই রাত্রে আমার কি দশা হত ? হাজুকাকার কাছে তো সে বর্ণনা বহুবারই শুনেছি। বলা যায় স্বচক্ষেই দেখেছি তাঁর বর্ণনার গুণে !

হাতে অবশিষ্ট ঢিলগুলো ফেলে দিয়ে জমাট বাঁধা সব নিশ্বাস একবারে

আকাশের দেহে ছুঁড়ে দিয়ে, হাতের ময়লা ঝাড়তে ঝাড়তে বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই সামনে এগিয়ে চললাম। আমারও যে দু'টো পা আছে তা যেন বেশ পরিষ্কার বুঝতে পাবলাম তাদের চলনের দৃপ্ত ভূম্যাঘাতে!

একমাত্র চলা ছাড়া যখন আর কোনও কাজ থাকে না তখন তো নানান চিন্তা, নানারকমের স্মৃতি মনের পর্দায ছবি ছবি আসে যায়। তাই চলছিল। সামনেই আবছা দেখা যাচ্ছে এবারে হাটের খাঁচাগুলো। ঐ হাটের পাশ দিযেই রাস্তা চলে গেছে। সংক্ষেপ করলে হাটের মধ্যিখান দিয়ে চলে যাওয়া যাবে। একটা বিরাট প্রশস্ত ভিটের উপর ছোট ছোট বাঁশের খুঁটি-ঘর বা চালা। পাশে বেড়া থাকে না, উপবে চালা থাকে। সেই তরুণ রাতের তরুণ অন্ধকারে সেই সব বাঁশের খাঁচাগুলোকে বেশ খেলোয়াড় খেলোয়াড় মনে হচ্ছিল। তাছাড়া ওদেবও যে কোনও ঘরবাড়ি চালচুলো নেই তা ওদের চেহারা দেখেই জানা যায়। জীর্ণ-শীর্ণ একা-একা কঙ্কালসার সব সাময়িক আচ্ছাদনমাত্র। সেই হাটের কঙ্কালরা যতই কাছে আসতে লাগল ততই মনের মধ্যে একটা শিব-শিরানি চেতনা উঁকি ঝুঁকি দিতে থাকল। এই হাটেই তো মামদো ভূতেব সম্ভাবনার কথা বলেছেন হাজুকাকা! তাহলে? হাটের মধ্যে অনেক ঝগড়া কাজিয়া হয়, মারামারি এমন কি খুন-খারাপিও হয়। সেই সব অতৃপ্ত হাটুরে আত্মারা নাকি রাতের অন্ধকারে তাদের অসমাপ্ত কাজের সমাপনেব জন্যে আসা-যাওয়া করে এই পরিত্যক্ত হাটে! তা যদি হয় তাহলে?

এই তাহলে-র বর্ষাফলকটি আমার মনে একবার যখন আমূল প্রোথিত হল তখন থেকেই আমার অস্বস্তি হতে লাগল। কি আছে কপালে কে জানে! তাই হাটের মধ্যিখান দিয়ে সময় ও রাস্তা সংক্ষেপ করার ইচ্ছেটা এক ঝটকায় উবে গেল। পাশ দিয়ে ঘোরা পথেই যাওয়া স্থির করলাম। কোনও ক্রমে আর একটা প্রান্তর পার করতে পারলেই তো আমাদের স্কুলের হোস্টেল দেখা যাবে! তাই সামনে ভবিষ্যতের আলো আর পাশে নির্জন অন্ধকার হাটকে রেখে পায়ের গতি বাড়িয়ে দিলাম।

হঠাৎই বুকটা 'ধক্' করে উঠলো! উত্তর পশ্চিম কোণে সেই দূরে, ছ'ঠেঙো চালাটার পাশে ঐ যে একদলা কালো ভূত! একটু যেন নড়া চড়া করেই থেমে গেল! মনে হল আমার উপস্থিতি এবং গতি লক্ষ্য করে ওত

পেতে আছে। পা' দু'টো পাথরের মতো অনড় মনে হল, মাথার মধ্যে একধরনের চেতনার হাতুড়ি ধপ্-ধপ্ করে ঘা দিতে সুরু করল। ক'এক মুহূর্ত আমি বেঁচে আছি কি মরে গেছি তাইই ঠাহর হল না। নির্বাক নিস্তব্ধ আমি। হাজুকাকার রাম স্মরণ নেই, মায়ের মুখটাও তো মনের আয়নায় কোথায়ও দেখতে পেলাম না। তাহলে কি আমি 'নেই' হয়ে গেছি? কিম্ভূত চেহারার ঐ মসিকৃষ্ণ অন্ধকারকে তো কোনও কিছুর রূপকল্পনায় ধরতে পারছিলাম না। যখন চেতনা ফিরে আসছিল একটু একটু করে, নিজের অবস্থাটা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলাম, তখন ভেতর থেকে একটা বিকট চিৎকার আকাশ বাতাস ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু আটকে রইল আমারই গলার মধ্যে! মায়ের চেহারাটা এবং চোখের জল একই সঙ্গে হাজির হল। বাক্‌রুদ্ধ কন্ঠে মাতৃনাম জপ করতে সুরু করলাম। কণ্ঠের পাকানো দলাটা ধীরে ধীরে তরল হয়ে 'মা' 'মা' হয়ে ছোট ছোট ঢেউ তৈরি করতে পারল। আর তখনই দেখলাম, দেখতে পেলাম দূরের অন্ধকার স্তূপটার প্রান্তভাগ যেন নড়ে চড়ে উঁচু-লম্বা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। মা-ডাক দ্রুত হল। স্তূপের অংশ বিচ্ছিন্ন হল। এবং ঘাম দিয়ে আমার ভূত-জ্বর ছাড়তে লাগল। কুকুর। একটা কুকুর ধীরে সুস্থে আশে-পাশে তাকিয়ে এবং মাটির গন্ধ শুঁকে শুঁকে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আর হঠাৎই বোধহয় আমাকে দেখে দ্রুত কাছে চলে এলো, পেছনের এরিয়ালটি তীব্র ঝলকে এপাশ-ওপাশ আন্দোলিত করে বন্ধুত্বের সিগন্যাল দিতে থাকল। তাহলে ঐ দূরে ওটা?

বিদ্যুৎ চমকের মতো মাথার মধ্যে প্রশ্ন খেলে গেল ঃ জ্যান্ত-বাস্তব একটা কুকুর কি ভূতের সঙ্গে, ভূতের পাশে সহশয্যায় থাকতে পারে? হাজুকাকার তাবৎ ভান্ডার তোলপাড় করে ফেললাম। না, কোথায়ও তো এমন সহাবস্থানের নজির নেই! তাহলে? না-জেনে, সন্দেহ মনে নিয়ে কি ফিরে যাব? যদি বাড়ি গিয়ে জ্বর হয়? হাজুকাকার বহু নায়কই তো ঘোর জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে এই সন্দেহের তীব্র বিষে! তাই যখন যুধিষ্ঠির না হয়েও সঙ্গী সারমেয়টি আবির্ভূত হল এবং সেটি যখন তার বন্ধুত্বের 'সিগন্যালটি' পরিষ্কার জানিয়ে দিল তখন মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করে সেটিকে আরও আপন করে নিলাম। চল্ দেখে আসি। বাধ্য অনুজের মতো আগে আগে, পাশে পাশে চলতে লাগল। অন্ধকার ভূত-স্তূপটি কাছে এলো। পদশব্দে

উচ্চকিত হয়ে পাশে পাশ করে রাখা মাথাটি সামনে সোজা করে আমাদের দিকে নজর ফেলতেই বুঝতে পারলাম। আর তখনই সেই গাভীটি আগে পিছে দোল দিয়ে তার শয়ান শরীরটিকে সোজা অনুভূমিক দাঁড় করিয়ে দিল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সে তার দীর্ঘ ল্যাজটিকে ডান দিকে বাঁ দিকে আন্দোলিত করে জাগ্রত নৈকট্য ঘোষণা করল। 'যেন প্রাণ আসল ধড়ে'। আর একটু এগিয়ে গেলাম। গোরু আমার অত্যন্ত প্রিয় প্রাণী। ওর গলায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম। গলাটা লম্বা করে দিয়ে আমার আদর স্বীকার করল, আর কৃতজ্ঞতা জানাল ঘাড়টি উঁচু করে আমার বাহুমূলে ঘষে দিয়ে।

কুকুরটি অনেকটা পথই আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল। সবটা গেলেই আমার ভাল হত। কিন্তু কখন যেন সে হারিয়ে গেল। অনেকটাই ফাঁকা পথ, একাকী রাস্তা। হাঁটার জোর অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছি। দু'দুবার হল্ট করতে হয়েছে বলে সময় অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। শিশ দিতে যে কেন শিখিনি সেই অনুশোচনা মনে নিয়ে দ্রুত পা চালাচ্ছি। গানও তো কোনও দিনই গাইতে পারি না। কিন্তু সেদিন সেই একলা পথের নির্জন পদচারনায় বার বারই আমার মন শিশ দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছিল, গান গেয়ে মনের আনন্দকে প্রকাশ করতে উৎসুক হয়ে পড়ছিল। শব্দ বার করতে পারিনি পাছে সেই গানে আকৃষ্ট হয়ে অন্য কোনও ছায়া ছায়া জীবরা পেছনে লেগে পড়ে! পেত্নীদের কথা তত বেশী তখনও হাজুকাকার কাছে জানা হয়নি।

পরিষ্কার দেখতে পেলাম কে যেন ধবধবে সাদা কাপড় পড়া, বিধবা বেশ, সেই দূরে, রাস্তার মাঝখানটি পার হয়ে যেন আমাকে দেখেই, ঝট্ করে রাস্তার পাশটিতে উবু হয়ে বসে পড়ল। আমার হাল্কা মনের সুবেলা শিশ আর গভীর মনের ব্যঞ্জনা-গান এক ঝটকায় থেমে গেল। মনে হল যেন কেউ আমার গলার চারধারে একটা দড়ি টেনে দিল। দম বন্ধ, স্তব্ধ একাকিত্বে সেই পথের মাঝখানে প্রোথিত-পদ বৃক্ষ-অনড় দাঁড়িয়ে পড়লাম। হঠাৎই কুকুরটির কথা, গাভীটির কথা মনে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের একবার খুঁজলাম। নাঃ কোথায়ও ওদের চিহ্ন নেই। তাহলে? এখন? এবারে কি হবে? এবারে তো পরিষ্কার দেখতে পেলাম, গরু নয়, ঘোড়া নয় একেবারে জলজ্যান্ত ভূত! চোখ বন্ধ

করে দৌড় লাগাবো ? সঙ্গে সঙ্গে হাজুকাকার গভীর কণ্ঠ ভেসে এলো ঃ না, কক্ষনো না ! আমার প্রানহীন দেহটাকে ওরা তাহলে পারিবারিক ভোজে লাগিয়ে দেবে। কোনও অবশিষ্ট থাকবে না।

এক-পা দু'পা করে শনৈঃ শনৈঃ সামনে এগুতে লাগলাম। একমাত্র মায়ের পা-দু'খানি যদি একবার মনের সামনে আনতে পারতাম ! কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করছে, শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর এবং দ্রুত, বুক বলতে যে খাঁচাখানা আছে সে যেন ঝড়ের তাণ্ডবে ছত্রাখান হবার জোগাড়। এমন সময়ে 'ফন্যাশ' ; আমার মায়ের পদযুগল, মায় বুড়ো আঙুলের কুনি-সমেত। আর তখনই এক দৌড়ে তড়িৎ বেগে 'ফরোয়াড'' খেললাম। যেমন করে রাইট আউটের গাইনাস করা বল বিদ্যুৎ-বেগে গোলে চালান করে দেয় রাইট ইন্ ঠিক তেমনি করে শট নিলাম। আমার ঘাড় বাঁচলেও প্রভূত জ্বালা ধরে গেল পায়ের পাতায়। একগুচ্ছ কাশ-ঝোপ। পায়ের চামড়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেল। বসে পড়ে হাত দিতেই বুঝলাম রক্ত ঝরছে ! কান্না পেয়ে গেল। এমন করে ভূতের ভয় কেন পেলাম ?

পায়ের যন্ত্রণা নিয়ে, মনের ভার নিয়ে এবং পথশ্রমের যাতনা নিয়ে যখন স্কুলের কাছে এলাম তখন ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে দেখতে পেলাম। রাস্তা থেকে অনেকটাই উঁচুতে বিশাল এক ভিটের চারপাশ ঘিরে আমাদের স্কুল গৃহটি। দক্ষিণদিকে প্রবেশের পথ। ইংরেজী 'ই' অক্ষরের আদর্শে টিনের সুবিস্তৃত স্কুলগৃহ। সামনে টানা বারান্দা, ভেতরের দিকে। আমি পেছন দিক থেকে সামনের দিকে যাচ্ছি। জানালায় গরাদে নেই। স্কুল ভিটির ঢাল বেয়ে উপরে ভিতের কাছে পেঁীছে সবে জানালায় দুটো হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছি। ভেতরে শুরু হল তান্ডব ! হুটোপাটি, গড়াগড়ি, গোঙানি। যত বলি 'আমি আমি' তত ভেতরে ভয় ঝলকে ঝলকে লন্ডভন্ড করতে শুরু করে দিল। সেজবাতি ছিল না তাই তা ওল্টানোর প্রশ্নই ছিল না। ছিল 'হারিকেন' তাই ধকল যদি তার উপর লেগেও থাকে তবে সে তা সামলে নিয়েছে। আমি ছিনাথ নই ত্রিনাথ, বহুরূপে আমার আকর্ষণও ছিল না। তবুও সেই বিরাট স্কুলগৃহের এক কোণে সেই রাত্রে ক্ষণমাত্র সময়ে যে ভৌতিক উপস্থিতি উপস্থিত ক'একটি তরুণ ছাত্রকে ছিন্ন ভিন্ন বিধ্বস্ত করে ফেলল তার জন্যে নিজের দায়িত্ব বহন করে লজ্জিত হয়েছি অনেকখানি। কিন্তু অদূরে কোনও

ডালিম গাছ ছিল না আর আমিও কোনও ভয় পাই নি। বড়রাও কেউ ছিল না, ছিল না কোনও পিসিমা। তাই সম্ভবর ওদের ভূতের ভয় কাটানোর জন্যে এই ত্রিনাথকেই হাতের জোরে পায়ের চেষ্টায খেলোয়ারী 'এক্রব্যাটিক্স' এর ব্যবহারে তড়িৎগতি সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করাতে হল। হলই বা সেই পথটি গবাক্ষ পথ। আমি ভাবলাম এক, হল বিপরীত। মামদো নয়, শ্যাওড়া নয় একেবারে জ্যান্ত ভূতের জ্বলন্ত উপস্থিতিতে ওরা সকলেই কড়াই থেকে উনুনে পড়ে গেল! আমি তারস্বরে চেঁচাতে লাগলাম আর এক এক করে হাত ধরে, চুল ধরে, ঘাড় ধরে সোজা করে বসাতে লাগলাম। ওদের সম্বিৎ ফিরে এলো অল্প সময়েই।

কিন্তু ওদের চোখে দেখতে পেলাম ভূতের চোখের আগুন, হিংসা, প্রতিশোধ স্পৃহা! তখন আমি ভয়ে মরি। সামনের খাতা-বই-দোয়াত-কলম এদিক-সেদিক ছিটকে গিয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, মেঝেতে বিভিন্ন দেশের মানচিত্র, দোয়াত শূন্য! অনেক করুণ কাকুতি-মিনতি করে আমার অসহায়তার কথা ওদের বোঝাতে লাগলাম। ভূতের ভয় যে আমি দেখাতে চাই নি, বরং ভূতই যে আমাকে ভয় দেখিয়ে আধমরা করে ফেলেছে সে কথা ওদের বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হল। সবাই যখন শান্ত হল তখন বললাম যে জলই জীবন, জলই প্রাণ। আমি আকণ্ঠ পিপাসায় মরমর হয়ে এবং ভূতের তাড়নায় জ্ঞানশূন্য হয়েই ওদের আশ্রয়ে ঢুকতে চেয়েছিলাম। এমন যে কান্ড একখানা হতে পারে তা আমার কল্পনায়ও ছিল না। ওরা আমাকে বোধহয় ক্ষমা করে দিল।

জল খেয়ে একটু বেশ শান্তচিত্তে যখন বাড়ির জন্যে রওনা দিলাম তখন ভাবতেই পারিনি যে আমার সেই ভয়ংকর যাত্রার ভীষণতম ক্ষেত্রটি তখনও পার হয় নি। মানুষের মনটাই যেন কেমন। ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি মনে পড়ে না। তাহলে তো ওদের ঐ দলটিকে সঙ্গে নিয়েই আমডহ আর সাজাইলের মধ্যে যে পোলটা আছে সেটি পার হয়ে নিতাম। তা, তখন মনে পড়ে নি। মনে পড়ল যখন রাস্তার ক্রমউচ্চ ঢাল বেয়ে ব্রিজের দিকে এগুলাম। আর ক'একপা গেলেই পোলটি। আর তখনই চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই আপাদমস্তক মাদুরে মোড়া শবদেহটি! সর্বনাশ! এখন পার হব কি করে?

মাত্র মাস ছ'এক আগেকার কথা। চারদিকে হিস্-হিস্ করে খবর ছড়িয়ে গেল। অতশত জটিল বিষয় তখন ভাল বুঝিনা। কে যেন কোন মেয়ে হারিয়ে গেছিল জানতাম, তার যেন কি সব হয়েছিল। সে নাকি লজ্জায় কি সব করে শেষ পর্যন্ত বেপাত্তা হয়ে যায়। বড়দের অনেক আকর্ষণের এবং অনেক জল্পনার বিষয় ছিল বলে মনে হয়েছে; আমাদের ঐ শোনা এবং ভুলে যাওয়া পর্যন্তই দাগ কেটেছিল। চার-পাঁচ দিন পরে দলে দলে লোক গেল ঐ পোলের দিকে। কি? না, পাওয়া গেছে। সেই মেয়েটিকে মাদুর জড়িয়ে কে বা কারা যেন কচুরিপানার নীচে, পোলের নীচে অন্ধকারে পুঁতে রেখেছিল। এবারে ভেসে উঠেছে। সবাই বলাবলি করেছিল যে অপঘাতে মৃত্যু হলে নিশ্চিত ভূত হয়ে হন্তারকদের খোঁজার জন্যে অতৃপ্ত আত্মা সদাজাগ্রত থাকে! ওরা শুধু ঘাড় মটকেই ক্ষান্ত হয় না, অন্তরের জ্বালা মিটিয়ে নিতে ওরা যাকে ধরে তাকে কাদার মধ্যে পুঁতেও ফেলে!

সামনে সেই পোল, মনের মধ্যে অতৃপ্ত অপঘাত-মৃত সেই মহিলার সম্ভাব্য নৃশংস মূর্তি! পা থেমে গেল। সামনে আমাদের গ্রাম খুব আবছা মতো দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া সামনে, পেছনে এবং দুপাশে প্রাণের কোনও সাড়াশব্দ নেই। এমনিতেই আধমরা হয়ে গেলাম। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তলপেট থেকে শির-শিরানি ভয় ক্রমশ তীব্র হয়ে ঘাড় পর্যন্ত উঠে আসছে। কেমন যেন জ্বালা-জ্বালা বোধ করছে ঘাড়ের কাছে। বুকের মধ্যে কোনও যন্ত্রপাতি কাজ করছে বলেও মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন কোথায়ও পাঁকের মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত কে আমাকে পুঁতে রেখেছে। হাতে মুখে সাড় নেই। মাথার মধ্যে ঝিম্-ঝিম্ করে সামান্যতম চেতনাটুকু যেন ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো পাক খেতে খেতে কোন অদৃশ্য আকাশের দিকে ঘুরে ঘুরে চলে যাচ্ছে! খুবই 'পেয়ে' গেছে! কিন্তু ব্যবস্থা করার মতো ব্যবস্থিতচিত্ততা নেই! রাম, কৃষ্ণ, হরি কে আমাকে বাঁচাবে? আবার আমার মা-জননীকে মনে করার চেষ্টা করলাম। সারাজীবনই আমার গর্ভধারিনী জননী আমাকে বিপদে দেখা দিয়েছেন [আমার বিপদে তিনি যে কতদিনই আমাকে স্বহস্তে বাঁচিয়েছেন সে কথাও তো জানিয়েছি আপনাদের। কিন্তু সে ছিল তাঁর নিজস্ব অধিকারের মধ্যে একেবারেই নির্ভেজাল বন্দোবস্ত!] তাই একমন হয়ে সেই পথই শ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করলাম। মা-মা করে চলেছি, কিন্তু নখকুনিটা

আর চোখের সামনে ভাসতেই চায় না। একদিকে ভয় অন্যদিকে রাগ, অভিমান। "কাকে তুমি এর পরে শাস্তি দেবে? মারবে? যদি এখুনি আমার কর্দমপ্রাপ্তি পাকা হয়ে যায়? এখন আমাকে উদ্ধার করা তোমার নিজের জন্যেই কি প্রয়োজন নয়?" এরকম নানান অনুভব অভিমান আমার চোখ বেয়ে সেই পোলের পাশে ঝরে পড়েছিল।

হঠাৎ পোলের নীচে নড়াচড়ার শব্দ পেলাম! আমার সত্যি সত্যিই দম বন্ধ হয়ে গেল। কানদুটোকে টান্ টান্ নিম্নমুখী করে অনিবার্য আবির্ভাবের জন্যে নিজের শবদেহটি নিজেই কিছুক্ষণ খাড়া বহন করতে লাগলাম! জলের মধ্যে চলার শব্দ! কোনও ভুল নেই। শিয়রে নয়, সামনে একেবারেই পদতলে শমন! কে বাঁচাবে আমায়? চিৎকার করতে গিয়ে শুকনো গলা দিয়ে একটি শব্দও বের হল না। চোখ ফেটে জল বেরুল। জল না রক্ত? বুকের মধ্যে দু'টো হাতুড়ির ঘা টের পেলাম। আবার নীচে পা ফেলার শব্দ। গেছি! এবারে এক ঝট্কায় আমাকে টেনে নেবে। তার পরে…! আর ভাবতে পারলাম না।

যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন সব একে একে মনে পড়তে লাগল। কে যেন আমাকে হাত ধরে পোলটা পার করে অনেকখানি গ্রামের কাছে এনে দিয়েছে। কোমল একখানা হাত। সারা দেহটি মাতৃত্বের স্নেহের আবরণে ঢাকা ছিল। লালপাড় শাড়ি। হ্যাঁ অনেকটাই আমার মায়ের মতো। আমার গায়ে, মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে যেন বলেছিলেন: এত রাত করতে আছে? আর একা একা কখনও এমন যাতায়াত করবে না। সেই পোল থেকে সুরু করে খেলার মাঠ পর্যন্ত পথটা আমি 'নিশি'তে পাওয়া ছেলের মতো চলে এসেছিলাম। আর কিছুই মনে নেই।

পোলের নীচে কি তাহলে ব্যাঙের চলার শব্দই শুনেছিলাম। নাকি সেই শব্দও আমার মনের মধ্যে তৈরি হয়েছিল? কোনও 'শোল' মাছ? বা অন্য কোনও মাছের নৈশ অভিযানের পদতাড়না? পুচ্ছতাড়না? কে জানে?

হেডমাষ্টার মশাইয়ের বাড়ির উঠোন পেরিয়ে চক্রবর্তীদের বড়তরফের বাগান ছাড়িয়ে যখন ছোট তরফের বৈঠকখানার পাশ দিয়ে আমাদের বাড়ির জাঙ্গাল ধরতে যাব তখন থার্ডমাষ্টার মশাইয়ের বড় মেয়ের ঝুলন্ত দেহটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। একটা আমগাছে সে ঝুলেছিল। পুরো

একটা বেলা। পুলিশ না আসা পর্যন্ত তাকে ঝুলতেই হয়েছে। বেচারি বিধবার সাদা পোষাক এবং ঝুলন্ত শরীরের উপর কাত হয়ে থাকা করুণ মুখখানা কতজনেই কতভাবে ব্যাখ্যা করেছিল! আমাদের অত কথায় থাকতে নেই, কাছে যেতে নেই, মনে রাখতে নেই। মনে রাখিও নি। কিন্তু সেই আমগাছটি? কেন যে ওরা সেটাকে কেটে ফেলে নি কে জানে! ভয় আমাকে আক্রমণ করার আগেই আমি সামনের জাঙ্গালকে আক্রমণ করে ফেললাম। আর একবার আক্রান্ত হতে সাহস নেই। দৌড় দৌড় দৌড়। জাঙ্গাল পার হয়ে হরেনকাকার ঘরের পাশ দিয়ে কেণ্টকাকার দোরগোড়া হয়ে যখন আমাদের দালানে দু'টো করে সিঁড়ি টপকে হাজির হলাম তখন মনে হল আমার শেষ দমটুকুও শেষ হয়ে গেছে!

বারান্দায় বাবা, দাদা, জ্যেঠিমা এবং বৌদি। আমাকে নিয়েই কথা হচ্ছিল বোধহয়। দরজায় মা দাঁড়ানো। আঁচলের এক প্রান্ত দিয়ে মুখের অর্ধেকটা ঢাকা। ঘাড়টা একটু একপাশে দুশ্চিন্তায় নুয়ে পড়া। সেই অবস্থাতেও দেখলাম লালপাড় শাড়িটিই পড়া! 'যেন প্রাণ আসল ধড়ে'!

এবারে আমাকে ভূতের নয় অন্য এক ভয় গ্রাস করে নিল। অনিবার্যের ভয়। মাতৃহস্তে প্রাপ্য 'বর' লাভ করার ভয়। অন্য যারা উৎকণ্ঠিত অপেক্ষায় আছে তারা স্বল্পেই তুষ্ট! জননীর তুষ্টি অল্পে হবে না।

বহুদিন বহুবারই ভেবেছি। কোনও উত্তর পাইনি। সেদিন আমার মায়ের কি হয়েছিল? তিনি সুস্থ ছিলেন কি? আমার চোখে মুখে সেই বয়সে এমন কি তিনি দেখেছিলেন যে একটি প্রশ্নও করেন নি। একটি চপেটাঘাত নয়, একটিও প্রশ্ন নয়, এতটুকু শাস্তিও দেন নি সেই রাত্রে! বিস্ময়, শুধু বিস্ময়! আমাকে আলতো স্নেহে ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি উপস্থিত সকলের দিকে করুণ চোখে তাকিয়েছি আর বধ্যভূমির দিকে যাবার আকর্ষণ বোধ করেছি। একটুখানিই সান্ত্বনা ছিল মনের কোণে— ভূতে মারলে শবদেহটি ছাড়া আর কিছুই আমি পেতাম না, মা মারলে অন্তত একখানা নির্জীব দেহ আমার নিজের দখলে থাকবে!

কিন্তু হল একেবারে অন্যরকম ব্যবস্থা। নিজে হাতে ভিজে গামছা দিয়ে আমার হাত-পা মুখ-চোখ মুছিয়ে দিয়ে সামনে খাবার দিয়ে খেতে বলে চলে গেলেন! এরকম আবার হয় নাকি? আমার প্রায় হাতে চিমটি কেটে বেঁচে

আছি কিনা তা পরখ করতে ইচ্ছে হল। স্বর্গ কি হঠাৎ স্থানচ্যুত হয়ে সাজাইলের বাড়িতে আমাদের ঘরে নেমে এলো! অপেক্ষা করলাম নির্যাতনের। পেলাম যতন। পিঠকে শক্ত করে সম্ভাব্য শত-ঘা গ্রহণের যোগ্য করে রাখলাম, পেলাম স্নেহের পরশ, সর্ব অস্তিত্ব যখন বিড়ম্বনার জন্য প্রস্তুত, তখন পেলাম মাতৃ নৈকট্য। আমার চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। জল নয় লবণাক্ত প্রাণ। খাওয়া আমার ব্রহ্মতালুতে উঠে গেল। হতচকিত আমার পিঠে একটি শান্ত স্নিগ্ধ হাতের ছোঁয়া পেলাম। অনুভবে জলজ্যান্ত মায়ের করস্পর্শ চিনে নিলাম। পাশে বসলেন। খেয়ে নিতে বললেন। কোমল কন্ঠে নির্দেশ দিলেন "খেয়ে দেয়ে উপরে গিয়ে শুয়ে পড়। ওরা সবাই উপরে আছে। আমি একটু পরেই আসছি। ঘুমিয়ে পড়বে।"

একই রাত্রে ভূতও দেখলাম দেবীও দেখলাম। আমার সফল হল রাত!

ভূতের সঙ্গে সেই আমার প্রথম এবং শেষ দেখা। পেত্নী অবশ্য অনেক দেখেছি পরবর্তী জীবনে। তবে সে সব পেত্নী হাজুকাকার বর্ণনায় একেবারেই মেলে না। সে সব চলে ফিরে বেড়ায়, কথা বলে, কাছেও আসে। সকলে তাদের চিনতে পারেনা এই মাত্র! চেনা যায়ও না।

কিন্তু দেবী দর্শন ঘটেছে অনেক, অনেকবার। অনেক দেবী দেখেছি, দেখেছি দেবতাদেরও। তাঁদের ছবিগুলো স্মৃতির ফ্রেমে টান্ টান্ করে ধরে রেখেছি মনের দেওয়ালে। তাঁরা এখনও আছেন, আমার মনেই সজীব হয়ে আছেন।

তবে যে দেবীদর্শন সেদিনের সেই বিধ্বস্ত রাত্রে আমার প্রথমবার ঘটেছিল তিনি আমার সর্ব অস্তিত্ব জুড়ে দীর্ঘদিন যাবৎ উপস্থিত থেকেছেন। তাঁর মুখ, চোখ, পরিধান, এমনকি তাঁর নখের কুনিটা পর্যন্ত কখনও আমাকে আর কেনওদিনই প্রতারণা করে নি। সদাসর্বদাই, যেমন চেয়েছি তেমনই আমার মনের আয়নায় হুবহু প্রকাশ হয়ে আমাকে ভয়মুক্ত করেছে, বিশ্বাস জুগিয়েছে, শক্তি এনে দিয়েছ মনে। সেই পুণ্য তীর্থে আমি বহুবার অবগাহন করেছি। এখনও, যখন বাস্তবে তিনি নেই।

———

।। বড় বিদ্যা ।।

বাল্যকাল আর বয়সকাল কি একই স্বভাবের অনুবর্তী ? অন্যদের ক্ষেত্রে কি হয় বলতে পারব না, তবে আমার ক্ষেত্রে যে একাধিক সমকোণী মোড় আছে তা নিজেই জানি। তাতে কোন চতুর্ভুজ হইনি, হারিয়ে হারিয়ে খুঁজে খুঁজে পেয়েছি নিজেকে। আর প্রত্যেক বার হারিয়ে গিয়ে যে নোতুন আমি-কে পেয়েছি তাকে চিনতে বেশ সময় লেগেছে। অন্য লোকে, চেনা জানা আত্মীয় স্বজনেরা কি বলবেন বলতে পারব না, তবে নিজে বহুবারই হকচকিয়ে গেছি।

এই হকচকিয়ে যাওয়াটা যেমন আমার মায়ের ঘটেছে তেমনি ঘটেছে আমার জ্যেঠিমা, আমার মেজকাকা-মেজোকাকিমাদের। নানান পরিস্থিতিতে। মা সব খাবার-দাবার, অবশ্য লোভনীয় হলে, তালাবন্ধ করে রাখতে বাধ্য হতেন। তবুও যখন তালা তালার মনে পাহারা দিত আর খাবার-দাবার আমার মনের তৃপ্তির কারণ হত তখন মায়ের মুখে 'হা হতোস্মি' ছাড়া আর কিছু বের হত না। দরজার তালা স্থানচ্যুত করে আমার হাতে লাগানোর কোনও পরিকল্পনা কখনও করেছিলেন কিনা সে তথ্য আমার স্মরণে নেই তবে, সম্ভব যদি হত তাহলে, সে ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি তিনি ঘটতে দিতেন না। এবং মায়ের কোনও নিকট আত্মীয়-টাত্মীয় অবশ্যই পুলিশে ছিল না যে একজোড়া পুরানো হাতকড়ার জোগাড় হবে !

আর জ্যেঠিমা ? একই অন্ধকার পরিবেশে একই অন্ধকার ক্রিয়া সম্পাদনের উদগ্র প্রচেষ্টায় আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ-এর অনেক নজির আমার কাছে আছে। বস্তু বা বিষয় নিয়ে আমাদের মতভেদ থেকেই থাকবে কিন্তু উদ্দেশ্য উভয় ক্ষেত্রেই একই ছিল। বালক হিসেবে আমি ভয়ে মরি, মধ্যমবয়সী হওয়ার সুবাদে, অভিভাবকত্বের স্বীকৃতির গুণে তিনি সামলে যেতেন সহজেই। কিন্তু হকচকিয়ে যে যেতেন তা তাঁর ত্বরিৎ পশ্চাদাপসরণেই প্রমাণ পেত ! বৌদির ব্যাপারটাও ছিল একই রকমের।

এক কথায় ছোটবেলায় আমি একটি ইঁদুরের মতো চোর ছিলাম। বেড়ালের মতো ছিল আমার চলন, শ্বাপদের মতো গতি। সন্দেহের বেড়াজালে আমি

যখন চারধারে ঘেরাও তখনও আমার মতি-স্থির থাকত। পলায়নের পথ নিশ্চিত না করে কখনই রান্নাঘরে দুধের সর চুরি করে খেতাম না। পেছনের নিষ্ক্রমণের দরজার ছিটকিনিটা না খুলে রেখে কস্মিনকালেও 'অন্ধকার-কোঠার' নাড়ুর বয়েমে হাত দিতাম না। জালের বিরাট ছ'ফুট দীর্ঘ আলমারির দরজা খোলার আগে পরিপূর্ণ নিশ্চয় হয়ে নিতাম যে সেই কাজের জন্যে আমি 'প্রেরিত' এবং একেবারেই একা। কখনও সখনও একজন ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়তো। কারণ আমার জননী তো আমারই জননী এবং অবশ্যই আমার গর্ভধারিনী! আমার প্যাঁচ-পয়জার তিনি সমূহ টের পেতেন। কিন্তু আমাব ক্ষিপ্রতা এবং সময়-নির্বাচন তাঁকে ধোঁকা দিত। চিরাচরিত পুলিশের মতো তিনি সবসময়ই একটু, শুধুমাত্র ক্ষণিকের বিলম্বের শিকার হয়ে পড়তেন। এই প্রক্রিয়ায় তাঁর বুদ্ধি এবং কৌশলের যেমন পরিশীলন ঘটছিল, ঠিক সেই তালে তাল রেখেই আমার প্রকৌশল উন্নত হচ্ছিল।

বাবা সব জানতেন, সবই শুনতে পেতেন। মাঝে মাঝেই দুঃখ করে বলতেন "নিব্বংশের বেটা যদি বুদ্ধির একাংশও পড়াশুনোয় দিত!" তাঁর আক্ষেপ আমার স্বকর্ণে শোনা অনেকবারই। কিন্তু 'যে মার্জার নিজেই নৈয়ায়িক' অথবা বলা যায় 'কয়লার ময়লা'। যে কথা বলছিলাম, কখনও সখনও যাব সাহায্য দরকার হত সে আমার ছোটবোন। বেচারি! প্রকৃত অর্থেই বেচারি ছিল সে। আমাকে যমের চাইতেও বেশী ভয় করত তখন। কারণ আমার তখন 'কথা কম কাজ বেশী', বিশেষ করে ছোটদের জন্যে। এবং সেই কাজে যে পরিমাণ শক্তি আমি ব্যবহার করতাম তা সেই কচি-কাঁচা হাড়ের পক্ষে দুঃসহই ছিল। অন্যদিকে ছিলেন আমার মা। প্রশ্নের উত্তর না পেলে, সামনে একটু আড়ালে থেকেই দেখেছি, মায়ের কাণ্ডও কম বেদনাদায়ক ছিল না। তবে মাতা-পুত্রের হস্তচালনার মধ্যে প্রধান একটা প্রভেদ ছিল! আমি ছোটদের শরীররকে, বিশেষ করে তাদের পিঠকে, অপরের শরীর বা পিঠ বলেই মনে করতাম। আর মা সেই একই বস্তুকে নিজের সন্তানের অঙ্গ বলেই মনে করতেন। তাই অপর্ণার কাছে কোনও বিকল্পই ছিল না। সে আমার প্রতিই বিশ্বস্ত থাকত। প্রথম কারণ তো বলেছি। সকলেরই নিজের প্রতি, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি, অসীম ভালবাসা থাকে। দ্বিতীয় কারণ এই যে মা না জানলেও আমার বোন নিশ্চিত জানতো যে প্রকৃত ঘটনা জানতে,

অর্থাৎ কি সে বলেছে মাকে তা জানতে আমার অন্য কোনও কিছুরই দরকার নেই, নিজেই, স্বকর্ণেই, সে সব কোনও না কোনও স্থান থেকে শুনে নিচ্ছিই। তাই আমিও যেমন নিশ্চিন্ত হতাম আমার বোনটিও তেমনি আস্বস্ত থাকত। ভুলের, ভুল জানার, কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

দুধের প্রতি লোভ বালককাল থেকেই। পরে এই লোভকেই অন্যে বলেছেন ভাল লাগা। বলেছেন দুধ আমার পছন্দ। আরও পরে হয়তো বলা হবে ডাক্তারের নির্দেশ। কিন্তু ব্যাপারটা এই যে দুধের চাইতে দুধের সব বেশী আকর্ষণীয়। মায়ের ঝোঁক সর তুলে ঘি বানাবেন। আমার লোভ সেই মোটা স্বর্ণবর্ণ ফুটো-ফুটো সরের চাদরটি। কিন্তু? এমন তো সম্ভব নয় যে মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর আমি সেখানে ঢুকে সরটি খেয়ে সরে পড়লাম। কেন? দুটি কারণে তা সম্ভব নয়। এক, আমার পিঠ ততখানি মজবুত তখনও হয় নি যতখানি হলে সেটি করা যেতো। দুই, পর-পর ক'এক বেলা আমার কিছুই সেই রান্নাঘরে আর জুটবে না। দুটি বিকল্পের কোনটিই আমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।

তাহলে? এই তাহলের উত্তর একমাত্র পর্যবেক্ষণ, ধৈর্য আর অনুসন্ধানই দিতে পারে। সুতরাং রান্নাঘরের দ্বিপ্রাহরিক কাজ শেষ হলে মায়ের যাবতীয় নড়াচড়ার একটি অনুপুঙ্খ পরম্পরা মনে মনে তৈরী করতে হল। এটা করতে মায়ের সদয় মনের নৈকট্য চাই। কাছে থেকে, কিন্তু বুঝতে না দিয়েই তো এটা জানা সম্ভব। তাই খেয়ে উঠেই দোতলায় যাই না, ঘর বার করি। মাকে তাঁর কাজে সাহায্য করি। বকলে বলি 'তোমার সঙ্গে যাব অনেক খানি পড়াশুনো করব'। রান্নাঘরে ছিটকিনি লাগানো, দালানে এসে পানের বাটা, গ্লাস-ঘটি-জল নিয়ে সিঁড়িতে রাখা, 'আন্ধার কোঠার' তালা খুলে বাইরের দরজায় (সিঁড়ির মধ্যে খোলে) লাগানো, পিছনের দরজায় ছিটকিনি আঁটা এবং সব শেষে, বাইরের দরজায় তালাটি লাগিয়ে আঁচলে চাবির গোছাটি করে কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে ঘটি-গ্লাস সোজা দোতলায়। অনুপুঙ্খ জানা হয়ে গেল। পর পর কদিনই দেখলাম। পাশেই বৌদির রান্নাঘর, পাশেই তাদের দালান। সেদিকেও নজর দিতে হবে। একেবারে খোলামেলা তো আর চলে না!

সুতরাং আমার সর খাওয়া সুরু হয়ে গেল। মায়ের সঙ্গ ছিন্ন করলাম।

অনেক পড়া আছে, নির্মলের কাছে যেতে হবে, ইত্যাদি করে। যেই মা পিছনের দরজার ছিটকিনিটি দেবেন অমনি আমি রান্নাঘরেরটি খুলব। নিপাট সরটি তখন উষ্ণ মাত্র, সপাটে খেয়ে নেবো। পাশের পাটকাঠি দিয়ে উনুনের আগুন বাড়াবো, দুধ আবার ফুলে উঠবে। আমার কাজ শেষ। দাগ থাকবে না। দুধ বসে পড়বে আবার। নিভাঁজ একখানা সরও পড়বে। শুধু সেই স্বর্ণবর্ণটি আর আসবে না, চাদর-চাদর পুরু হবে না, গোল-গোল ফুটো-ফুটো হবে না। সে না হোক। সেতো অনেক কারণেই হয়ে থাকে। মা ভাববেন দুধে বোধহয় জল বেশী ঢালা হয়ে গেছে! চলছিল ভালই। সমস্যা হত যখন দুধের পরিমাণ কম থাকত। তখন অবশ্য সরুতম পাটকাঠি নিয়ে একধারে কড়াইতে স্ট্র-এর মতো ঢুকিয়ে দিয়ে দুধটাই কিছুটা খেয়ে নিতাম। যাতে সরের চাদরটা না কেটে যায় সেদিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে। আর সর নেমে গেলে স্ট্র-ছিদ্রটি কড়াইয়ের গায়ে লেপ্টে গিয়ে নজরেই পড়বে না। সরের স্বাদ সে-সব দিনে দুধেই মেটাতে হত।

মাছ? বেশী ঝোঁক কখনই ছিল না। তবুও যদি বেশ ভাল ভাজা অবস্থায় আছে বুঝতে পারতাম এবং যদি সে সুস্বাদু মাছ হত তাহলে নিস্তার ছিল না। প্রক্রিয়াটির মধ্যে বুদ্ধি বা কৌশলের আদৌ প্রয়োজন ছিল না। ঢাকনা তোল, মাছ হাতে নাও এবং সরে পড়। মাছের পরিমাণ বেশী থাকলে তো আর কিছু করার কথাই ওঠে না; পরিমাণ কম থাকলে অবশ্য দু'এক খণ্ড তুলে নিলে পাছে তা সহজেই বোঝা যায় তাই একটু আধটু নড়িয়ে চড়িয়ে সোজা স্বাভাবিক করে সাজিয়ে রাখতে হবে! ঢাকনা তুলেই যদি মালকিন্ বোঝেন যে ঘটনা ঘটে গেছে তাহলে সে হবে কাঁচা কাজ। তাই এ-ব্যবস্থা।

বুদ্ধি বলুন, প্রকৌশল বলুন, শ্বাপদ গমনে কার্যোদ্ধার বলুন, সবই প্রয়োজন ছিল নারকেল, নারকেল নাড়ু, কলা এবং পাটালিগুড় হস্তগত করায়। কখনও কখনও তা রোমহর্ষক পর্যায়ে পৌঁছে যেতো। আর, সকলেই তো প্রত্যক্ষেই জানেন যে, যে কাজে যতো ঝুঁকি সেই কাজের সাফল্যে ততখানিই আনন্দ। অতি অল্পসংখ্যক বিদ্যাসাগরী গোপাল ছাড়া বাল্যকালে প্রায় সকলেই অ-সুবোধ বালক থাকে। প্রবৃত্তির চাপ বড় চাপ। যে মহাপুরুষ বলেছেন যে প্রবৃত্তির বলিদানেই সভ্যতার সৃষ্টি তিনি অবশ্যই নমস্য। কিন্তু সেই বলিদান প্রথা যদিও অত্যন্ত ছোটবেলা থেকেই সুরু হয়, তবুও

বই-পুস্তকে আকর্ষণ বাল্য-বিরোধী বটেই। সব বালকেরাই আর গাড়ি ঘোড়ায় চড়ার কোনও তীব্র টান তত সমূহ করে প্রত্যক্ষ করে না। তাই বলি-প্রদত্ত বাল্য লুকিয়ে লুকিয়ে নানান ভাবেই নিজেকে জীবন্ত রাখতে চায়। আমি স্বল্পসংখ্যক নির্মলদের দলে নই, মন্টু আমার আদর্শ ছিল না. 'সভ্যতাকে' তখনও তেমন করে বুঝিনা, চিনিনা যে তার জন্যে আমার গ্রাম্য প্রবৃত্তিকে অবলীলায় ত্যাগ করতে পারি। তাই আমি আমার স্বরূপেই প্রকাশ পেতে থাকলাম ; ভাল ছেলে হয়ে বেড়ে ওঠার সব তাগিদ এবং নির্দেশ সহজেই এড়িয়ে যেতে থাকলাম।

হিন্দুদের বারো মাসে তের পার্বণ। লেগেই আছে। তাই মাঝে মাঝেই বাবা চলে যেতেন যজমানদের বাড়িতে। হাদানদের মাথায় ঝুড়ি বাহিত হয়ে নানান রকমের ঋতুনির্ভর ফল, হাতে তৈরি মিষ্টি, এবং অন্যান্য লোভনীয় বস্তুসামগ্রী বাড়িতে এসে পেঁছুত। সে সব দেখেই আমার যে ইন্দ্রিয়টি সরস হত তাকে সহজে বাগে আনা প্রায় অসম্ভব ছিল ! আমার জননী অত্যন্ত অবহিত ছিলেন আমার সেই ইন্দ্রিয়ের দৈর্ঘ্য এবং ক্ষমতার উপর ! তাই অরক্ষিত অবস্হায় সেই ঝুড়ি বাহিতদের রেখে তিনি কখনই অন্যত্র যেতেন না। একে একে সব গুছিয়ে চোর কুঠরি, জালের আলমারি এবং কাঠের সিন্ধুকে রেখে দিতেন। আমি নিরামিষ আহারী মার্জারের মতো তপস্বী তপস্বী ভাব করে মাকে সাহায্য করতাম। তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ যে সর্বদাই আমার পেছনে দিদির কপালের নীচে অবস্হান করত তা আমার সুপরিজ্ঞাত থাকত। এবং মা'এর ষষ্ঠেন্দ্রিয়টিও ! তাই এতোটুকু বেচাল ঘটত না আমার নিস্পৃহতার। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য তখন কোন্ দ্রব্য কোনস্হানে 'সুরক্ষিত' হচ্ছে সে তথ্যটি নখদর্পণে বিন্যস্ত রাখা। সময়ে কাজে লাগবে যে ! অকারণ সময় নষ্ট করাতো শুধু সময়-পাতই নয়, সেই সঙ্গে সময় যে বিপদেরও জন্মদাতা সে সত্যটিও তো আমার জানা। 'অপারেশন' বিলম্বিত হলে সেই বিলম্ব-পথেই শনি প্রবেশের সমূহ সম্ভাবনা। মা-তো আমারই মা ? অনেকবারই এমন হয়েছে যে বিড়ালের মতো নিঃশব্দ পদক্ষেপে আমি অপারেশন শেষ করেছি, আর তখনই আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় খবর দিয়েছে শ্বাপদ পদক্ষেপে আমার জননী 'আমার পেছনেই। 'চুল-চুল' বেঁচে গেছি বহুদিনই ! তাই বলছিলাম অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও আমার নির্লোভ সহায়তা

প্রতিবাদযোগ্য কখনই ছিল না। সেই সব মুহূর্তগুলো ছিল একেবারেই চাঞ্চল্যহীন নিবেদিত-প্রাণ নিষ্ঠায় সমুজ্জ্বল! দিদি মাঝে মাঝেই হাঁক দিত "অত ভাল নয়"! মা বলতেন "তুই ওকে দেখতে পারিস না কেন?" আমি বলতাম, "দেখেছো মা?"

দ্বিপ্রহরে আমি দোতলার পড়ার ঘরে। মন্টু আমার বিপরীতে, তার নিজের চেয়ারে। পাশে চৌকিতে বাবা শয়ান। আমাদের পড়াশুনোয় প্রয়োজনীয় সাহায্যের উৎস। শোবার ঘরে মা বিশ্রাম রত। আমার বাঁ-পাশের জানালা দিয়ে মাকে দেখা যায়, যদিও জানালা বন্ধ থাকায় মা আমাকে দেখতে পাবেন না। মা কখন ঘুমোবেন তা আমার নখদর্পণে, মানে বালিশে মাথা দেবার কত পরে। এবং ক্ষণমাত্র সময় নষ্ট করার সময় তখন আমার থাকবেনা। দালানে ছোট বোনকে পাওয়া যাবে তার পুতুলের সংসারে। সে জানে তার কি করণীয়! নিঃশব্দে সে আমার অনুসরণ করবে। সিঁড়ি। সিঁড়ির শেষে কাঠের একটা বাক্স চাতালে। আমি বাক্সের উপর উঠলেই বোন দরজাটা ঠেলে ধরবে। খুব জোরেই, দুহাত দিয়েই, ঝুঁকে পড়ে। এতটুকু ব্যত্যয় হলেই একদিকে আমি পিষ্ট হয়ে যাবো আর আমার মুক্তির পরে ওর পিঠ পিষ্ট হবে, অকাতরে। এবং সেই অবস্থায়ও ওর কাঁদা চলবে না; কারণ কাঁদলেই মা টের পেয়ে যাবেন যে!

আমার সকল অপাবেশনের মধ্যে এইটিই ছিল 'রিস্কিতম' এবং মায়ের মনে নিঃসন্দেহ এতোই গভীর ছিল যে তিনিও এই সুরক্ষা-পদ্ধতিতে গভীরে ঘুমাতে পারতেন। দরজায় তালা দিয়ে চাবিটি আঁচলে নিতেন। এবং দিবানিদ্রার সময়ে সেই আঁচল-শুদ্ধ-চাবির গোছাটি তার ঘাড়ের নীচেই থাকত। যেকোনও 'বড়-বিদ্যা-গুনসম্পন্ন ব্যক্তির' পক্ষেই সেই চাবিটি 'হাতান' ছিল অসম্ভব কাজ। আর আমার ছিল সেই তালা-সুরক্ষিত দরজা-পার হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অনেক বেশী সময় পাওয়া যেতো, অনেক নিশ্চিন্তে কাজ শেষ করা যেতো এবং যদি মা টের পেয়েও যান তাহলেও আমার দৈবত-সংকেত প্রক্রিয়ায় সে-দুর্ঘটনার খবর যথেষ্ট আগেই পাওয়া সম্ভব ছিল। আমার যেখানে বিদ্যা প্রকাশের ক্ষেত্র, মা যখন সেখানে এসে পৌঁছোবেন, তখন চক্রবর্তী বাড়ি ছাড়িয়ে কোনও মাঠের চারদিক খোলা পাথারে প্রবেশ করে ফেলেছি। মায়ের নাগালের শত শত মাইল দূরে।

আমি যখন 'মিসাইলের পেনসিল' হয়ে ঘরের অভ্যন্তরে 'ল্যান্ড' করব, অপর্ণা তখনই দোতলায় তার পুতুলের সান্নিধ্যে ছিটকে পড়ে অপেক্ষা করবে। তার কাজ তখন মায়ের ঘুমো গতি-বিধিতে নজর রাখা। মা যদি ঘর থেকে বের হন তা হলেই অপর্ণার তীব্র কান্না পাবে। চিৎকার করে কেঁদে উঠবেই। এটাই আমার প্রথম 'সিগন্যাল'। তার পরেও তো তালা না খুলে মা অকুস্থলে পৌঁছোতে পারবেন না। তালা খটখট। দ্বিতীয় ঘোষণা! সুতরাং? আমাকে ধরার ক্ষমতা সেই মহিলা পাবেন কোথায়? পেছনের দরজা দিয়ে আমি ততক্ষণে হাওয়া। বামাল কর্পূর হয়ে গেছি!

এই দ্বিপ্রাহরিক অপারেশনেই আমি চোরকুঠরি থেকে নারকেল, নাড়ু, গুড়, কলা আত্মসাৎ করতাম। এবং পরিমাণ যদি বেশী হত তাহলে সেই উদ্বৃত্ত অংশও সুরক্ষিত রাখতাম নীচের ঘরের মধ্যেই। জালের আলমারির পিছনে যে সংকীর্ণ ফাঁকটি ছিল যেখানে আমি ছাড়া আর মাত্র দু'টি প্রাণীর ঢোকার ক্ষমতা ছিল। ইঁদুর আর টিকটিকি। দৃষ্টির আড়ালে, একেবারে মায়ের চোখের সামনে এমন একটি স্থানও যে ছিল তা ওরা কেন আমার জ্যোঠিমাও জানতেন না। 'কলম্বাসের' চাইতে কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না এই আবিষ্কার; কিন্তু বড়দের জগতে ছোটর কি কোনও দিনই কোনও মূল্য দেওয়া হয়েছে? ছোটদের আবিষ্কারকে ছোট করে দেখা বড়দের একটা অহংকারই তো মাত্র! আমার একেবারে নিজের জন্যে নিজের প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত সেই 'আর্চিপেলাগো'-তে আমার সকল উদ্বৃত্ত আহরণ সুরক্ষিত থাকত। আমি ক্ষেপে ক্ষেপে, 'বাই ইনস্টলমেন্ট', সেই রসাল-সংগ্রহে আমার তৃপ্তির তুষ্টি খুঁজে নিতাম। তবে ঐ যে বলে, রতনে রতন চেনে, তাই অনেক বারই 'ফেউ'-কে আমার অর্ধভুক্ত শিকারের আশেপাশেই ঘুরতে দেখেছি— জ্যেঠিমাকে—কিন্তু তাঁর নাক এতো তীক্ষ্ন ছিল না যে 'বিন্দুতে' পৌঁছোতে পারেন। সেই আলো-ছায়া খেলার কথা সম্ভব হলে সবিস্তারে অন্যসময়ে বলা যাবে।

তালা দেওয়া দরজা অতিক্রমণের ব্যাপারে আপনারা বেশ সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। স্বাভাবিক। তবে বুঝিয়ে বলি।

দরজাটার নীচের অংশ স্বাভাবিক দরজার মতোই। উপরে দু'ফুট মতো অংশটায় সিক দেওয়া এবং দু'পাশেই দুটো পাল্লা আছে। জানালার মতো

ঘরের মধ্যে খোলে। আলো প্রবেশের জন্যে। পাল্লাটাও ঘরের দিকে খোলে। মাঝখানে দু'টি বড় মতো 'কয়ড়া' লাগানো। বাইরের দিকে। সেই কয়ড়ায় তালাটি লাগানো হয়। একটি শিকল আছে, বাইরের দিকেই। তুলে দিলে দরজাটি মোটামুটি স্থির লেগে যায় ফ্রেমের সঙ্গে। শিকল খুলে দিলে? ঢিলা কয়ড়ায় পাল্লা দু'টো ঘরের দিকে অনেকটাই সরে যেতে পারে। যে ফাঁকটুকু হয় তাতে বেড়ালও যেতে পারে না। কিন্তু, এইখানেই একবার উপরের দিকে তাকান। একটি ত্রিভুজাকৃতি ফাঁক দেখতে পাচ্ছেন? পেয়েছেন? বেশ, এবারে একবার আমার শরীর স্বাস্থ্যটি দেখুন। একটি পেন্সিল বলে ভুল করলেও কোনও দোষ দেবো না। এই পেন্সিল-শরীরটি ঐ ত্রিভুজের ভেতর দিয়ে এপার-ওপার করাতে হবে। পা রাখার জায়গা এদিকেও আছে ওদিকেও আছে। ওদিকে অধিকন্তু একটা সুবিধা এই যে পাল্লাদুটো—টুকরো পাল্লাদুটো—ধাপের কাজ করবে, হাতলের কাজ করবে এবং ঝুলে নামার জন্যে 'রিং'-এর কাজও করবে। সাহায্যকারী কেন দরকার? দরজাটিকে সর্বক্ষণই ঠেলে ঘরের মধ্যে ধরে রাখতে হবে অন্যথা ত্রিভুজটি চেহারা পাল্টাবে। আর সেক্ষেত্রে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হবার সমূহ সম্ভাবনা। তবেই বুঝুন প্রক্রিয়াটি কতো জটিল এবং 'রিস্কি'। এই সম্ভাব্য পথের, প্রায় উত্তমাশা অন্তরীপ, সুলুক সন্ধান কি সহজেই পেয়েছিলাম। বিড়াল আমাকে এই অভিনব পথের সন্ধান দিয়েছিল। ওদের কাছে যা প্রাকৃতিকভাবেই সহজ ছিল, আমাকে সেই পথটিই সহজ করে নিতে হয়েছিল। এবারে সন্দেহ দূর হল ত'?

আরও সহজ পথ ছিল। আমাদের আর দাদাদের ঘরের মাঝখানে একটি পার্টিশন দরজা ছিল। সেটি বন্ধই থাকত। তার সামনে ছিল একটা বিরাট আলনা। সেই আলনায় কাপড়-চোপড়ের উপচে পড়া ভীড় লেগেই থাকত। কি একটা যেন খুঁজতে গিয়ে সেই আড়ালটির কার্যকারিতা একটি ঝলকেই আমার উর্বর মাথার সম্পদ হয়ে গেল। রান্নাঘরের কাজ সেরে মা দালানে প্রবেশ করবেন। আমি আলনার পেছনে নিঃসাড়ে অবস্থান করব। মাত্র মিনিট পাঁচেকের ব্যাপার। পান এবং জল শেষ করে মা চলে যাবেন দোতলায়। তালা ঝুলিয়ে চাবি দিয়ে। এখানে বলে রাখা ভাল যে চোর-কুঠরির তালাটি খুলেই দরজায় লাগানো হত। ভাগ্যিস একাধিক তালা ছিল না!

এবং বুঝতেই পারছেন বিশ্ব তখন আমার পদতলে!

সকলেই তো জানেন যে, যে কাজ প্রথম প্রথম উত্তেজনার যোগান দেয়, এবং এই দেয় বলেই, করতে ভাল লাগে, সেই কাজই কিছুদিন পরে সহজ হয়ে যায় বলেই আর আকর্ষণীয় থাকে না। আমার ও সেই অবস্থা। বড় বিদ্যা তখনই 'বড়' যখন তার মধ্যে উত্তেজনা থাকে, ভয় থাকে, 'রিস্ক' থাকে! তাই সকলেই যখন নানা কাজে ব্যস্ত তখন, দিনের বেলাতেই, চোরকুঠরিতে অপারেশন করব ঠিক করেছি। প্রস্তুতি, পরিকল্পনা এবং প্রক্রিয়া নির্ধারণ হয়ে গেল। সকালে মা হয়তো ঢেঁকি ঘরে, ঢেঁকির মুখে। সরার সুযোগ নেই। অথবা উনুনে মাছের ঝাঁক্ চাপিয়েছেন, নড়তে পারবেন না। সুতরাং উপযুক্ত সময়। 'কোচ'-এর খোঁচাটি (এ-টি সরু বাঁশের কাঠির ডগায় লোহার ফলা লাগানো একটা মাছ মারার যন্ত্র) নিয়ে চোরকুঠরি আক্রমণ করলাম। কলার 'ফানা' হলে তো জলভাত। গোড়ার শক্তসপাট স্থানটিতে খোঁচাটি গিঁথে দাও এবং উপরের দিকে চাপ রেখে তাক থেকে নামিয়ে আন। লোহার সিক দেওয়া দরজার ফাঁক দিয়ে ক'টি টুকরোয় বিভক্ত করে সেই কলার ফানাটিকে বাইরে আন। এবারে সরে পড়। দেখ যেন খোঁচাটি যথাস্থানে, জালের আলমারির পিছনে রাখতে ভুলো না। এই একই পদ্ধতিতে মেঝেতে রাখা কাঁঠালটিকেও কাছে টেনে আনা যাবে এবং ক'একটি কোয়া ছাড়িয়ে নিয়ে আবার গড়াতে গড়াতে সেই কাঁঠাল-মাতাকে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়াটাও সহজ হবে। এবং সরে পড়। এই পদ্ধতিতে ছোটখাট নারকেল বার করেও আনতে পার। তবে একটি কাটারি লাগবে এবং দ্রুত ছোবা ছাড়ানোর প্রক্রিয়াটিও রপ্ত থাকা চাই। আর যদি দরজার সিকের ফাঁক দিয়ে না গলে তাহলে দেরি করবে না, দ্রুত একটি বড় থালা সংগ্রহ করে চোরকুঠরির ভিতরে নারকেলের ঠিক নীচে পেতে দিয়ে ওটাকে কাটারি দিয়ে দু'টুকরো কর়ো। 'মালা' দুটো বার করবে, থালা বার করবে সন্তর্পণে যেন জল না পড়ে। চুমুক দাও জলে। থালা যথাস্থানে সরিয়ে দেবে যেন দাগ না থাকে। নিষ্ক্রমণের পথ ধরে কেটে পড়।

কস্তুরী মৃগের গন্ধের মতো আমার বড়বিদ্যার ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ল আমাদের বৃত্তে। মা জানেন কিন্তু ধরতে পারেন না। (যিনি বা যাঁরা জানতেন এবং ধরতেও পারতেন তাঁরা স্বাভাবিক কারণেই আমার বিরুদ্ধে মতামত দিলেও কখনও ধরিয়ে যে কেন দেন নি তা তখন ভাল করে বুঝে

উঠতে পারতাম না। শ্রেণীবিরোধ তো স্বাভাবিক ছিল; ওঁরাও তো অভিভাবক শ্রেণীরই ছিলেন? তবে কিছুদিনের মধ্যেই বুঝে গেছিলাম যে ওঁরা জানলেও কোনও কারণে আমাকে ধরিয়ে দিতে চান না! আমার ক্ষোভ ছিল না বরং বেশ স্বস্তিতেই দিন কাটাতাম।) আমার যখন 'সুনামটি' বেশ প্রতিষ্ঠিত তখন একদিন সবাই মিলে 'নষ্টচন্দ্র' করার প্রস্তাব দিল। কি একটা বিশেষ দিনে পরদ্রব্য আত্মসাৎ করাটা কোনও অপরাধ বলে মনে করা হত না। নষ্টচন্দ্রর দিন (মানে, রাতে) যদি কেউ চুরি করে তাহলে তা চুরি নয়, ব্রত, ধর্মীয় অনুষ্ঠান! 'তাজ্জব কি ফিউজ'! চুরি করার বাসনা কম বেশী সকলের মনেই 'সুক-সুক' করে। এই একটি দিনে সকলেই হুঁসিয়ার থাকেন, এবং বড়বিদ্যার কারিগরদের প্রকৌশলের এবং কুশলতার 'টেস্ট' হয়।

সুতরাং পরিকল্পনা তৈরি হল। নষ্টাচন্দ্রায় মেজকাকার ঘরের নারকেল যে বার করে আনতে পারবে তাকে শ্রেষ্ঠ কারিগর বলা হবে। বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে যার যার 'টার্গেট' স্থির করে এগিয়ে যাবার নির্দেশ হল। আমি দাশুকে সঙ্গে নিলাম। টার্গেট মেজকাকার নারকেল। খোঁজ খবরের পর্যায়েই প্রায় চক্ষুস্থির। বিরাট চারচালা টিনের ঘর। ভেতরে তিনটি বেডরুম। মধ্যিখানে ডাইনিং কাম বসার ঘর। দক্ষিণে একটি এবং উত্তরে একটি—এই দু'টি মাত্র দরজা সেই প্রশস্ত চৌচালার যাবতীয় প্রবেশ নির্গমনের পথ। মাঝের ঘরের প্রান্তে, পুকুরের একেবারে ধারে রান্না ঘর, স্টোররুম এবং গেস্টরুম। এই এলাকায় আটফুট মতো উপরে সটান পাটাতন দিয়ে একটা দোতলা করা হয়েছে। স্টোররুম থেকে একটা সিঁড়ি পাটাতন (দোতলার ঐটাই হল মেঝে) ভেদ করে উপরে চলে গেছে। বাক্সর যেমন ডালা হয় তেমনি একটা ডালা, নেবে আসার সময়ে হাত দিয়ে টেনে নামিয়ে আনতে হবে বন্ধ করার জন্যে। শেকল আছে। তালা লাগাও এবং নেমে আস সিঁড়ি দিয়ে। এই দোতলায় জোড়া-জোড়া বাঁধা নারকেল রয়েছে। রয়েছে বছরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্টোর। সেখান থেকেই প্রতি মাসে যেমন প্রয়োজন তেমন নেবে আসে রান্না ঘরের সংলগ্ন কক্ষে। প্রতিনিয়তর ব্যবহারের রসদ।

বড় বিদ্যার প্রয়োগ স্থান এই দোতলার বাৎসরিক স্টোর রুমে। প্রথম দেখেশুনেই দাশু বলল ঃ রঘু ডাকাত ছাড়া এ-অসম্ভব! কিন্তু সে তো নষ্টচন্দ্র হবে না! তাহলে? একমাত্র কালুয়াই হয়ত সম্ভব করতে পারবে

সিঁধ খুঁড়ে! বোকার মরণ আর কি! ঘরের ভেতরে ঢুকলে কি লাভ? দোতলার তালা? দাশু বলল—তবে?

পুকুরের ঢাল বেয়ে অনেকবার যাতায়াত করলাম। কাঠের ফ্রেমে টিনের বেড়া। অসম্ভব। দোতলায় অবশ্য 'মুলি'-বাঁশের বেড়া, সুন্দর করার জন্যে অত্যন্ত ঘনঘন বাখারির বাঁধনে মজবুতও বটে সুন্দরও বটে। পূর্বদিক পর্যবেক্ষণ করে কোনও সুরাহা হল না। দক্ষিণ দিকে প্রশস্ত উঠোন। সেদিকটায় ঘুরে ঘুরে দেখলাম। পূর্বদিকের কোনও আলো যেমন বুদ্ধির গোড়ায় পোঁছল না, দক্ষিণেব বাতাসও কোন আন্দোলন তৈরি করতে পারল না বোধ-বুদ্ধিতে। ক্রমশই যেন ঝিমিয়ে পড়ছিলাম। দাশু গালে হাত দিয়ে ঘবেব চালার দিকেই তাকিয়েছিল। কি দেখছিস বলে সেই দিকে চোখ গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমক। দাশুকে বললাম হয়ে গেছে! খুব বড় একটা কাতাদড়ি চাই! ওর বাবা কদিন হল অনেক দড়ি এনে ঘরে বেখেছে। বলল এখুনি নিয়ে আসছি। বললাম সম্ভব হলে দু'টো আনবি। এই গেল আর এই এলো। দু'লাছি কাতাদড়ি ওর জামার তলায়।

দাশুকে নিয়ে পুকুরের ঢাল বেয়ে নেমে গেলাম। হিজল গাছের তলায় পোঁছে দাশুকে পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে দিলাম। আমার বাঁচা-মরা এবং সাফল্য-অসাফল্য যে দাশুর বুদ্ধি বিবেচনা এবং যথাসময়ে যথানির্দেশ করে যাবার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তা ওকে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিলাম। দু'বার 'রিহিয়ার্সাল' দেবার মতো করে নিশ্চিত হলাম যে দাশু বুঝতে পেরেছে।

আনন্দে শিশ দিতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আসে না। তাই দাশুকে নিযে গোটা পুকুরটার পাড় দিয়ে একটা চক্কর দিয়ে ফেললাম। 'আইডিয়াই' যে কাজের পেছনে মূল প্রাণশক্তি তা অনেক পরে বুঝেছি মহাগুরুর লেখা পড়ে। সেদিন সেই ছোট্ট জগতের সর্বার্থে ঘোষিত 'ছোট' কাজ হলেও সামাজিক ভাবে স্বীকৃত বেশ 'বড় একটা কাজ' বলে করতে চলেছিলাম; আর তখনই বেশ বুঝতে পারলাম একটা লাগসই আইডিয়া, পথ, সুলুক-সন্ধান কত বেশী বাস্তব, প্রকৃত কাজের তুলনায়। তখনই যেন সফল হয়ে গেছি বলে মনে হতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে অন্যসব দলের পরিকল্পনা দেখতে-জানতে ঘুর্ ঘুর্ করলাম। কেউ নিজ-নিজ গোপনীয়তা নষ্ট করতে রাজী নয়। তাই অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

দাশুকে বললাম সকলে সব থেকে অরক্ষিত থাকে কখন বল তো ? বলল যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়ে, গভীর রাত্রে। বললাম যে 'দাশু, তোর মতো আর দেখি নাইকো বোকা !' যেদিন নষ্টচন্দ্র, যেদিন বড়বিদ্যার প্রয়োগ সম্ভাবনায় সকলেই সচেতন সেদিন ঘুমটাই জাগ্রত অবস্থা। জানালাম যে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়ে সকলে যখন সবেমাত্র ঘরের মধ্যে পরিকল্পনা আঁটতে ঘন হবে, মূল মহিলাটি যখন রান্নাঘরে অনেক ছ্যাঁক্-ছোঁক্ করে রান্না করবে, ঘটি-বাটি-থালা-বাসনের শব্দ যখন বেশ উচ্চগ্রামে চলবে এবং যখন কেউ কোনও সন্দেহের চেতনায় উচ্চকিত হবে না তখনই, সেই অসতর্ক মুহূর্তেই আমাদের অপারেশন শুরু এবং শেষ করে ফেলব। দাশু খুব খুশি।

দাশু হাতের তালু দেখতে পাচ্ছিস ? পুকুরের ঢালে দাঁড়ানো দাশু বলল—না। বললাম দড়ির খুঁট্‌টা দে। কোমরে বেঁধে, গাছে আম চুরি করার মতো করে কাঠের ফ্রেম বেয়ে লম্বা আঁকা-বাঁকা পা ফেলে সেই ভেন্টিলেটের জানালায় মাথাটা গলিয়ে দিয়ে দুহাত দিয়ে সাঁতার দেবার মতো করে কোনও বস্তু খুঁজলাম। একটা কাঠের বিট হাতে ঠেকল। আর যায় কোথায় ! বেড়ালের মতো নিজেকে পাটাতনে আস্তে করে স্থাপন করলাম। মানুষের কান ঘোরানো যায় না তাই ঘাড় ঘুরিয়ে গোটা ঘরের মধ্যেকার নড়াচড়া আন্দাজ করলাম। না, কেউ সন্দেহ করেনি। অপূর্ব মাছভাজার গন্ধ ভেসে আসছে ! নিজের 'নোলা'-কে একটা ধমক দিলাম, মনে মনেই। একজোড়া নারকেল পেয়েই কোমর-মুক্ত দড়ির প্রান্তে বেঁধে দিলাম। এবারে দুটো হাত কুয়োয় বালতি নামানোর মতো করে নারকেল নামতে লাগল। দাশুর কাজ দ্রুত নারকেল খুলে দড়ি ছেড়ে দেওয়া। একটা ছিপটান দেবে, অমনি আমি বুঝে নেবো। তিনজোড়া নেমে গেল দেখতে না দেখতেই। রান্নাঘরে বোধহয় মাছের জন্যে ঝোলের জল ঢালা হল। ছ্যাঁক্ করে উঠলো।

প্রবেশ পথকে নিষ্ক্রমণের পথ করতে গিয়ে দেখলাম সমস্যা গভীর ! জীবনে বহুবারই শুনেছি নীচে নামাটাই নাকি সহজ, পতনটাই নাকি দ্রুত ঘটে থাকে এবং তাতে নাকি তাৎক্ষণিক একটা তীব্র আনন্দবোধও জড়িত থাকে। আমার হয়েছে ঠিক উল্টো। উল্টোকরে কোল-পা হয়ে যখন অর্ধেকটা বাইরে অর্ধেকটা ভেতরে হুমড়ি খেয়ে আছি তখন মনে হল গৃহবাসীদের মধ্যে কেউ যেন "কিসের শব্দ' ! বলে সতর্ক হল। একটা ছোট 'ম্যাঁও' দিতেই হল এবং সঙ্গে

সঙ্গে প্রাণীটির পদশব্দ মৃদু করেই করতে হল। ওঁরা নিশ্চিন্ত হলেন। আমি দুশ্চিন্তায় পড়লাম। মাথা নামাবো কি করে? কনুই-এর শক্তিই একমাত্র ভরসা। তাই করলাম। বাহুর দু'এক জায়গা ছড়ে গেল বুঝতেই পারলাম কিন্তু এটাও বুঝলাম যে 'বেড়া' আমাকে ছেড়ে দিল। আর, একবার যখন লম্ব হয়ে দেয়াল পেয়েছি তখন দাশু কেন দূরে থাকবে? তর্ তর্ করে নেবে এলাম। এবং যেমন বলা ছিল সেই হিজলগাছের তলা। ব্যাস্!

মন্টু গিয়ে মেজকাকাকে পরদিন সকালে খবর দিল। চুনের দাগ দেখে নিশ্চিত হলেন, এবং বিস্মিতও! কে করেছে? কে পারল? কখন করল? সকলেই নিরুত্তর। গোপনীয়তাই একমাত্র গোপন। সেই শেষ। প্রথম এবং শেষ নষ্টচন্দ্র। ঘরে অপরাধ নেই; কিন্তু বাইরে?

ঘর-বাহার

আজকাল ঘর বলতে যা বোঝায় আমাদের ছোটবেলায় তা বোঝাতো না। ঘর মানেই আমাদের বাড়ি, একটা সমগ্র বাসস্থান মনে পড়ে। এখন যেমন শয়নকক্ষ এবং সংলগ্ন এক বা একাধিক দেয়াল-ঘেরা প্রয়োজনের ঘেরাটোপকে বোঝায়, তখন কিন্তু ঘর মানেই বাড়ি বোঝাতো: একাধিক চালাযুক্ত আচ্ছাদন, দালান, উঠোন, সংলগ্নজমি পুজোর মন্দির এমন কি গাছ-পালা গোয়ালঘব, ঢেঁকিঘর, রান্নাঘর সব মিলে যে আবাসগুচ্ছ তাকেই আমরা বাড়ি বলতাম, ঘর মনে করতাম। এখন যেমন বাড়ির অধিবাসীর সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে আর ঘরে থাকা লোকের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে তখন তেমন ছিল না।

এই ঘরের যেমন একটা আকর্ষণ আছে, সেই বাড়িরও তেমনি একটা টান ছিল। কিন্তু কোথায় যেন সেখানেও তফাৎ ঘটে গেছে। আমাদের সময়ে আমরা বাড়িতে হাঁপিয়ে উঠতাম না। এখন প্রায় প্রত্যেক গৃহবাসীই চার-দেয়ালের চাপে পিষ্ট বোধ করে, হাঁপিয়ে ওঠে। আমাদের বাড়ির চারপাশে জল-জাঙ্গাল-জঙ্গলের সুবিস্তৃত প্রান্তর দিয়ে ঘেরা ছিল, মাথার উপরে ছিল উন্মুক্ত আকাশ। অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতা যেমন ভোগ করেছি, পেয়েছি মেলামেশার অফুরন্ত সুযোগ, তেমনি জুটেছে নির্মল বাতাসে ফুসফুসের পুষ্টি, আদিগন্ত প্রকৃতির কোলে কল্পনার মুক্ত পক্ষ উড্ডীয়ন পরিসর। বাড়ি যেন ছিল আমাদের কাছে বিরাট একটা ক্রমশ উন্মোচিত উপন্যাস, মহাকাব্য, একটা মহাজীবনের প্রকাশ। বাড়ি বলতে যে কল্পনা-অভিজ্ঞতার স্মৃতি-উন্মেষ ঘটে, এই এখনও, তা যেমন তৃপ্তিদায়ক তেমনি বিস্ময়কর। সব অতীতই স্বর্ণময়, 'পাস্ট ইজ গোল্ডেন'। কিন্তু যদি আমাদের সেই অতীত আমাদেরই কল্পনার সৃষ্টি হয় তা হলেও তো তাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলা উচিত হবে না।

তাই মনে হয় আমাদের ছোটবেলায় বাইরেটা আমাদের ঘরমুখো করে তুলতো। যতবারই বাইরের টানে বাইরে গেছি ততবারই বাড়িটা যেন সর্বক্ষণই সঙ্গে থেকে ফিরিয়ে এনেছে। বাইরেটা যেন ঘরের টানকেই বাড়িয়ে

তুলতো। আর এই এখন দেখি ঘরের মধ্যে যেন প্রাণগুলো ওদের হাঁপিয়ে ওঠে! সুযোগ পেলেই বাইরে চলে যায়। এখনকার জীবনটা যেন বর্তমানের আর ঘরের দৈনন্দিন ঘেরাটোপের চাপে শ্বাসরুদ্ধ,গতানুগতিক। তাই বাইরের হাতছানিতেই যেন জীবনের মুক্তি। এখন ছেলেরা বাইরে যায় ঘরের যন্ত্রণাকে ভুলতে; ঘরে ফেরে অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রয়োজনে। ওরা যেন সকলেই চারদেয়ালের টবে তোলা-জীবনের র‍্যাশন্‌ড্‌ অস্তিত্ব; বাইরে গেলে মনের রসদ, হৃদয়ের তৃপ্তি আর আত্মার মুক্তি খুঁজে পায়।

অনেক ছোটবেলাতেই বাইরে গেছি। বাইরে থেকেছি। বাবার সঙ্গে তার যজমানদের বাড়িতে গেছি। সেখানে স্বীকৃতি পেয়েছি, সান্নিধ্য পেয়েছি আর পেয়েছি অন্য গৃহের নৈকট্য। তার কতটা আমার বাল্যকালের সহজ প্রাপ্য, কতটা পুরোহিত ঠাকুরের তনয় বলে আর কতটাই বা সেই সব গৃহের স্বরূপ-মাধুর্যে তা আর এখন স্মরণ করে বলতে পারি না। তখন তো এ সব সূক্ষ্ম বিষয়-ব্যাপার অনুভব করার মতো মনটাই তৈরি হয় নি। তবে এটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারতাম যে একটা গৃহ-পরিবেশে চলে এসেছি। কখনই এই সময়ের বাইরে-গুলো ব্যক্তিক-মাধুর্যকে ছাপিয়ে নৈর্ব্যক্তিক একাকিত্বে সরে যেতো না। স্বগৃহে যেমন মা-বাবা, ভাই-বোন, কাকিমা-জ্যেঠিমা, হাদান-মানদারা প্রত্যেকে এবং সকলে একটা জীবন্ত চেতনার সূত্রে গাঁথা পরিবেশ দিত, একটা প্রাণবন্ত নৈকট্য, একটা যেন জীবনে-জীবন-যোগ করা স্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে তুলতো, এই সব বাইরে-থাকা, বাইরে-যাওয়া সময় গুলোও যেন ঠিক তেমনিই, সকলে এবং প্রত্যেকে মিলে অনুরূপ একটা চেতনার জগত তুলে ধরত। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে যেন আমার অসীম সম্পর্ক, অন্তত মিলের টানাপোড়েন। সকলেই ব্যক্তি হয়ে, বাস্তব হয়ে আমার জন্যে কিছু না কিছু মূল্য ধারণ করত। সেই গ্রামের গাছ-পালা, পথ-ঘাট, পুকুর-নদী, জল-জঙ্গল সবই যেন কত আপন হয়ে উঠতো। অর্থবহ আত্মীয় স্বজন। বার বারই যখন সে সব গ্রামে, সে সব বাড়িতে গেছি তখন প্রতিবারই মনে হয়েছে যেন আমি সেখানে দীর্ঘ-অপেক্ষিত, আকাঙ্ক্ষিত; তাদের জীবনের, পরিবারের, পরিবেশের একটি আবশ্যিক অংশ। দূরে থাকা সদস্য। উচ্ছ্বাস, আনন্দ, কলরব, সব মিলে যেন মনে হত 'এতো দিন কেন যাই নি?' কোনও একটা বিশেষ বাড়িতে যাবার কথা বলছি না, যে কোনও

বাড়িতে যাবার কথাই বলছি। একজন নয়, বাবার যজমান ছিলেন অনেক। তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন আর্থিক-সামাজিক অবস্থান। এবং সেই রকমই ছিল তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন গৃহ-বিন্যাস, গৃহ-পারিপাট্য। কিন্তু নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্তে কোনও ইতর-বিশেষ ছিল বলে আমার কখনও মনে হয় নি। হতে পারে সে আমার বালসুলভ প্রত্যক্ষে ধরা পড়ে নি। হতে পারে তাঁরা তাঁদের বিত্ত-বিভেদের যে প্রকাশ প্রদর্শন করেছেন তা আমার বোধগম্য হয় নি। হতে পারে। কিন্তু কেন আমি সেই কল্পিত, প্রক্ষিপ্ত চেতনাকে সামনে এনে আমার সেই অতীতের সরল-অনুভবকে নষ্ট করব? সেই বয়সটাতে আমার তো অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রতিবেদন তৈরি করার সময় নয়; তখন তো আমি মনের মাধুরি আস্বাদনের, হৃদয়ের তাপ গ্রহণের এবং স্নেহ-ভালবাসার প্রাণচঞ্চল অবগাহনের জন্যেই উন্মুখ ছিলাম। তাই বাইরে গিয়েও আমি গৃহের স্বাদ পেয়েছি। গৃহকেই অন্যরূপে, অন্য-প্রেক্ষিতে খুঁজে পেয়েছি আমার বাইরে গুলোতে। সে মাজড়াই হোক, খান্দারপাড়াই হোক অথবা হরিদাসপুর, রতনদি, তারাইল-ই হোক।

জীবন এখন অনেকদূরে সরে এসেছে। জীবনের বেড়েছে তীব্রতা, গতি এবং ছন্দ। এখনকার জীবনে খেয়াল-ঠুংরির ঝংকার নেই। জীবনের অনুপুঙ্খ চাহিদা বেড়েছে পর্বতপ্রমাণ, অনুভবের সূক্ষ্মতা ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে গেছে। বন্য পরিবেশ আমাদের জীবনকে আর গাঢ়-সবুজ গভীরতা দেয় না। আমরা আধুনিক হয়ে সাময়িক হয়ে পড়েছি। তাই এখনকার আমরা যখন বাড়ির বাইরে যাই তখন ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা থেকে ছিটকে দূরে চলে যাই। সে যাওয়া যদি পুরী-দীঘা-ডায়মন্ডহারবার হয় তাহলেও যেমন, দার্জিলিং-উটি-কাশ্মীর হলেও তেমনি। আবার, আগের মতো, আমাদের জীবনের সকাল বেলার মতো, যদি কোনও পরিজনের বাড়িতেও যাই তাহলেও তা এক সাময়িক আচার-ব্যবহারের পারিপাট্যে, চা-বিস্কুটের পরিবেশনে সমাপ্ত হয়ে যায়। আসলে বাইরেটাই আমাদের, আমার সন্তানদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। আমাদের সময়ের 'ক্যানভাসে' যে ছবি স্বাভাবিক প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠতো, এখন সেই 'ক্যানভাসটিই' নেই, তাই সেই ছবিই আর অঙ্কিত হয় না। এখন তাই আধুনিক গানের সরব-সাধনায় আমরা ঘরকে বাইরে এনে ফেলেছি, আর বাইরেটাকেও হারিয়ে ফেলেছি প্রতিনিয়তর

প্রতিযোগিতায়, দ্বন্দ্বে আর দ্রুতগতি জীবনের প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে।

এখন ছেলেরা বাইরে যায়, প্রকৃতিকে দেখে যতটা তার চাইতে বেশী দেখতে চায় নিজেকে, নিজেদের। বাড়ীর বহুত্ব থেকে বাইরের একাকিত্বকে, তারা প্রাণভরে ভোগ-উপভোগ করতে চায়। প্রকৃতি তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দূরের প্রকৃতি বা 'ক্যামেরার' প্রকৃতি হয়ে দেয়াল-শোভা বর্ধন করে। বাইরের জীবন এদের কাছে কোনও সংবাদ দেয় না, সংবেদ্যও করে না এদের অন্তরকে। এদের যা কিছু ঘনিষ্ঠতা তা সবই স্ব-নিষ্ঠ, তন্নিষ্ঠ নয়। জীবনে জীবন যোগ করে কোনও নবজীবন উন্মেষ পায় না এই সব বাইরে যাওয়া অভিযানে। কিন্তু আমার সেই ছোট বেলায়, আমাদের সেই ফেলে আসা বাইরেগুলোতে, আমরা অনেক অন্য জীবনকে জেনেছি, দেখেছি, অনুভব করেছি। সে সব জীবন্ত উপস্থিতি এখনও স্মরণকে নাড়া দেয়। কোনও দিদি, কোনও কাকিমা কোনও মাসিমা যেমন, পাতান সম্পর্ক হলেও, অত্যন্ত আপন করে মনের পৃষ্ঠাগুলোতে ছাপের পর ছাপ ফেলে গেছে ঠিক তেমনি অনেক দাদা, কাকা, মামাদের নড়াচড়ার শব্দ যেন কান পাতলে এখনও শুনতে পাই। এই যে ছবির 'পজিটিভ' অবস্থান এবং জীবনের পদশব্দ ধীরে ধীরে মনের সংবেদ্য পৃষ্ঠাগুলোকে গভীর রেখায় প্রত্যক্ষযোগ্য করে তুলতো তার আকর্ষণ কী গভীর করেই না বোধ করেছি! এখনকার সাহিত্য পত্রিকার পৃষ্ঠায় যেমন 'ক্রমশ' একটা তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করে পরবর্তী সংখ্যার জন্যে, আমাদের বাইরেগুলোর মধ্যে মধ্যে এই সব সচল জীবন প্রকাশ তেমনি আমাদের বারে বারেই সেই সব বাইরের টানে গৃহ-ছিন্ন করে টেনে নিয়ে যেতো। কখনও কোনও দিদিমার অর্ধসমাপ্ত গল্প, কখনও কোনও কাকিমার বেদনার অসমাপ্ত ইতিহাস, কোনও ধীরু মামার প্রত্যাখ্যাত জীবন কাহিনী! খুব ছোট বেলায় সে-সব কষ্ট-বেদনা-বিষাদ-যন্ত্রণার যেটুকু বুঝতে পারতাম তাতেই মন কেমন-করা একটা নিকট নিকট টান অনুভব করতাম। অনুনয় বিনয় করে বাবার গৃহ প্রত্যাবর্তনকে বিলম্বিত করে দিতাম। এমনও হয়েছে যে বাবা চলে এসেছেন, তার শিষ্য পরদিন আমাকে আমার বাড়িতে পোঁছে দিয়ে গেছে। আমি আমার নায়ক নায়িকার জীবনের অসমাপ্ত পর্যায় ছেড়ে চলে আসতে পারি নি।

সোয়াগীকে আপনারা চেনেন না। আমি চিনি। মন্টু ছিল আমার বন্ধু,

সমবয়সী এবং সমশ্রেণীর। সোয়াগী মন্টুর বড়দি। আপন নয়, খুড়তুতো। সে ছিল আবার আমার বড়দির বয়সীও। সোয়াগীকে দেখেই আমি প্রথম বুঝেছিলাম যে আমার বড়দিও নিশ্চয়ই বড় হয়ে গেছে। এই 'বড় হয়ে যাওয়াটা' যে ঠিক কি হয়ে যাওয়া বা হয়ে ওঠা তা তখনও বোঝার মতো বয়স আমাদের হয় নি। মা-মাসিদের মুখে বারে বারেই 'বড় হলে বুঝবি' শুনে শুনে এই 'বড়-হওয়া' ব্যাপারটাই একটা বিস্ময়-আবরণের মোড়ক পেয়ে গেছিল। তাই সোয়াগী যখন একান্তে বসে আকাশের দিকে নিরুদ্দেশ তাকিয়ে থাকত, আমাকে পেলে পাশে বসিয়ে অকারণেই চোখের জল ফেলত আর আপন মনে অনেক অনেক কথা বলত তখন বুঝতাম, তার বাঁধহীন চোখের জলে, গলার গভীর উত্থান পতনেই বুঝতে পাবতাম, সে বড় হয়ে গেছে। কারণ তার কথা, তার কান্না আমি, আমরা, বুঝতে পারতাম না। এই বুঝতে না-পারাতেই পরিষ্কার বুঝে গেলাম যে সোয়াগীর বড্ড দুঃখ। আর তখনই আমার চোখেও জল এসে যেতো। তাহলে কি আমার বড়দিবও এরকম দুঃখ আছে ? সেও কি বড় হয়ে গেছে ? সেও কি আমার মতো কাউকে কাছে পেলে অফুরন্ত চোখের জল ফেলে ? আমার মনটা হু হু করে উঠতো। দিদিকে যে আমি ভীষণই ভালবাসি। দিদিও। তাহলে ? দিদিতো কোনও দিনই আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন করে কাঁদে নি ! তাহলে কি সে একা একাই কাঁদে, চোখের জলের ধারা কি তার কাউকে মাধ্যম পায় না ? আর সেই জন্যেই বাড়ি ফিরে এসে দিদির চারপাশে ঘুর্ ঘুর্ করতাম, বার বারই তার চোখের দিকে তাকাতাম। আর কতো বকুনিই যে খেয়েছি সেই অকারণ নৈকট্যের তাড়নায় ! দিদিতো জানে না যে আমি তার দুঃখের সন্ধানে ঘুরছি। যেমন সোয়াগীর দুঃখের পাশে থেকে বুঝেছি যে কেউ পাশে থাকলে বোধহয় দুঃখ একটু কমে। তাহলে কি দিদির আমার কোনও দুঃখই নেই ? তা কেমন করে হবে ? দিদিযে বড় হয়ে গেছে !

দিদির চোখেও আমি জল ঝরতে দেখেছি। সে অনেক পরের কথা। আমিও তখন একটু বড় হয়ে গেছি। দিদিকে উদাস দেখেছি, তন্ময় হয়ে দূরে ধানের ক্ষেতের দিকে, আকাশের নীলে, দৃষ্টিবদ্ধ দেখেছি। সে অনেক পরের কথা। সময় মতো পরে বলা যাবে। এখন সোয়াগীর কথাটা হচ্ছিল সেই কথাটাই হোক্।

অত্যন্ত সরল গ্রাম্য মেয়ে। লেখাপড়া বেশীদূর হয় নি। গ্রামবাংলায়

যেমন হয় আর কি। দু'চার বছর পাঠশালায় যাতায়াত করে। মেয়ে বলে অভিভাবকের প্রত্যাশা নাম ঠিকানা লিখতে পারা পর্যন্ত। মেয়ে দেখতে এলে হাতের লেখা দেখতে চায় যে! কিন্তু সর্বনাশটা সেই পথেই প্রবেশ করে। যে যোগ্যতায় নামঠিকানা লেখা যায় সেই ক্ষমতাকেই চিঠি লেখার কাজে ব্যবহার করা যায়। অন্য দুচারখানা নাটক নভেলও কি আর পড়া হতে বাধা থাকে? শক্ত শব্দ আর কঠিন ভাবের আড়ালে সমান্তরাল বহমান বঙ্কিম অনুভব ও তো বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে পড়ে ছলাৎ ছলাৎ করে কল্পনার জগতকে অসীমের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিতে পারে। দিয়েও থাকে। দোষ দেওয়া বৃথা।

আমার নিজের দিদি হলে বলতাম উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। সোয়াগী আমার নিজের দিদি নয়। তাছাড়া দেহের গঠনে মেদের প্রাবল্য বেশ শৈশব থেকেই। আর মুখমণ্ডল? দলের মধ্যে থাকলে হারিয়ে যাবার মতোই। দৃষ্টিতেও যে কোনও ধার আছে তা নয়। সব মিলে একেবারেই সাদামাটা। একটু যেন বেশী সাধারণের দিকেই বলা যায়।

ওদের দুই তরফের এজমালি বাড়িতে সব মিলে অনেকগুলো ঘর ছিল। মন্টুদের ছিল দালান। সোযাগীদের টিনের ঘর। তাছাড়া বৈঠকখানা, অতিথিদের জন্যে একখানা ঘর, মন্দির এবং অন্যান্য আরও দু'একখানা। মাঝখানে উঠোন ঘিরে সব ঘরগুলো বেশ ঘনিষ্ঠ। চারপাশে আম-জাম কাঁঠালের বাগান। প্রচুর। বৈঠকখানার সামনে ছোট্ট একফালি ফাঁকা জমির সামনে বিরাট সুপুরি বাগান। পেছনের দিকে লেবু বাগান। ওখানকার ঘর বাড়ি গুলোই এরকম বাগান-ঘেরা সুপরিসর। আমার জন্যে স্বর্গের স্বাদ এনে দিতে পারতো। তাছাড়া ওদের গ্রামে দুটো ফুটবল মাঠ ও ছিল যে!

পুজোপার্বণে অনেক লোকজনের আনাগোনা, দেওয়া-থোওয়া, খাওয়া-দাওয়া। তখনকার দিনে তো 'ক্যাটারিং'-ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় নি তাই বাড়ির মেয়েরা ছেলেরা মিলে মিশেই ছোটবড় সব কাজই সম্পন্ন করে ফেলত। ধকল যেত, নৈকট্য বাড়ত, চেনাজানা ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াতো। আর কে না জানে যে একটা বিশেষ বয়সে, একটা বিশেষ বিন্যাসে, এই নৈকট্য উভয়-মুখী হয়। কুঁড়িতে বাতাসের দোলানি আর হৃদয়-সূর্যের তাপ খুব তাড়াতাড়িই কুঁড়িকে উন্মুক্ত করে। সে পাপড়ি ছাড়ে, ছড়ায়, উন্মুখ হয়। মাঝে মাঝে বছর ঘুরে

আসে। পূজাপার্বনের লোকসমাবেশকে সোয়াগীর ভাল লাগে। ভাল লাগে সেই তির তির ভাবনাটার জন্যেই। অমলও তো আসবে। অমল আসেও। দু'চারদিনের কর্মব্যস্ত সকাল-দুপুর-সন্ধ্যার ফাঁকে ফাঁকে অন্তঃসলিলা অব্যক্ত নিজেকে ধরা দেয়। জানাজানি হয় দুজনে দুজনে। অনেক কল্পনা, আশা, প্রতিজ্ঞার চেহারা নেয়। যা হয় তাই হচ্ছিল ঃ আমরা দু'জনা স্বর্গ খেলনা গড়িব এ ধরণীতে।

কিন্তু কোথায় স্বর্গ, কোথায় ধরণী। সব যেন চুরমার হয়ে গেল। অনেক পূজাপার্বন তার পরেও এসেছে। আনাগোনা হয়েছে বহুলোকের, চেনা জানা হয়েছে আরও অনেকের সঙ্গে। কিন্তু অমল আর আসে নি। কেন আসে নি সেই মেয়ে তা জানে না। তখনও জানে নি। শুধু সেই না আসার বিষণ্ণ সত্যটি সোয়াগীর চোখের জল হয়ে কখনও তার কোলে, কখনও মেঝেতে ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়েছে। সেই অশ্রু শুভ্র ছিল কিনা জানি না, সমুজ্জ্বল হয়েছিল কিনা তাও আমার অজানা। তখন অবশ্যই অত শত বুঝি নি। এখন, এই এতোদিন পরে, ভাবি, সেই অসম্পূর্ণ-জানা জীবন বিষণ্ণতার কোনও মর্মর মূর্তি সেই গ্রাম্য মেয়ের হৃদয়ের কোনও একান্ত প্রান্তে যদি সৃষ্টি হয়েও থাকে তাহলেও তা ভাষা পায় নি, কবিতা হয়ে যুগ-যুগান্তে প্রবাহ পায় নি। সে সম্ভবও ছিল না।

দশ-বার বছর পরে মন্টুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। জেনেছিলাম সোয়াগী মারা গেছে। জীর্ণ-শীর্ণ চেহারায় একটা হাহাকার নাকি শেষ হয়ে গেল দেশভাগের ডামাডোলে। কেউ তাকে স্মরণ করার ছিল না।

সোয়াগীর অনেক কথাই আমার জানা হয় নি। কিন্তু রাধার কথা জানি। রাধাকে আপনারা চিনতেও পারেন। সে পরাজিত হবার জন্যে জন্মায় নি। বর্ণে, স্বভাবে, চলনে এবং চাঞ্চল্যে সে যে-কোনও বংশীবাদকের ললিত নৈকট্যকে অত্যন্ত অনায়াসেই আকর্ষণ করতে সক্ষম। পাঠশালা সে শেষ করেছে। গড়গড় করে বই পড়ে, ঝর ঝর করে কথা বলে। সে যে দিকে তাকায় সে দিকে দেখে না; অর্থাৎ যে দিকে তাকায় বলে আমার আপনার মনে হবে আসলে সে সে-দিকে দেখে না! স্থির অথবা গতিশীল—যে কোনও অবস্থাতেই রাধার গ্রীবাটি বঙ্কিম, ভ্রূ যুগল সদাই যেন 'ছিলা' পরানই আছে। তার চলনটি ত্রি-স্তর ঢেউ-এর মতো—নিম্ন-মধ্য-ঊর্ধ্ব-ভঙ্গে ছন্দময়। গ্রাম্য পরিবেশে বড় হতে হতে

সে কেমন করে এই সব ইন্দ্র-সভা-সান্নিধ্য-সুলভ গুণাবলী আয়ত্ত করেছিল সে অনেকের কাছেই বিস্ময়। প্রকৃতির নিজস্ব পাঠশালায় যে সকল ছাত্রী নিজেদের তৈরি করে তোলে রাধা বোধহয় সেই অঘটন ঘটন পটীয়সী ছলাকলায় নিজেকে যোগ্য করে তুলেছিল সেই নিয়মেই।

ছেলেবেলাতে অনেকেরই ভাগ্যে গুরু জুটে যায়। এরা ধর্মের গুরু নয়, সামাজিক গুরু। আমাদের যখন ঔৎসুক্য দু'চারটি পাতা ছাড়ছে তখন এমন একজন গুরু আমাদের জুটে গেল। দু'ক্লাস উঁচুতে পড়ত। দীর্ঘ দেবসুলভ চেহারা। নস্যি নিত। সেই সুবাদে আমাদেরও 'নাকে খড়ি' হয়ে গেল। বড়দের আলোচনা থেকে সংগ্রহ করা দু'চাব টুকরো শব্দ বা কথা নিয়ে আমরা'গুরু'-র পাদপদ্মে হাজির হতাম। কি অনায়াস কুশলতায় সেই সব টুকরো টুকরো কথাকে সম্পূর্ণ করে জলের মতো বুঝিয়ে দিতে পারতো সেই গুরু। আমরা অবাক বিস্ময়ে তার জ্ঞানের গভীরতা, জানাব পরিধি এবং ব্যাখ্যাকারী যোগ্যতার অভিঘাতে অধিকতর বিমূঢ় হয়ে ঊর্ধ্বমস্তক, বিস্ফারিত দৃষ্টি হয়ে সেই গুরুর দিকে:অনিমেষ হতাম।

মেয়েদের জগৎকে আমরা এই গুরুর 'পেরিস্কোপে' দেখতাম। রাধাকে সেই গুরু-পেরিস্কোপেই দেখেছিলাম। শুধু রাধা নয়, গ্রামের অনেক মেয়েদেরই অন্দরমহলের খবরাখবর আমাদের নখদর্পণে ছিল। আমাদের বড় ছোট অনেক বিবাহিত অবিবাহিত জনের নৈকট্য পেতে অসুবিধা হত না। আমরা বালক। সন্দেহের এবং সমীহের বাইরে। তাই আমরা কথা সংগ্রহ করেছি, বাক্যালাপের অংশ নিয়ে গুরুকে উপহার দিয়েছি, বক্তা ও শ্রোতার চোখের গতি প্রকৃতি এবং কণ্ঠের উত্থান পতন 'রেকর্ড' করে পৌঁছে দিয়েছি আমাদের গুরু কম্প্যুটারে। আর নীচে বসে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে গুরুর ব্যাখ্যা ও নির্দেশ শুনেছি। সব বুঝতে পারতাম না। সে কথা অবশ্য আমাদের গুরু আমাদের মাঝে মাঝেই স্মরণ করিয়ে দিতো। 'বড় হলে বুঝবি'-ব্যাপারটা গুরুর মুখেও অনেকবারই শুনতে হয়েছে। তবুও কি যেন একটা মন কেমন করা ঔৎসুক্য ভেতরে ভেতরে আমাদের উত্যক্ত করত যার অমোঘ টানেই আমরা গুরু-নৈকট্য আকাঙ্ক্ষা করতাম।

এই গুরুর নির্দেশে আমরা একাধিক অভিযানও করেছি। কারো কারো মধ্যে 'ভাব' আছে বললে আমরা বুঝতে পারতাম। প্রেম ব্যাপারটা তখনও বুঝি

না ! গুরু অনেক করে বুঝিয়ে বলেও নি। বলেছে পরে বুঝাবি। তবে এই সব অভিযানে কিছু একটা গোপনতার উম্ঘাটনই যে গুরুর উদ্দেশ্য থাকত তা বুঝতে পারতাম। তাই একটা তীব্র আকর্ষণও বোধ করেছি প্রত্যেক বারই। গ্রামে যাত্রা-থিয়েটার-পালাগান মাঝে মধ্যেই হত। আর সেই সব অনুষ্ঠানের রাতগুলোতেই গুরু নির্দেশিত অভিযান চলত। এ রকমের এক অভিযানেই জেনেছিলাম যে রাধার মনে 'কৃষ্ণের' টান কত গভীর। ওদের একান্ত হওয়াটাই নাকি অনিবার্য ছিল। ওদের নাকি অনেক কথা থাকে যা ভীড়ের মধ্যে বলা যায় না !

অন্যান্য বাড়ির ছেলেরা বেশ স্বাধীন ছিল। তারা নভেল নাটক পড়তে পেতো। অনেককেই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তেও দেখেছি। গাছতলায়, মাঠের ধারে আবার কখনও পড়ার টেবিলেই পাঠ্য বই এর আড়ালে রেখে। আমাদের কেমন অবাক লাগত। আমাদের বাড়িতে ম্যাট্রিক পাশ না করা পর্যন্ত নভেল পড়া নিষেধ ছিল ! ভ্রমন বৃত্তান্ত, মহাজীবনের কাহিনী, ধর্মবিষয়ক পুস্তকাদিতে কোনও বাধা ছিল না। যতো নির্দয় নিষেধ ছিল শরৎ বঙ্কিমে। তাই আমরা অনেক বিষয়ই জানতাম না। দুটি-একটি পাতা যখন শির্ শির্ করে কিশোর আকাশের রঙিন চেতনায় মাথা তুলতে চেষ্টা করত তখনই সঙ্গীসাথীদের দ্বারস্থ হতে হত। আমাদের গুরু প্রাপ্তির এইতো ইতিহাস।

আমাদের চেতনায় যখন এই আলো-আঁধারি অনুভব ছায়া-ছায়া আসা যাওয়া করছিল তখন রাধা'রা নিশ্চয়ই প্রাণবন্যার অনুভব বেশ গাঢ় করেই পেয়ে থাকবে। গুরু-রাও। উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে স্থানান্বেষণ, প্রাকৃতিক কারণেই অসম্ভব বলে পরিত্যক্ত গৃহকোণ খুঁজে নিত। রাধাদের এই অন্বেষণ এবং উৎকর্ণ অপেক্ষা গরু'রা সহজাত বাসনাঘাতেই বুঝে নিত। তাই সেই সব দিনে গুরু আমাদের আগে থেকেই হুঁশিয়ার করে নির্দেশিত স্থানে অপেক্ষা করতে বলত, যখন গ্রামের সকল গৃহই কম বেশী পরিত্যক্ত হয়ে জড়ো হত কোনও যাত্রার আসরে বা থিয়েটারের অঙ্গনে। এবং পাকা সাপুড়ের মতো গুরুর হাতে ধরা পড়ে যেতো সেই শ্বেত সাপ !

আমরা খুব যে বেশী কিছু তখন বুঝতে পারতাম তা নয়। তবে গুরুর পা ধরে কান্না, অন্ধকার পরিবেশে চাপা অনুনয় বিনয়, আমাদের শিরদাঁড়ায়

একরকম অনুভব প্রবাহিত করে দিত যা নিশ্চিত ঘোষণা করত এ ঠিক নয়, এ অন্যায়, এ পাপ। অন্ধকারাচ্ছন্ন কাজ যে অন্ধকারেই অধিকতর করণীয় সে কথা ইংরেজী সাহিত্য পড়ে অনেক পরে জেনেছি। এবং প্রেম করা যে যুবক যুবতীর প্রাকৃতিক দায়, সেখানে দোষের কিছুই নেই সে তথ্যও জেনেছি অনেক পরে। কিন্তু সেই গ্রাম্য পরিবেশে 'ভাব' পর্যন্ত চললেও 'ভালবাসা' ছিল অপরাধ। আর প্রেম? একেবারে ঢিঢিক্কার পড়ে যেতো চারদিকে।

তাই এক একটা 'অন্ধকার উপস্থিতির' হাতে-নাতে আবিষ্কার গুরুকে প্রায় ভাস্কো-ডা-গামার মতো ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তুলত! ক'একটা দিন গুরু সত্যিই গুরু হয়ে গম্ভীর গম্ভীর কথা বলত। আর আমরা আরও বেশী বেশী করে নিজেদের দেদীপ্যমান মনে করতাম—সেই বিকিরিত গুরু-আলোতে! অনেকটাই সম্পন্ন সম্পন্ন মনে হত। কিন্তু তীক্ষ্ন নিষেধ ছিল কোথাও কারো কাছেই এই সব আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করা যাবে না। আমাদের মন্ত্রগুপ্তির শপথ ছিল। তাই কখনও কষ্ট বোধ করিনি।

কিন্তু কষ্টের মসি চিহ্ন দেখেছি রাধাদের চোখে মুখে। এক দিনেই যেন তারা বুড়িয়ে যেতো। তাদের সকল সরসতা, চঞ্চলতা, বক্রগ্রীব চলন বলন হারিয়ে যেতো! তখন আবার মন খারাপ হয়ে যেতো। চেনা, জানা, কতোই তো ভালবাসতো আমাকে। তাহলে? অনুশোচনার হুল তীক্ষ্ন বিদ্ধ করত আমার চেতনাকে। না গেলেই বোধহয় ভাল হত। কে যে ঠিক আর কে যে বেঠিক কাজ করছে তাই আমার গুলিয়ে যেতো। রাধাকে দেখলেই মন খারাপ হয়ে যেতো।

তাই যখন শুনেছি যে রাধা তার মামাবাড়ি চলে যাবে তখন বেশ একটা মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলাম। এবং যখন সত্যিসত্যিই চলে গেল তখন হাঁফ্ ছেড়ে ভাবলাম—যাক্ বাঁচা গেল!

আমাদের বাড়িতে দুর্গাপূজা হোত। সেই সময় বাইরেটা আমাদের বাড়িতেই এসে পড়তো। বাড়িতে থেকেই আমরা ঝলকে ঝলকে বাইরের জীবন, বাইরের হাওয়া, বাইরের প্রাণকে সহজেই পেয়ে যেতাম। পূজোর সপ্তাহখানেক আগে থেকে যে আগমনী চলত তা কালীপূজোর পরে শেষ হত। সে ছিল এক দীর্ঘ বিশ্বপরিক্রমা যা আমরা বাড়ির মধ্যে থেকেই প্রতিনিয়ত প্রতিটি মুহূর্তেই অনুভব করতে পারতাম। ঐ-আসছে ঐ-আসছে করে দেবীপক্ষ এই-এলো

এই-এলো-বলে হয়ে আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে সুর মূর্ছনা তুলতো। এবং একবার এসে পড়ার পর থেকে সেই যে আলো-বাতাস-আনন্দের সদা চঞ্চল হাট বসে যেতো তা যেন আমরা গোগ্রাসে গিলতাম, নিরবধি পান করার বাসনায় 'কি করি কোথা যাই' মনোভাব নিয়ে ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি দৌড়োদৌড়ি করে নিজেদের মাতাল করে ফেলতাম।

যেদিন প্রথম 'দেউড়ী' আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হতেন তাঁর সাকরেদ নিয়ে সেদিন সেই খবর বিদ্যুৎ গতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো! আমরা যে যেখানে যেমন অবস্থায়ই থাকতাম সেখান থেকেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট্ লাগাতাম। দেউড়ী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি পূজামণ্ডপের বারান্দায় বসে প্রতিমাগুলিকে একে একে ধাপে ধাপে খড়ের বাণ্ডিল থেকে অপূর্বসুন্দর দেবাকৃতিতে রূপান্তরিত করবেন। সে এক তাজ্জব ব্যাপার বলে আমাদের মনে হত। একটা সৃষ্টি ধীরে ধীরে কিছুই নেই অবস্থা থেকে সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতিমার আকার নিচ্ছে! আমাদের মিনিটগুলো চলে যেতো ঘণ্টায়, ঘন্টা ঢুকে যেতো খাবার সময়ের গভীরে। সাতবার ডাকলে উঠতে পারতাম না। যেন উঠে গেলে সব থেমে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে! দুপুরের খাওয়া আর রাতের ঘুম ঘুচে যেতো আমাদের। কর্ণাকর্ষণ ছাড়া আমাদের অন্য কোনও টানে বাড়ির মধ্যে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বাড়িতে প্রতিমার কাঠামো তৈরি হচ্ছে, খড়ের মুঠি ভিন্ন ভিন্ন বন্ধনে ভিন্ন ভিন্ন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করছে। আমাদের তখনও স্কুল চলত, কিন্তু মন চলত না। আমরা অনিচ্ছুক ঘোড়া হয়ে যেতাম, বিদ্যাভ্যাস রূপ জল আমাদের পান করানো অসম্ভব ছিল। তা সত্ত্বেও স্কুলে যাওয়া অনিবার্য ছিল। কী পীড়ন, কী পীড়ন! বড়দের বোধবুদ্ধি থাকলেও যে মন বলে কিছু থাকতে নেই সেকথা সেই অনেক ছোটবেলা থেকেই জেনে গেছি! ক'টা দিন আমরা বোবা-মার খেতাম। বইখাতা হাতে উবু হয়ে দেউড়ীর সামনে বসে বসে এক দৃষ্টি হয়ে থাকতাম। হঠাৎই অভিভাবক দেখে তীব্র গতিতে স্কুলমুখো দৌড় লাগাতাম। ফেরার সময়টাও ছিল তেমনি দলবদ্ধ দৌড়ের প্রতিযোগিতা। দড়ির প্রতিটা প্যাঁচ, প্রত্যেকটা বাঁধনের কৌশল, মাটি যখন 'ছেনা' বা পিণ্ড হত তখনও তুষ মিশ্রিত সেই মাটির প্রতিটি পেষণ, ঘূর্ণন এবং মর্দন যেন না দেখলে কিছুই দেখা হত না। আর নেদু পাল যে কী অসীম ধৈর্যে এইসব

কাজ করে যেতেন তা বলে বোঝানো যাবে না। নেদু পাল ছিলেন সেই দেউড়ীমশাই, পালমশাই যিনি শিল্পী, স্রষ্টা এবং আমাদের দিন-রাতের আকর্ষণ কেন্দ্র।

প্রথম দিকে সব যেন কেমন আগোছালো অবিন্যস্ত দেখতাম। এখানে ওখানে খড়ের বোঝা, বাঁশ-কাঠ, কাটারি-কুড়োল, দড়িদড়া। আর জমা থাকত মাটির ঢিবি এবং তার পাশে তুষের সংগ্রহ। জলের ব্যবস্থাও। আমাদের স্কুল বন্ধ হতে হতেই মহালয়া এসে যেতো। একই সঙ্গে খবর এসে যেতো কোন কাকা, কোন দাদা কোন দিদি কোন জামাইবাবু বা মামাবাবু কবে কখন কোন পথে আসবেন। যেন জগঝম্পে ঘা পড়ে যেতো। চিঠি যারা পেতেন এবং পড়তেন তাঁদেব আনন্দ প্রকাশ পেতো শুধুমাত্র চোখেমুখে কথায়-বার্তায়, আর আমরা ছুটোছুটি করে সেই বার্তা পাত্র থেকে পাত্রান্তরে পেঁাছে দিতাম হাওয়ার বেগে।

এবং সুরু হয়ে যেতো অপেক্ষা। বহির্বিশ্ব আমাদের গৃহনীড়ে পেঁাছোনোর জন্যে প্রধান দু'টি পথ বেছে দিত। জলপথ এবং রেলপথ। ঘোনাপাড়া স্টিমার ঘাট। সেখান থেকে জল থাকলে নৌকো, জল মরে গেলে হাঁটা পথ। তিন মাইল। কাশিয়ানী রেল ষ্টেশন। সেখান থেকেও ঐ নৌকো আর হাঁটার ব্যবস্থা। ছ'মাইল। তাছাড়া অনেকে আসবেন নিকট-দূরত্ব থেকে। পাঁচ-দশ-পনেরো মাইল মাত্র। তাঁরা আসবেন নৌকোয়, পাল্কিতে অথবা হেঁটে। সে সব আসাগুলোর সবই ছিল আগমন, আবির্ভাব, উপস্থিতি। ঝলক ঝলক কলকাতা হুড়মুড় করে প্রবেশ করত আমাদের সেই গ্রাম্য পরিবেশে। এক ঝাঁক ডানা ঝাপটানো উজ্জ্বল পাখির প্রাণবন্ত সৌন্দর্য নিয়ে নৌকো থেকে আত্মীয়স্বজনরা তাঁদের ঘর-সংসার নিয়ে বাড়িতে হাজির হতেন। আমরা দল বেঁধে অপেক্ষা করতাম, নির্দিষ্ট সময়ে পথবেয়ে এগিয়ে যেতাম অনেক দূর, যদি পথ শুকনো থাকতো। জল-পথ হলে অবশ্যই একবার ঘাট একবার ঘর এই করতে করতেই সময় কেটে যেতো।

কিন্তু আসছে আসছে-র আনন্দটা যত তীব্র ছিল, সব সময় এসে পড়াটা তেমনটি আনন্দঘন হত না। আমরা, ছোটরা, প্রায়ই হারিয়ে যেতাম সেই উপস্থিতির ঘন নৈকট্য থেকে। প্রণাম, আশীর্বাদ, কথাবার্তা, জিনিসপত্রের টানাটানি সব মিলে যেন আমাদের অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক করে তুলতো। আমরা

আনন্দ পেতাম, উৎফুল্ল হতাম। নাইবা পেলাম সহৃদয় সান্নিধ্য, নাই বা পেলাম স্বীকৃতি। আমাদের তাজা সবুজ গ্রাম্য মনে সে সব কোনও বঞ্চনার অভিজ্ঞতা তৈরি করেনি। স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক একবছর পরে আমরা যে একটি করে বছরে বড় হয়ে যেতাম তাও তো ওদের চোখের আড়ালেই। কিন্তু গতবছরের আদর, নৈকট্য, ভালবাসা আমাদের স্মরণকে সজীব করেই রাখত। তাই কোনও অভিযোগ দানা বাঁধে নি, নয় কোনও ক্ষোভ।

অন্য কারণও ছিল। এইসব বহির্বিশ্বের ভগীরথরা প্রত্যেকেই আমাদের কাছে অত্যন্ত আপন ছিলেন। হাজুকাকা আসছেন। গল্পের ভাণ্ডার আমাদের সামনে তার সিংহদুয়ার খুলে দেবে। ছোটকাকা, যেমন মিষ্টি মিষ্টি কথা তেমনি সুন্দর পরিপাটি চেহারা। তিনি আমাদের সকাল সন্ধ্যাগুলোকে ঘাসের গন্ধে আর শিশিরের শীতলতায় স্নিগ্ধ করে দেবেন। তিনি আমাদের হাত ধরে ভোর বেলায় গ্রামের পথে হাঁটবেন, প্রান্তরে বিচরণ করবেন। এবং ছোট ছোট করে কত কথা বলবেন, কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। তাতে জ্ঞান পরীক্ষার ঝাঁঝ থাকবে না। উপরের আকাশ, বাইরের পৃথিবী, আর নানা জীবনের খুটিনাটির খবর থাকবে। অনেক জানালা, অনেক দরজা খুলে দেবেন নিপুণ হাতে। আমরা অবাক বিস্ময়ের সেই সব জানা চেনা দিয়ে আমাদের রুদ্ধদ্বার গ্রাম্য আস্তানার অপ্রবেশ্য জীবনে বাইরেটাকে দেখব, চিনব, খুঁজে পাব। ছোটপিসীমার ঝুলিতে যে কি থাকবে আর কি থাকবেনা তা কেউ জানে না! আমরা প্রাণের এবং রসনার তৃপ্তি খুঁজে পাই সেই ঝোলার অভ্যন্তরে। আর কি মিষ্টি স্বভাব, কি মধুর নৈকট্যের আস্বাদন। তাছাড়া দিদিরা, ভাইরা, ছোট ছোট সব ছাপমারা সুন্দর পোষাকে পরিশীলিত বাচ্চারা?

আমরা ঘরে থেকেও বাইরেটাকে কত সহজেই তৈরি করে, কাছে পেয়ে ক'টা দিন কী আনন্দেই না কাটাতে পারতাম। মনে মনে কত বাসনা, কত কামনা কত ইচ্ছা উঁকি দিত। কবে যাবো বাইরে? কবে আসব আমরা ওদের মতো বিশ্বকে গৃহ-নীড়ে বহন করে। আর তখনকার 'আমরা' সেই আমাদের আসা'র পথ চেয়ে দিন গুনবে!

সব হয় না। অনেক ধ্বংস হয়ে যায়। তা তখন জানতাম না। দেশ

বিভাজন আমাদের কল্পনার জীবনকেও তো এক-ঝটকায় কেটে ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন বিভক্ত নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেছে। আমরা ঘর হারিয়ে ফেলেছি।

সব হারিয়ে গিয়েও তো সব শেষ হয়ে যায় না। আহম্মদ ছিল মা'এর এক সন্তান। ছেলে। অনেকেই ছিল, আহম্মদ ছিল তাদের মধ্যে বিশেষ। প্রথম প্রথম দাড়িমুখে যুবক বয়সী একটি দাদা পেয়ে বেশ অস্বস্তি বোধ করেছি। অথচ যে গভীর দ্যোতনায় আহম্মদ 'মা' বলে দাওয়ায় বা সিঁড়িতে এসে দাঁড়াতো তার মধ্যে কোনও ফাঁকি তো ছিলই না, কেমন যেন মনে হত বোধহয় মায়ের আপন সন্তানই এসেছে। কিছু না কিছু হাতে করে আসতই। কখনও ভাল কোনও মাছ, প্রায়ই কালো চক্‌চকে মাটির পাত্রে দুধ। আহম্মদ যখন আসত তখন তার সেই আন্তরিক উপস্থিতির পথ বেয়ে, আর 'মা' ডাকের হার্দিক ঝংকারে এক ঝলক পুবের হাওয়া যেন আমাদের মসৃণ দালানে বইতে সুরু করত। কিছুদিনের মধ্যেই তার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল। ক্রমশ গভীর ভালবাসা। মাইলখানেক দূরে পুবদিকেই ছিল আহম্মদদের গ্রাম। আমার হাত ধরে সে নিয়ে গেছে তাদের দরিদ্র গৃহে। সেখানে আহম্মদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ওদের গ্রামে ঘুরে ঘুরে অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করেছি, পরিচয় হয়েছে। গরিব, কিন্তু অন্তরে নয়, নয় পরিচ্ছন্নতায়। আমাদের গ্রামের সনাতনদের বাড়িতে অনেকবারই গেছি, গেছি হাদানদের ঘরেও, মানদার ডেরায়। কিন্তু এদের সকলের দারিদ্র যেন মনের ওপরও ছাপ ফেলে গেছে। অত্যন্ত অগোছালো, অপরিষ্কার হতশ্রী অবস্থা। কিন্তু যে পরিবেশ আহম্মদদের গৃহে এবং গ্রামে দেখেছি তা আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। ওদের মুরগী-ছাগল গরু-বাছুরগুলো আদর করতে ইচ্ছে করত। নিকোনো দাওয়ায় যখন মুড়ি খেতে দিত তখন মনের আনন্দেই সেগুলো খেয়ে ফেলেছি।

আমাদের বাড়ির যে কোনও কাজেই আহম্মদের ছিল অনিবার্য দায়। সে যথাসময়ে এসে পড়ত এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং আন্তরিক চেষ্টায় সব কাজই সুসম্পন্ন করার জন্যে এক পায়ে হাজির থাকত। সব থেকে আনন্দ পেতাম ওদের ঈদের সময় আর আমাদের দুর্গাপুজোর সময়। নেদু পাল এলে আমাদের যেমন খাওয়া দাওয়া ভুলিয়ে দিত ঠিক তেমনি আহম্মদের ছেলেমেয়েরাও দলে দলে সকাল বিকেল উঠোনে-দাওয়ায় নেদুপালের আশেপাশে

ঘুর ঘুর করত। ওদের ছিল নিজের নিজের একটা ভাব। তাই ওরা আমাদের সঙ্গেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেদুপালের হাতের কৌশল অনিমেষ দেখতো। ওদের সঙ্গে যারা আসতো তারা একান্তে একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা দূর-দূর ভাব রেখে দেখতে থাকত। বললেও কাছে এসে বসত না। একটা কিন্তু কিন্তু ভাব যেন ওদের দাঁড়ানো থেকে দেখা, অপেক্ষা থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত ওদের নিত্য সঙ্গী হয়ে একটা দূরত্বের আবরণ তৈরি করেই রাখতো। আশ্চর্য এই যে এটাই যেন স্বাভাবিক বলে আমাদের বালক মনে ধারণা হয়ে গেছিল। ওরা যে মুসলমান এটা সেই ওদের সম্পর্কে সত্যি হয়ে উঠতো। কিন্তু আহম্মদের ছেলেমেয়েরা তো আমাদের আত্মীয়! তাই ওরা আর আমরা তো আলাদা নই! আত্মপর বোধগুলো আসলে যতটা সমাজ সংস্কার নির্দেশিত তার চাইতে অনেক বেশী মনের মিলে অমিলে নিশ্চিত।

পুজোর কটা দিন কি যে হত তা পরিষ্কার বুঝিনি। আমাদের গৃহবেষ্টনের সকল বেড়াগুলো উন্মুক্ত হয়ে বাইরেটাই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে সেখানে প্রবেশ করত, না আমরাই আমাদের মন-চেতনা-অস্তিত্ব নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতাম তা তখন বুঝতে পারিনি। এখনও যে বুঝি তা নয়। বাড়িময় একটা নোতুন নোতুন হাওয়া, নোতুন কাপড়ের শব্দ-গন্ধ-বর্ণ, গ্রাম শহরের সেই একত্র-স্থিত নীড়, হাসি-গল্প-উচ্ছ্বাস, দলে দলে বড়ো-ছোটোর আনাগোনা ঝাঁকে ঝাঁকে কিশোর কিশোরীদের প্রজাপতি চলন, বালক বালিকার যত্র-তত্র যেমন খুশি তেমন দৌড়-ঝাঁপ, উত্থান-পতন, খিল-খিল হাসি আর উচ্চ-নীচ কান্নার রোল, মায়ের শাসন, দিদির আদর, পিতার তিরস্কার—সব মিলে যেন লোকের মেলা, অনন্দের হাট আর পুজো-পুজো স্বাধীনতা। এসব যেমন বাড়ির মধ্যেই ঘটত, বাড়ির লোকেদের এবং অতিথিঅভ্যাগতদের দিনলিপি ছিল, তেমনি আসা-যাওয়া ছিল বাইরের লোকের। সেখানেও ছিল না সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যার কোনও বাধা। শুধু দেখতাম ব্যক্তি পরিবর্তিত হচ্ছে, আনাগোনা নয়। প্রতিমার আকর্ষণ বড় না ঢাকীর; পুজাঙ্গনের ধ্যানগম্ভীর পূত-সৌম্য সৌন্দর্যের টান বেশী না সুবিস্তৃত জলসান্নিধ্যের; প্রসাদ বিতরণ কেন্দ্রের রসনাতৃপ্তিকারী বাসনা না বাইরের অপার স্বাধীনতা উপভোগের তা আমার সেই সময়ের বালক মনের বিশ্লেষণের বাইরেই ছিল। জলে অবগাহন স্নান করে যে আনন্দ পেতাম যে অভিজ্ঞতা হত, শুধু মনে পড়ে যেন উৎসবের

গভীর প্রশান্তির মধ্যে কিছুদিন চলত আমাদের সেই অফুরন্ত, বাধাহীন অন্তহীন অবগাহন। আমরা যেন ক্ষুদ্রের বেড়াজাল ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সেই কটা দিন বিরাটের আদিগন্তপ্রসারী নৈকট্যে নোতুন জীবন, নোতুন মূল্য, নোতুন আনন্দ খুঁজে পেতাম। ঘরের মধ্যে থেকেও আমরা বাইরেটাকে সমগ্র করেই পেতাম। ছোট ছোট চাওয়া পাওয়ার আনন্দ বেদনা থেকে আমরা যেন অনেক দূরে অনেক ঊর্ধ্বে পৌঁছে যেতাম যেখানে জীবন অঞ্জলি মাপে, দৈনন্দিনের র‍্যাশানে, আদৌ ক্লিষ্ট পিষ্ট নয়। বাইরের জগৎ আর বিশ্ব যেন আমাদের মনের দ্বারে করাঘাত করে আমাদের হৃদয়কে উৎসবের আনন্দে মুক্তি দিত। আমরা পূর্ণ হয়ে যেতাম। বাঁশীর মতো আমাদের ভেতরে, আমাদের সংকীর্ণ ভেতরটাকে, ধ্বনিময় করে কী যেন এক মহাসংগীতে ব্যঞ্জনাময় করে ফেলত। আমরা সব ভুলে যেতাম। সকলকেই আপন করার জন্যে আমরা আঁকুপাঁকু করতাম। হাতে হাত ধরে মনে মন যোগ করে আমাদের গৃহবলিভুক সম্বৎসরের আটপৌরে আত্মাকে সুরে, ছন্দে, কাব্যে, গানে, চলনে, বলনে, ভাবে-ভালবাসায় 'আকাশই একমাত্র সীমা' করে ফেলতাম।

প্রতিপদের পরে, দিনে দিনে নেদুপালের হাতের যাদু প্রকাশ পেত। প্রত্যেকদিনের সন্ধ্যা থেকে পরের দিনের ভোর কতই না তফাৎ হয়ে উঠতো। রাত্রে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে বিছানায় যেতাম, ভোর হতে না হতেই চোখের কোণ পরিষ্কার করতে করতে উঁকি দিতে দৌড়তাম নেদুপালের সৃষ্টিতে। এক-দুই-তিন-চার করে পঞ্চমীর দিন হঠাৎই যেন মনে হত এই তো দেবী মূর্তি হয়ে গেল। মাথা বসে গেছে, পোশাক-আশাক যথাযথ লেপ্টে গেছে, রঙের প্রলেপ পড়ে গেছে। আর চেনার উপায় নেই সেই খড়ের বান্ডিল, কাঠের কাঠামো আর মাটির প্রলেপকে। কবন্ধ কবন্ধ চেহারাগুলো কবে যে মূর্ত হবে সেই ভেবে ভেবে আমাদের দিন আর রাত কাটত। পঞ্চমীতে আমাদের তৃপ্তি।

ষষ্ঠীর দিন সকাল থেকেই আমাদের ডাক পড়ত। আমরা কৃত কৃতার্থ বোধ করতাম। আঠা তৈরি করা, কাগজ কাটা। কতরকমের নৈপুণ্য প্রকাশ পেত সেই সব লাল নীল হলদে সবুজ কাগজের বিন্যাসে। আমরা সাকরেদ। বড়দের কাজ আর আমাদের উপরের ধাপের তরুণদের দাবড়ানি নির্দেশ উপদেশ মিলে আমরা, একেবারে ছোটরা, সদাসন্ত্রস্ত থাকতাম। ষষ্ঠীর রাত্রে

আমাদের অনেক কাজ। সাজ সজ্জার ব্যবস্থা। একদিকে নেদু পাল তার সৃষ্টিকে 'প্রতিমা'য় রূপান্তরিত করতে নিমগ্ন। অন্যদিকে বড়দের তত্ত্বাবধানে আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর সাজ সজ্জায় নিবেদিত প্রাণ। অতবড় ঠাকুর দালান। তাকে সাজানো গোছানো কি একটুখানি কাজ? তাই দেখতে দেখতে রাত বেড়ে যায়, কাজের কোনও শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। তার মধ্যে মধ্যে বড়দের আনাগোনা, মন্তব্য, সাবাশ দেওয়া, সমালোচনা এবং হাত চালাতে বলে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে অন্যত্র কদ্দূর কি হল তার তদারকি করতে ছুটোছুটি করা। এই অফুরন্ত কর্মযজ্ঞের মাঝখানটিতে প্রবেশ করতে পারাটা যে আমাদের কাছে কতখানি ছিল তা এখন বলে বোঝানো যাবে না।

ঠাকুর দালান ছাড়াও ছিল আর একটা বড় কাজ। সেখানেও ছুটোছুটির কমতি ছিল না। প্রসাদ বিতরণের ঘরটিকে পরিপাটি করে যোগ্য করে তোলা। ঠাকুর দালানের দিকে মুখ করে উঠোনে দাঁড়ালে ডানদিকে পরপর চার পাঁচটি কক্ষ যুক্ত একটা লম্বা ঘর ছিল। তার বাইরের দিকের শেষপ্রান্তে স্থান হত ঢাকীদের। ওরা পঞ্চমীর বিকেলে অথবা ষষ্ঠীর সকালেই এসে পড়তো। অনেক দূর থেকে ওদের ঢাকের গুরু গুরু টিরিং টিরিং আওয়াজ মাঠের উপর দিয়ে আবছা আবছা ভেসে আসত। আর সেই শব্দ কানে গেলেই আমাদের মনে পেখম তুলে আনন্দের রিনি রিনি বোল উঠে আসতো। ছুট্‌তাম। উঠোনের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত একদৌড়ে ছুটে গিয়ে কে আগে দেখতে পায় তার অপেক্ষায় উত্তেজিত এপাশ ওপাশ করতাম।

শেষ-মেশ ওরা এসেই পড়ত। হাঁড়ি কড়াইয়ের বোঝাটা নামিয়ে রেখেই সুরু হয়ে যেতো ওদের উঠোন পরিক্রমা। আর দল বেঁধে ওদের পেছন পেছন আমাদের সারিবদ্ধ চলন। এই অনুসরণে গ্রাম শহরের ভেদ থাকত না। চারখানা উঠোন ক্রমান্বয়ে ঢাক-চারনা করতে করতে ওরা যখন অন্দরমহল পর্যন্ত ওদের আগমনের এবং শারদবোধনের উপক্রমনিকাটি সমাপন করত তখন আমরা আনন্দের ভুরিভোজে আবার ফিরে আসতাম সেই পুজা মন্ডপের মধ্যে। কান বন্ধ করে আর খুলে, খুলে আর বন্ধ করে যারা ঢাকের বাদ্য শোনে নি তারা কোনও আনন্দই করে নি ছোটবেলায়!

পুজা মন্ডপের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁদিকেও এক সারি ঘর ছিল। তাদের মধ্যে দক্ষিণ দিকের পরপর তিনখানা মতো ঘর একলপ্তে সটান চৌকি

পাতা ফরাশ পাতা বৈঠকখানা ছিল। অতিথি অভ্যাগতদের বসার জন্য ব্যবস্থা ছিল সেখানেই। ঐ একটা এলাকা ছিল যেখানে ভারী ভারী লোকেদের বিষম বিষম আনাগোনা চলত। তাই ওটায় আমরা পারতপক্ষে ঢুকতাম না। এড়িয়ে যেতাম।

ষষ্ঠীব দিন সকাল থেকেই আমাদের মনোযোগ বারে বারেই ব্যহত হতে থাকত। নেদুপাল প্রতিমায় শেষ টান দিচ্ছে। চক্ষুদানও হয়ে যাবে। গর্জন তেল, শাড়ি-গয়না, অস্ত্র-শস্ত্র, চুল-আঁচল সব, সব টায় টায় ঠিক আছে কিনা তা দেখবে আর বার বাব দূরে গিযে শান্ত সমাহিত চোখে তাকিয়ে থাকবে প্রতিমার দিকে। আমরা কাগজ আঠা ফুল লতা পাতার শেষ সৌন্দর্য বর্ধক উপচারে দেবীকে এবং আমাদের সন্তোষ সাধনে ব্যাপৃত থাকব। আর ফাঁকে ফাঁকেই মচ্ মচ্ জুতোব, মড় মড় শাড়ির সদ্য নড়া চড়ায় উৎকর্ণ হয়ে কার কি হল, কাকে কেমন দেখাচ্ছে সেই সব পর্যবেক্ষণ করতে থাকব। গ্রামের আমরা নিকট বাজারের, খুব জোর কাশিয়ানী বাজারের, পোষাক আষাক পরতে পাবব, আর কলকাতার ওরা যখন রঙ বেরঙের ফুলের মতো সেজেগুজে বাইরে আসবে তখন ওদের চোখের ঝিলিক, মুখের হাসি আর চলনের ছন্দ আমাদের মাতোয়ারা করে দেবে। আমাদের ঈর্ষা হত নিজেদের মধ্যে। যত দুঃখ, যত কষ্ট, মধু বিধু দুই ভাই-এর মতো, অনেক আগেই শেষ হয়ে যেতো। আসলে কলকাতার ওদের সংগে গ্রামের আমাদের হিংসার বোধটাই জন্মাতে পারতো না। সমশ্রেণীরই তো নই আমবা ! ওদের আমরা অনেক আগে থেকেই ভালবাসতাম, অনেক শুনে শুনে উচ্চাসনেই বসিয়ে রাখতাম। তাই ওদের দেখলে ভালই লাগত। মাৎসর্যের বিষ দাঁত কখনই মনের দেহে বসতে পারত না !

ঘুমে যখন আর চোখ খুলে রাখা সম্ভব ছিল না, ষষ্ঠীর সেই বেশী রাত্রে আমরা মায়ের হাত ছাড়িয়ে চোখের জলে কাগজ ভিজিয়ে আমাদের অপেক্ষাকে আরও দীর্ঘ করে ফেলতাম। বড়রা আসছেন যাচ্ছেন। 'বাঃ বেশ ভাল হচ্ছে', বলে বাহবা দিতেন আর আমরাও উদ্ভাসিত বোধ করতাম। নেশা, প্রচণ্ড নেশায় আমরা আরক্ত চক্ষু জাগরণ ক্লান্ত ছোটরাও সেই সামগ্রিক নেশায় ভাগ বসাতে রাত্রিকে আরও গভীরে নিয়ে যেতাম। সেই অধিক রাত পর্যন্তও ঢাকীদের সঙ্গ দান অনবরত চলতে থাকত। ওদেরও যেন ঠাকুর বাড়িতে এসে নেশা ধরে যেতো। একমাত্র খাবার সময় ছাড়া ওদের বাজনা চলত ঝলকে ঝলকে,

খেপে-খেপে। থামতে না বললে ওরা ক্লান্তিহীন বাজিয়েই যেতো। নানান ঢং-এ, ছন্দে আর মাত্রায় বাজনা চলতেই থাকত। মাঝে মাঝে ফরমায়েশী বাজনাও সুরু হত!

যে পুজামণ্ডপে আমাদের অবাধ গতায়াত এবং উপস্থিতি ছিল আমাদেরই নিয়ন্ত্রণে, সপ্তমীর সকাল থেকেই ভোজবাজির মতো কি-যে হয়ে যেতো কে জানে! আমাদের যাতায়াত হয়ে যেতো নিয়ন্ত্রিত। আমাদেরস্থান সকাল দুপুর সন্ধ্যা প্রসাদবিতরণের খিদ্‌মদ্‌ খাটায় নির্দেশিত হত। পান-সুপারি-চুন, হুঁকো-তামাক-টিকে, জলের মটকা এবং মাটির গ্লাস! এই সব একটি ঘরে। প্রসাদ-ঘরের পাশেই। সেখানে অবাধ স্বাধীনতা, প্রসাদঘরে মুড়ি, মুড়কি, খই, খই এর মুড়কি, নাড়ু আর থাকত প্রচুর কলাপাতা টুকরো টুকরো করে কাটা। সেই কলাপাতায় প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা। আর পাশেই নেশার সরঞ্জাম। বিড়ি সিগারেট আমাদের আওতায় থাকত না। কেউ চাইলেই আমরা আমাদের সেনাপতির কাছে ছুটতাম। [এ সব সহজ দাহ্য, দ্রুত নিঃশেষিতব্য দ্রব্য দিয়ে বোধহয় আমাদের পদক্ষেপকে টলমল করে দেবার বাসনা বড়দের ছিল না!]

মহাসপ্তমীতে যে আনন্দের হাট বসে যেতো তা সদাসর্বদা গুরু গুরু করতে করতে রোজ একবার করে সন্ধ্যারতির ঝালায় পেঁছে যেতো। সপ্তমীর রাতে যে আরতি আর মহাষ্টমীর রাতে যে আরতি হত তাতে অনেক তফাৎ দেখতাম! মহাসপ্তমীতে ভীড় থাকত, গোটা উঠোনটাই ভরে যেতো, মণ্ডপের লম্বাবারান্দার দুটো প্রান্ত মহিলাঠাসা হয়ে যেতো। কিন্তু তবুও 'ফার্স্ট ডিভিশন প্লেয়াররা' কেউই ধুনচি হাতে তুলতেন না। আশেপাশেই থাকতেন, ছোটদের বাহবা দিতেন, হাত ধরে দু'একটা কায়দা, কবজির মোচড় দেখিয়ে দিতেন। ঢাকের দ্রিম্‌ দ্রিম্‌ আর কুরু কুরু কুড়্‌ সমানে মনে দোলা দিতে থাকত।

মহাষ্টমী তো মহা অষ্টমীই হয়ে উঠতো। সন্ধ্যা থেকেই ভীড়। ভীড় আর ভীড়। ঢাকীদের আগুন জ্বালানোর জায়গাটাও সেদিন ভরাট করে দিতে হত। জানালায় মুখের মিছিল, দরজায় ঠাসাঠাসি মুখ গুলো যেন খাঁচা থেকে বার করা। পেছনের লাইনে বৈঠকখানার বেঞ্চগুলো বার করে দেওয়া হয়ে গেছে। প্রসাদ বিতরণ কেন্দ্র বন্ধ করে দিতে হয়েছে। পানসুপারি তামাকের

ব্যবস্থা আপাতত বন্ধ। গ্রাহক নেই। সকলের চোখ মণ্ডপের সামনে স্বল্প স্থানে নিবদ্ধ।

সাতটা নাগাদ সুরু হয়ে চলবে রাত পর্যন্ত। বড়দের অনুষ্ঠান। মহাষ্টমীর দিন তাই কিছু চেয়াবেব ব্যবস্থাও হবে। একচালা ঠাকুরের পাশে দুদিকেই প্রায় দশফুট মতো যে স্থানটুকু আছে আজ সেখানটাও পরিষ্কার করে সব উপচার ঠাকুরের কাঠামোর পেছনে চলে গেছে। মহিলারা আজ তাই গ্যালারি করে বসেছেন। বাড়ির বড়বা, তাঁদের বন্ধুবান্ধবরা আজ আরতি করবেন। প্রতিযোগিতা হবে সব শেষের ঘন্টা খানেক মতো। শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতির জন্যে।

ঢাকীরা সেজেছে রঙ্ বেবঙের জামা কাপড়ে। ঢাকে পালক রঙের পেখম তুলেছে। ঢাকের গায়েও ওড়না চড়েছে। টান্ টান্ ঢাক, টন্ টন্ কবে আওয়াজ তুলছে। ঢাকীদেব চুলের বাহার পাল্লা দিচ্ছে পালকের সজ্জার সঙ্গে। গোল আরতির জায়গায় ঢাকীরা বাঘের মতো চলেফিরে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ঢাককে যেন মনের মতো করে প্রকাশে উত্তেজিত করে তুলছে। আবহ তৈরি হচ্ছে। ভেতর বাড়িতে চাঞ্চল্য। দেরি হয়ে গেল বোধহয়! অনেকের দেরি হয়েই যায়। অনেক আগে থেকে আমরা জায়গা দখল করেছি। কিন্তু মনের মতো দর্শক শ্রোতা আসে নি বলে জ্বালায় জ্বলছি। বার বারই তাই ভিতরে যাচ্ছি আর মাকে, মাসিকে, দিদিকে ডাকছি। পরে এলে বসার জায়গা পাওয়া যাবে না!

ঢাক থামল। পরিষ্কার ইঙ্গিত। উদ্বোধন হবে। একজন প্রবেশ করলেন। টান্ টান্ শরীর, চোখে মুখে দৃঢ়তার ছাপ পরিষ্কার। ধুনচি সাজানই রয়েছে। তাতে আগুন দেওয়া হয়ে গেছে। ধুনো ছিটিয়ে দেওয়া হল। গল্ গল্ করে ধোঁয়া ঊর্ধ্বআকাশের দিকে পাক্ খেতে খেতে কি জানি কি ঘোষণা নিয়ে উঠে যেতে লাগল। আরতি-নর্তক হাঁটুগেড়ে প্রথম ঋজু বসলেন। করজোড়ে দেবী-দৃষ্টি হলেন। পরক্ষণেই অনুভূমিক প্রণাম। দীর্ঘ অবস্থান। চারপাশে, শতলোকের উপস্থিতিতে, নীরবতা একমেবাদ্বিতীয়ম রাজত্ব করছে, ঢাকী থেকে দর্শক, অভ্যাগত থেকে রবাহূত, সকলেই ঘটমান বর্তমান আর আশু ভবিষ্যতের দিকে মৌন দৃষ্টি।

প্রণাম শেষে দুটি হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বজ্রমুষ্টিতে ধুনচি ধারণ।

ঢাকে কাঠি পড়ল। দীর্ঘ কুরু কুরু কুরু শেষে ঢ্যাং-ঢ্যাং করে সমে ঘা পড়ল। আরতি নৃত্যের সেখানেই সুরু। তার পরে চলবে এই উদ্বোধনী আধঘন্টার আরতিনৃত্য। চলনে ছন্দে মাথার আগুপিছু সঞ্চালনে, শরীরের তীক্ষ্ণ তীর্যক মোচড়ে, হাতের এবং কব্জির পেলব-সর্পিল গতিমাধুর্যে সেই মহাষ্টমীর সন্ধ্যার সুরটি তৈরি হয়ে যাবে। ঢাকীরাও অক্লান্ত শব্দ মাধুর্যে গোটা এলাকাটাকে মাতিয়ে রাখবে। সব চোখগুলো একটা ছোট্ট বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে। কোনও শিশুই কাঁদবে না, কোনও যুবকেরই একটু সরে যাবার প্রয়োজন হবে না এবং সব বয়স্করাই তাঁদের তামাকু সেবন ভুলে যাবেন। আমরা সকলেই পাথর হয়ে যাব।

এক থেকে দুই, দুই থেকে চার জন হবেন। ঢাকীরা নেশাগ্রস্থ হয়ে উঠবে, উপস্থিত জনগোষ্ঠীর শরীরে ছন্দের দোলা ছাড়া আর কোনও চেতনা থাকবে না। যারা পরে এসেছে, পেছনে পড়ে গেছে, তারাও সন্তর্পণে যে যেখানে সম্ভব দাঁড়িয়ে যাবে। মনে হবে ওরা সকলে আকাশের ঘুড়ি বা তারা দেখতে সচেষ্ট। আসলে তা নয় চোখদুটিকে যথাসম্ভব উপরে তুলে নীচের দিকে, সেই ছোট্ট বৃত্তটির দিকে, নিবন্ধ করতেই এই গ্রীবা উত্তোলন চলছে তো চলছেই। শহর নয় গ্রাম। দূর দূর গ্রাম থেকেও লোকজন এসেছেন। কিন্তু তাঁদেরও তাড়া নেই। হাঁটা পথের নিশ্চয়তা তাঁদের অপেক্ষাকে নিরুদ্বেগ করে দেয়। তাছাড়া ক্ষুধা? সে তো প্রসাদের পরিমাণেই শান্ত নিশ্চয়তা পায়। অভ্যস্ত।

আরতি শেষে সকলের ছুটি হয়। সকলেই আলোচনায় উত্তেজিত বোধ করেন। কিন্তু প্রসাদ ব্রিগেডের কাজ তখন সুরু হয় পুরো মাত্রায়। কি আনন্দ, কি আনন্দ সেই গভীর রাতে প্রসাদ বিতরণে! অষ্টমীর রাত্রে ঘুম আসতো না আমাদের! কোথায় পালাতো? ধূপের ধোঁয়ার সঙ্গে সে কি উঠে যেতো? কে জানে!

মহানবমী যেন শীর্ষথেকে অবতরণ। যেন খেলার জিৎ নিশ্চিত হবার পরের বাকী সময়ের খেলা। উত্তেজনা নেই, শিহরণ নেই আকাঙ্খার তীব্রতা নিঃশেষে শেষ হয়ে গেছে যেন। মহানবমীর সকাল সুরু হবে বিলম্বে, বিলম্বিত লয়ে। হচ্ছে হবে করে সকলেই যেন কেমন উদাসীন কর্তব্য বোধে যান্ত্রিক। রোজ যে মধ্য উঠোনে কলাপাতা পেতে সর্বজনীন ভোজের ব্যবস্থা

ছিল সেও যেন নবমীর দিন প্রায় দিনান্তে সমাপন হত। সবই আছে, প্রাণের স্পন্দনটি গত রাতে হারিয়ে গেছে। এখানে ওখানে উঠোনে বৈঠকখানায় দু'চার জন দু' চার জন করে অলস আলোচনায় অকারণ সময় যাপন করছেন। ঘরের মধ্যে, দাওয়ায়, রান্নাঘরের পাশে, মহিলারা যেন 'সব কাজ তো শেষ' মনোভাবটি নিয়ে গল্পেমত্ত। নবমীতে সকলেই যেন গা ছেড়ে দিত। আমাদেরও কোনও উত্তেজনা বোধের ক্ষেত্র থাকত না। এমন কি ঢাকীরাও যেম ঢাকের বাঁধন আলগা করে দিত। আগুন নেই, চামড়াও 'ছ্যাঁকা' যাচ্ছে না! বাজনা আর তেমন করে বাজছে না। চালাচালি করার মতো কোনও খবর না পেয়ে পেয়ে আমরা আমাদের স্থবির স্থবির পা গুলোকে টেনে টেনে এখানে ওখানে ফিরে বেড়াতাম। একটা অসহায় অসহায় ভাব আমাদের পেয়ে বসতো।

মহানবমীতেও বাইরের অনেক লোকজন আসতেন। কিন্তু সে এতো দেরিতে দেরিতে যে আমরা প্রসাদবিতরণ কেন্দ্রে কোনও কাজ খুঁজে পেতাম না। পুজোর ক'টা দিনের ঠিক মধ্যিখানে মহা অষ্টমী এসে পড়ে মহানবমীকে শুধু মাত্র নবমীতে পর্যবসিত করে দিতো। আমাদের বালক মনে এটা একটা বেদনা-বেদনা বোধ নিয়ে আসতো। পুজোর দীর্ঘদিনব্যাপী অপেক্ষা যেন মহাষ্টমীর ঝালাতে এসে মধ্যরাতে সমে পেঁছে যেত। গান ভঙ্গ। আসর শেষ। তাহলে মহানবমী? ওটা যেন পুজোর 'রবিবার'। ছুটি। সব ঢিলা ঢালা। অকাজের দিন?

আর তাই নবমীর দিন থেকেই বিদায়ের সুর টের পেতাম। কে কবে চলে যাবে সে সব কথাবার্তা এই নবমীতেই আমাদের কানে চলে আসতো। কে কোন পথে যাবে, আবার কবে আসবে, কবে কোথায় কার সঙ্গে দেখা হবে, দেখা হবার মতো সামাজিক সংযোগ—বিয়ে পৈতে ইত্যাদি, কবে কোথায় সম্ভবনাময় এরকমের সব ব্যক্তিগত—পরিবারগত টুকি টাকি কথাবার্তাই - যেন নবমীর প্রাপ্য। মহানবমীর রাগ হতেই পারে মহাষ্টমীর উপর। কিন্তু দেখতাম যেন এই নিশ্চেষ্ট কর্মহীন অলস দিনটিই সকলের প্রার্থিত ছিল। সকলে যেন সকলের কাছে এসে যেতো এই দিনটিতে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে।

মহানবমী ঘুমিয়ে পড়তো সব দিনের আগেই। ওর যেন ঘুমও বেশী। সবই যেমন ছিল তেমনই আছে। সেই প্রতিমা, পুরোহিত ঠাকুরের মন্ত্রোচ্চারণ,

আলোর ব্যবস্থা, নৈবেদ্যের ব্যবস্থা সবই তেমনি আছে। তা সত্ত্বেও যেন কি নেই, কি যেন হারিয়ে গেছে। আমাদের চোখের পাতায় স্পষ্ট টের পেতাম। এবং যখন টের পেতাম তখন দশমীর ঊষা পূর্বাচলে উঁকি দিয়ে অনেকটাই প্রত্যক্ষগত হয়েছেন।

প্রতিমা নিরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জনের বিষাদ সুরটি আমাদের ঘিরে ফেলত। নিরঞ্জন বা ভাসানের দিন প্রগাঢ় উত্তেজনা ধাপে ধাপে বেড়ে যেতো। দড়ি-দড়া, চেঁচামেচি-চিৎকার, নির্দেশ-উপদেশ যেন যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নিত। আমরা এক মুহূর্তে অচ্ছুত হয়ে যেতাম। ছোটরা দূরে থাকবে। স্বাভাবিক, কিন্তু ছোটদের কি মনের ইচ্ছেটাও ছোট? তাদের দুঃখ তাদের প্রাণচাঞ্চল্য? বড়রা তা বুঝতো না, তাদের বোঝার মতো অবকাশও হয়তো ছিল না। পুকুর ঘাটে নৌকো জোড়া হচ্ছে, ঘাটের অবতরণকে দুর্ঘটনা মুক্ত করাব সকল চেষ্টা চলছে, সন্ধ্যেয় দলেদলে মহিলারা প্রতিমাকে সিঁদুর পরাচ্ছে, মুখে পান গুঁজে দিচ্ছে। কুলোয়-প্রদীপে, ধূপ-ধুনোয় আরতি করছে। আশেপাশে তিলধারণের স্থান নেই। আমরা মাখনে ছুরি হয়ে সেই মা-মাসিদের ফাঁকে ফোঁকরে ঢুকে পড়ছি। উদ্দেশ্য প্রতিমার মুখের প্রসাদ, মিষ্টি, নাড়ু। কী অপূর্ব স্বাদ সেই প্রসাদের এবং তৎসহ মা-মাসি-পিসিদের অনর্গল চিৎকৃত-বকুনি-ধমকানিতে! প্রতিমাব কাঠামোর পিছনে কোথায় সন্দেশের মোড়ক নাড়ুর হাঁড়ি লুকোনো আছে তা আমাদের শ্যেন দৃষ্টিতে 'এক্সরে' ছবি হয়ে থাকতো। যে আগে পারে সেই পারে! নীতিটি পরিষ্কার। কিন্তু তার প্রয়োগে যে কৌশল এবং তৎপরতার প্রয়োজন সে সকলে সম্ভব নয়। একটা 'হাফ্ চান্স' কেও 'পরিপূর্ণ' প্রাপ্তিতে উন্নীত করা ছিল আমার দীর্ঘ অনুশীলন লব্ধ অর্জন। তাই অনেকেই, অনেক সমবয়সীই, সেই সন্ধ্যায় আমার গতিবিধির প্রতি হাপুস অপেক্ষা করতো। তাদের একেবারেই যে বঞ্চিত করেছি তা নয়, তবে সকলের সব আশা তো ভগবানও মেটাতে পারেন না!

ঠাকুর দেবমন্দির থেকে চলে যাবার পর একটা হাহাকার পড়ে থাকতো সেই সুপরিসর ঘরে। দেয়ালগুলো যেন নিঃস্বরিক্ত মেঝের দিকে নিষ্পলক চেয়ে-চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলত। পুরোহিত ঠাকুরের কাজ ফুরোলে করিৎকর্মা নন্দমামা বা হাজুকাকার কাজ সুরু হত। একটু বড় হতে হতেই বুঝে গেছি যে ওদের এই ভাঙাহাটের কেন্দ্রটিতে বসে ধ্যানমগ্ন গভীরতায় যে কাজটি করতে হত তা

গুণে এবং পরিমাণে, আকাঙ্ক্ষায় এবং উপলব্ধিতে মহাদেবের আবাহন। অনেক প্রশ্ন করেও যার উত্তর পাই নি, অনেক বিরক্ত করেও যা জানতে পারিনি তা ক্রমশই আমাদেব মনের সামনে হাজির হয়ে পড়েছে। সিদ্ধ হস্তের গুণ না থাকলে যে কাজটি সিদ্ধ হয় না, অনুপুঙ্খ কুশলতায় সেই কাজটি নন্দমামা বা হাজুকাকা দীর্ঘ-প্রযত্নে তৈরি করতেন। 'সিদ্ধি'। একেবারে না-বোঝা থেকে যখন সবেমাত্র আধ-বুঝুনি হয়েছি তখন, একটু গভীর রাত হতে না হতেই, বড়দের সেই শূন্য দেবমন্দির আকর্ষণ দেখে আমাদের ঘুম চলে যেতো। নিরঞ্জন শেষ করে সকলকেই গুটি-গুটি নন্দমামা-হাজুকাকা আকর্ষণ পেয়ে বসত। আমরা অনবরত তাড়া খেতাম, মা-মাসিরা বিছানায় পেড়ে ফেলে ঘুমিয়ে পড়তে বলতেন, কিন্তু 'কি যেন হচ্ছে' 'কি যেন জানা হয়নি'-র সুপ্ত আকর্ষণ আমাদের সুযোগ সন্ধানী করে তুলতো। আমাদের চোখে অবশ্যই 'বেড়ালের অপকর্ম'' প্রভাব! নারী-পুরুষ নির্বিশেষেই সকলেব মন চেতনা দৃষ্টি সেই সিদ্ধি-প্রাপ্ত সিদ্ধাবস্থা-আচরণেব দিকেই নিবদ্ধ! আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে পৌঁছে যেতাম সেই সব ব্যক্তি-কেন্দ্র গুলোব দিকে যাবা অব্যবস্থিত আচরণে আমাদের, এবং সকলকেই, আকর্ষণ করত। কাকে ধবেছে আর কাকে ধরেনি এই ছিল সেই রাতের প্রতিমুহূর্তের বুলেটিন। একটা সময় এসে যেতো, খুবই দ্রুত, যখন ছোট-বড়ব, মা-মাসিব, জ্যাঠা-খুড়োর, অন্তর বিলীন হয়ে যেতো। যাদের বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে বেখে এসেছে তারাই তখন 'বুলেটিন' প্রচারের একমাত্র মাধ্যম! সারা গৃহে আনন্দের, উচ্চহাস্যের, মজা-মসকবার, গায়ে-গা ঢলে পড়ার প্রতিযোগিতা চলছে, আমরা চরকি-বাজি ঘুরে বেড়াচ্ছি, খবর ছড়াচ্ছি আর সকলে দলে-দলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নেশাগ্রস্থ-নাটকীয়তার প্রকাশ দেখতে ছুটছে। বাড়িটা যদি নৌকো হত তাহলে দলবদ্ধ ভীড়ের পার্শ্বপরিবর্তনে টাল সামলাতে না পেরে ডুবে যেতো!

এই সব দিন-রাত্রিগুলো ভোলার নয়। তবুও কোথায় যেন হারিয়ে গেছে তারা। এবং সেই সময়টাও যেমন হারিয়ে গেছে তেমনি সেই আনন্দগুলোও মুছে গেছে আমাদের গৃহ থেকে, পরিবেশ থেকে, জীবন থেকে। সারা বাড়ির লোকদের আনন্দ দেবার জন্যে বিন্দুমাত্র নেশা না করেও হাজুকাকা উঠোনের প্রান্তে দাওয়ার পাশে শুয়ে পড়েছেন আর তৈরি করে অসংলগ্ন কথা বলছেন! হরেনকাকা, অত্যন্ত রাশভারী ব্যক্তিত্ব, চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন যেন একেবারে

ছেলেমানুষ, যেখানে যেকথা সর্বৈব অনাকাঙ্ক্ষিত সেখানে অবলীলায় সেই 'ডায়ালগ' দিচ্ছেন, নন্দমামা কলাপাতায় গোবর 'বেড়ে' নিয়ে আসন করে বসে সিদ্ধ-যোগীব মতো প্রথমে ঈশ্বরকে উৎসর্গ করতে অনারব্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছেন। এবং আরও কতো-শত ঘটনা-দৃশ্য-আচরণ। শেষ করা যায় না। এবং সেই সব নিয়ে এঘর-ওঘরে, এখানে ওখানে আলোচনা-ব্যাখ্যা-অনুসন্ধান। আমাদের কাজের শেষ নেই। সোজাসুজি খবর সংগ্রহ করা থেকে 'স্কুপ' পর্যন্ত, সাদামাঠা দৃশ্যবর্ণনা থেকে গোপন তথ্য উদ্ঘাটন। সব, সব। এবং দ্রুত সে সব খবর যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া। তার পরে একসময় নিজেরা সিদ্ধিতে না হলেও ক্লান্তিতে অবসন্ন ঘুমিয়ে পড়েছি।

পরদিন জেগে উঠেছি যে কোনও দিনের মতো। কিন্তু পূর্বরাত্রের সব ঘটনা যেন মরীচিকার মতো হারিয়ে যেতো। শুধুই কি কল্পনা ?

দেবী দুর্গা যেমন সকলকেই কাছে টেনে আনতেন, ঘর এবং বাইরের জগতের মধ্যে একটা মিলনের সেতুবন্ধ তৈরি করতেন, দেবী কালিকা কিন্তু তেমন ছিলেন না। দুর্গা যদি আমাদের মিলনে বিশিষ্ট করতেন, কালী তাহলে বিশ্লিষ্ট করে দিতেন। মহামায়া মায়ার বাঁধনে নিকট করে দিতেন সকল দূরত্বকে, করালবদনী তেমনি একটা করাল ভয়াবহতাকে টেনে এনে নিকটকেই দূর করে দিতেন। স্বল্পদিনের ব্যবধানে এই দুই দেবীর আগমন। কী বিপরীত স্বভাবে আমাদের সমাজজীবনকে যে এঁরা প্রভাবিত করতেন তা বলে বোঝানো দায়।

বহুগ্রামের মধ্যে দুর্গাপূজো হত আমাদের বাড়িতে। তাদের সকলেরই প্রতি একটা ব্যক্ত-অব্যক্ত নিমন্ত্রণ ছিল সেই পূজো অঙ্গনে। মা যেমন সকলের, পূজোটাও ছিল তেমন সকলেরই। তাই বলেছি এক ঠাঁই হয়ে যেন বিশ্বচরাচর আনাগোনা করতো দেবীর চারপাশে। বিভেদ-বৈপরীত্য, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, মনান্তর -মতান্তরের যেন কোনও ছায়াই ছিল না সেই শরৎ আকাশের উৎস-নীলে। সকলের মনেই নীলের ছোঁয়া, সকলের আসা-যাওয়া, ভাবভালবাসা, আদান প্রদান ছিল সাদা-সাদা অমলিন ভাসমান উজ্জ্বল শুভ্র-মেঘখণ্ডগুলোর মতোই স্বাভাবিক।

কিন্তু অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রে কালীপুজোর ব্যবস্থা হত অনেক বাড়িতেই, মানুষের মনের অন্ধকার-অন্ধকার ঈর্ষা-দ্বেষ-দ্বন্দ্বগুলো যেন ছাড়া

পেয়ে যেতো সেই নিকষ-নিশি পুজোকে কেন্দ্র করে। ক'টি দিনের ব্যবধানে কেমন করে মানুষ নিজেকে গুহাবাসী করে ফেলতো কেজানে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা; দেখিয়ে দেবার বাসনা। কে বড়, কে প্রধান; কার পুজো আগে, কার পরে; কার প্রতিমা প্রথম নিরঞ্জন হবে আর কার পরে। কত সমস্যা, কতো জেদ, কতোই অহং এই কালীপুজোকে কেন্দ্র করে মাথা চাড়া দিত।

চক্রবর্তীরা এককালের জমিদার। তাদের পূর্বপুরুষরা প্রথম নিরঞ্জন করত। পরে অন্য সকলে। সরখেলরা সম্পন্ন পরিবার, জনসংখ্যা বেশী এবং জনবলও। সুতরাং সুরু হয় রেষারেষি, জেদাজেদি এবং মারদাঙ্গা। ভট্টাচার্যরা সম্পন্ন এবং শিক্ষায়-জ্ঞানে, মর্যাদায়-প্রতিষ্ঠায় দূরদূরান্ত স্বীকৃত, কিন্তু চক্রবর্তীদের সংস্কার? তাই বিভেদ-বিতন্ডা এবং দ্বন্দ্ব। বাবা বলতেন কি এসে যায় আগে-পবের বিসর্জনে? অনেক পরে জেনেছি কলম্বাস বলতেন ডিনার টেবিলের শীর্ষে বসা কাঙ্ক্ষিত অনেকের কাছেই কিন্তু যেখানেই "আমি বসি সেটাইতো কেন্দ্র-শীর্ষ হয়ে ওঠে।" মাথায় পেটে ল্যাজে বসাটা কোনও হেরফের করে না তো! কিন্তু সাত্ত্বিক কথার প্রতিবাদ আসে হরেনকাকার তামসিক আত্মাভিমান থেকে। কেন হবে? ভট্টাচার্যদের প্রতিমা কেন আগেই নিরঞ্জন হতে পারবে না? সুতরাং তাই হয়। রক্তপায়ী দেবীর আরাধনায়ও যেমন রক্তের প্রয়োজন তাঁর নিরঞ্জনেও তেমনি রক্তের অঞ্জলিব ব্যবস্থা হয়।

পরে শুনেছি অনেক আলোচনায় অনেক অনুধ্যানে, দুর্গাপুজায় যেমন কালীপুজোতেও তেমনি রক্ত-অঞ্জলির ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছিল। সাত্ত্বিক চেতনার প্রতিষ্ঠার মূলে নাকি বাবাব চেষ্টা অনেকখানি অবদান রেখেছিল।

এখনও দেখি দুর্গাপুজোয় আনন্দের হাট, মিলনের ধ্বনি, ঘর টানে বাইরেটাকে বাইরেটাও যেন আকর্ষণ করে ঘরকে। কিন্তু কালীপুজোর বর্ণ আলাদা, ধ্বনি আলাদা, ছন্দ আলাদা। ভয়াল সুরটাই প্রধান, ছন্দপতনই বৈশিষ্ট। কালীপুজোর কুশীলবরা, 'পুরোহিত'-রা এবং ভগীরথরাও তাই স্বতন্ত্র মেরুর। দেবী ও দেবীভক্তদের মধ্যে মন চলে যতটা পান চলে তার শতগুন! দেবীর রক্তচক্ষুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভক্তজনের চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। রক্ত চাই, রক্ত চাই। অর্থের, অহং-এর, দম্ভের রক্ত, তার সংগে যোগ হয় সামাজিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-রক্ত! অনিবার্য পরিণতি।

একটু একটু বড় হয়েছি। অন্যে সে কথা স্বীকার না করলেও নিজে নিজে বেশ বুঝতে পারি। কালীপুজো আমার ভালো লাগে না। বিশেষ করে বাড়িতে, বাড়ির গ্রামে। তাই একবার চলে গেলাম মামাবাড়ি। মামাবাড়িটা আমাদের ছিল 'ছড়া'-টার উল্টো। মামী কখনও ঠেঙার বাড়ি তো দেনই নি, কখনও বেত্র হস্তেও মামীকে দেখিনি। যথেষ্ট আদর করতেন, কাছে টেনে নিতেন এবং মামার তির্যক-দৃষ্টির আক্রমণ-আঘাত থেকে আঁচল দিয়েই সর্বক্ষণ আড়াল করে রাখতেন। আমার মামা ছিলেন হোমিওপ্যাথির ডাক্তার। আর আমার বয়স যখন ছোট্ট-ছোট্ট সেই সব স্বর্গীয় শিশির ব্যাকুলতায় সদাই বিবশ, সেই তখন থেকেই আমাতে-মামাতে বিসংবাদ! আমি শিশি চাই, শিশিব মূল্য আমার কাছে প্রাণাধিক! শিশির ভেতরটা আমার কাছে অর্থহীন, খোসাটাই যাবতীয় মূল্য ধরে; ওদিকে মামার একেবারে উল্টো, ভেতরেই নাকি সর্বমূল্য, বাইরেটা অনুসর্গমাত্র! তাই যখন টের পেলাম মামার উদ্দেশ্য শিশির গর্ভমধ্যস্থ বস্তুসমূহ তখনই সমাধান সহজ হয়ে গেল। কাগজের ঠোঙায় ওষুধগুলো ঢেলে-মুড়ে রেখে শিশি হস্তগত কর। মামা এই সমাধানে সর্বনাশ দেখতে পেলেন আর আমি সহজেই বুঝে গেলাম যে মামা আসলে আমাকে দেখতেই পারেন না! এবং এই মামা যে বেত্র হস্ত হবেন, পক্ষান্তরে ঠেঙা-হাতে তেড়ে আসবেন তাতে আমার কোনও সন্দেহই ছিল না। মাঝখান থেকে যে ব্যক্তি 'ছড়া'-টি তৈরি করেছিলেন তাঁর প্রতিও আমার সেই খুব ছোটবেলা থেকেই অশ্রদ্ধা তৈরি হয়ে গেছিল।

এবারে এই কালীপুজোয় মামার পাশে পাশে থেকে মামাকে অন্য রকম দেখতে পেলাম। তিনি যে 'সেলফিস্-জায়ান্ট' নন তা বুঝতে পারলাম উপস্থিতির প্রথম সকালেই। একবাক্স ছোট-বড় শিশি আমাকে দিয়ে মামা জানালেন যে সেগুলো আমার জন্যেই নাকি তিনি গুছিয়ে রেখেছিলেন। ওষুধ ভরা শিশিগুলোকে হাত না দিতে বলে দিলেন। অবশ্য তখন আমার শিশির প্রতি টান যে একেবারেই নেই তা মামা বুঝে উঠতে পারেন নি! সেগুলো আমি আমার ছোটদের দিয়ে একটা অসীম বদান্য-ভাব চোখেমুখে ফুটিয়ে তুলেছিলাম। সেই বারেই আমি বড়-হয়ে-যাওয়ার স্বীকৃতি প্রথম পেলাম মামার কাছে। পতাকীদার কাছে। পতাকীদা আমার মামাতো দাদা। আমার থেকে অনেক বড়। তাই দাদার নৈকট্য আগে কখনও পাই নি, শাসনটাই

জুটেছে। পতাকীদাব তখন বিয়ে হয়ে গেছে। ঘর-দুয়াব খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অন্যান্যকাজের মধ্যে পতাকীদা একটা মুদির দোকানও চালাতেন। সকাল-সন্ধ্যা। আমার ছিল ইঁদুর স্বভাব। তাই পতাকীদাকে অনেক কষ্টে-যত্নে, দূরদর্শিতায় এটা ওটার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হত। তাছাড়াও টুকিটাকি যান্ত্রিক বিষয়েও পতাকীদার আগ্রহ ছিল। সাকরে হিসেবে আমি যোগ্য এবং আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও পতাকীদার কাছে কোনও পাত্তা পেতাম না। আমাকে তিনি ধ্বংস-যোগ্যতা এবং নষ্টক্ষমতার প্রতিভূ বলে মনে করতেন! অসীম লোভ ছিল তাঁর পুরনো ঘড়ি, কলম পেন্সিলের বাক্সের দিকে। তিনি সে সব জোগাড় করতেন সারাই করার জন্যে আর আমার চোখ এবং লোভ ছিল সেগুলো সরিয়ে আনার জন্যে। কি আছে ওগুলোর মধ্যে তা দেখাব অদম্য আগ্রহই ছিল সেই অপহরণ বাসনার প্রেবণাশক্তি! কিন্তু শিশিতে ঘড়িতে চক্‌চকে চোখ রেখে আমার শুধু লাভ হয়েছিল দুর্নাম।

এ-বারে এই দুর্নাম কেটে গেল। মামাকে যেমন কাছে পেলাম, তেমনি নৈকট্য পেলাম পতাকীদার। কী মধুর লেগেছিল এবাবের এই অবস্থান। নিজেকেই যেন নোতুন করে আবিষ্কার করেছিলাম। সব থেকে খুশি হয়ে ছিলেন আমার মামী। আবার অন্যদিকে বৌদির স্বাদও সেই প্রথম পেয়েছিলাম। (আমার বাড়ীতেও এক বৌদি আছেন, মানে ছিলেন। তিনি তো পিসির মতো বৌদি! স্নেহ নয়, আদর নয়, ভালবাসা নয়। অভিযোগ আর শাসন ছিল তাঁব প্রধান অস্ত্র। তাঁর তৃতীয় সন্তান আমার থেকে এক বছরের মতো বড় ছিল! তাঁর কথা, সেই কথা, বারান্তরে হবে)। বড় হতে হতে যে দু'চারটি সবুজ পাতা আমার মনের বৃন্তে নিজেদের উন্মুক্ত করছিল সেই কিশলয়ে বৌদির চিন্তা ভাবনা ভালবাসার ব্যজন তাদের ক্রমশ সবুজতর করে তুলছিল, অনেক দূরে কিন্তু একটা অন্য জগৎ দেখা যায় দেখা যায় করে মাঝে মাঝেই উঁকিঝুঁকি দিত। কুয়াশা-কুয়াশা ভোর-ভোর আকাশের আলোয় যেমন দেখায় দূরের গ্রাম, দূরের গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি, লোকজন! দেখিদেখি করেও দেখি না, বুঝি-বুঝি করেও বুঝি না। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় কিন্তু ধরা দেয় না। একটা বিরাট জগৎ তার আগমন বার্তা পাঠায় প্রথম শীতের হিমেল-হিমেল পরশে।

সেই শীত-শীত সকাল বেলায় একঝলক তাজা সোনাঝরা রোদের উষ্ণতায়

প্রথম জেনেছিলাম নয়নতারাকে। কে যে তার নাম নয়নতারা রেখেছিল তা আমার জানা নেই। কিন্তু তার বাবা, দাদামশাই বা ঠাকুরদা যে রাখেন নি তা আমি এখন হলফ্ করেই বলতে পারি। মনে হয় তার বয়োতারুণ্যে ঝকঝকে ঠাকুমা রেখে থাকবেন। এই ভদ্রমহিলা সেই বার্ধক্যেও যে কী প্রচন্ড আকর্ষণ শক্তির অধিকারিণী ছিলেন তা বিষ্ময়ের বিষয়। আমার মা' তো মামাবাড়ি গেলেই তাঁর এই মাসির সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়তেন। আমরা যে আমরা, কুঁচো কাঁচা ছোটখাটো পায়ে সরষে বাঁধা ছেলেমেয়েরা, আমরাও দিদিমা বলতে অজ্ঞান ছিলাম। যাদু ছিল তাঁর কথায় বার্তায়, আদরে আপ্যায়নে, গল্পবলায় আর কন্ঠ সুধায়। কেমন যেন অনায়াসেই এক লহমায় আপন করে নিতে পারতেন। আর প্রত্যেককেই একটা করে নিজস্ব নামে ডাকতেন। যে কোনও বয়সের যে কোনও ব্যক্তিকে এক পলকেই আপন করে ফেলতেন। কটুকথা বলতে কখনও শুনিনি, কারও বিরুদ্ধে কখনও কোনও নালিশ ছিল না এই দিদিমার। জীবনে যেন সূর্যটাই আছে। দিনেও আছে রাতেও আছে। অন্ধকারটা যেন একটা অপ্রয়োজনীয় অকারণ কল্পনা মাত্র। অস্তিত্বহীন, প্রভাবহীন, প্রতিক্রিয়াহীন। কথা বললে আনন্দ ঝরে, হাসলে তাঁকে তরুণী মনে হয়। কন্ঠের উত্থানপতনে সঙ্গীতের আনাগোনা। তাই মনে হয়েছে অমন কালো মেয়ের নাম নয়নতারা নিশ্চয়ই তিনিই দিয়েছিলেন। যে দূরদর্শিতা, উপলব্ধির আলো, মনের গভীরে থাকলে এমন সার্থক নাম দেওয়া যায় তা এই নির্ঝর ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব।

নয়নতারা ঠিক কালো ছিল না। মেঘবর্ণ। গভীর ব্যঞ্জনার বর্ণ ছিল ওর দেহে। শরীরটা ছিল যেন ধনুকের ছিলা। টান্‌টান্, ঋজু। আমি যখন ইজের থেকে মাঝে মাঝে প্যান্টের সভ্যতায় যাতায়াত করি তখন ওর অনেক ডুরে পাড় শাড়ি পরা হয়ে গেছে। দেশে-গ্রামে সাধারণত একটু সকাল সকালই শাড়ির চল ছিল। সে-সব শাড়ি-পরা মেয়েরা বেশীরভাগই বেশ ঢিলেঢালা আগোছালো শাড়ি পরতো। নয়নতারা প্রথমেই আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল তার প্রতিমা প্রতিমা টান টান শাড়ির বিন্যাসে। কি করে যে ঐ অতবড় শাড়িগুলোকে ওর চারপাশে সৈনিক-সুলভ শৃঙখলে এঁটে রেখে দিত তা এখনকার মেয়েদের, শহুরে মেয়েদের, না দেখলে বুঝতেই পারতাম না। ডুরেই পরুক বা ছাপাই পরুক সব শাড়িই ওর দাসানুদাস হয়ে লেপ্টে থাকত

ওর অঙ্গে। অনুগত ভৃত্য সব। শাড়িতে নয়, নয়নতারা এবারে আমাকে চমকে দিয়েছিল তার দৃষ্টিতে। চোখ যে শুধু দেখার ইন্দ্রিয় অথবা কেবল মাত্র কাজল লেপনের মাধ্যম একথা একেবারেই ঠিক নয়। সে যে একটা ভাষা, একটা গভীর ব্যঞ্জনার ছন্দ, জানা জানানোর নৃত্য গীত তা নয়নতারাব চোখ না দেখলে বিশ্বাসই করা যেতো না। সর্বশরীর যদি একটি তূণ তাহলে সেই তূণের সর্বোত্তম তীরটির নাম আঁখি। নয়নতারার চোখ নৃত্যে-ছন্দে, গীতের গভীর দ্যোতনায় অপরকে কাছেও টানে দূরেও রাখে। তীব্র তীক্ষ্ন সূর্যের জ্যোতি যেন নয়নতারার নীলাভ চোখের পিছন থেকে পরিস্নাত পরিশীলিত হয়ে সামনে পাশে বিচ্ছুরিত হত। এবারে দিদিমার কাছে গিয়ে দিদিমাকে কাছে পেয়েছিলাম যতটা তার চাইতে অনেক বেশী দুরু দুরু শীত-শীত চেতনা নিয়ে ফিরে এসেছি। এবাব নয়নতারাকে দেখেই আমার চোখে ভয়ের ঝাপসা অন্ধকার, কুয়াশা কুয়াশা অজ্ঞাত জগতের ওঠানামার শিরশিরানি পেয়ে বসেছিল। কী ভীষণ সেই চোখ, কী সুন্দর, কী গভীর! আমি তাই বেশীক্ষণ সেখানে থাকিনি।

বলি বলি করেও বৌদিকে বলা হচ্ছিল না। বৌদি ভাবতে পারে আমি ভাল ছেলে না। আমি মেয়েদের চোখ দেখি। চোখের ভাষা বোঝার চেষ্টা করি। এ-সবই তো খারাপ ছেলের লক্ষণ! কিন্তু বয়সের স্বাভাবিক চেতনায় ভালবাসার প্রাকৃতিক নিয়মেই বৌদি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার অস্বস্তির কেন্দ্রটিকে আমার মনের গুহা থেকে বার করে ফেলেছিলেন। আমার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বলা অবিন্যস্ত বিবরণ থেকে নয়নতারার প্রসঙ্গটিকে নিটোল আলাদা করে নিয়ে বৌদি অনেকখানি হেসেছিলেন এক সঙ্গে। লজ্জায়, ভয়ে, নিজের উপর ঘৃনায় আমি দৌড়ে কোথায় চলে গেছিলাম। নিরুদ্দেশ। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মেঠো পথ পার হয়ে ধানক্ষেতের আল বেয়ে বেয়ে অনেক দূরে চলে গেছিলাম। হঠাৎই নজর গেল প্রায় খান্দারপাড়া এসে গেছি। সেই তাল-নারকেলের বাগান মাঝখানে বিরাট দিঘি। সেইখানে অনেক্ষণই বসে কাটিয়ে দিয়েছিলাম। বারবারই নয়নতারার চোখ, সেই চোখের সুদূর গভীর দৃষ্টি, দিদিমার শান্তকন্ঠ আর তার পরেই বৌদির হাসি! তাহলে কি আমি ভাল নই? সত্যিই কি আমি খারাপ হয়ে যাচ্ছি? মা শুনলে কি বলবেন? আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে যখন সেই তালগাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে

ঘুম ঘুম তন্দ্রাচ্ছন্নতার কোলে একটু একটু শান্তি পাচ্ছিলাম তখনই হঠাৎ পত্রাকীদা আমার কাঁধে হাত দিয়ে আদর করে ডাকলেন। সেই সময়ের স্বপ্নে পত্রাকীদার কোনও ভূমিকা ছিল না! কোত্থেকে এলেন? চোখ রগড়ে বুঝতে পারলাম পতাকীদা নয়, বৌদির দূত!

অনেক আদর আর ভালবাসা দিয়ে, গায়ে মাথায় হাতবুলিয়ে দিয়ে বৌদি তাঁর অন্যায়ের জন্যে ক্ষমা চেয়েছিলেন। তাঁর নাকি ওরকম করে হেসে ওঠা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছিল। আর কখনও হবে না। এবারটার মতো তাঁকে মাপ করেই দিতে হবে। ইত্যাদি। ক্রমশ এই বিনয়ী, ক্ষমার্থী বৌদিকেও বুঝতে আমার অসুবিধা হচ্ছিল। আমার চোখ মুখ দেখে বোধহয় বৌদি কিছু বুঝলেন। প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন যে আমি নাকি নয়নতারাকে ঠিকই দেখেছি। ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। সে-কথা নয়নতারাও জানে। তাই ওর মধ্যে একটা স্থির গভীরতা এসেছে। ওর চিন্তায় ভাবনায় একটা ভূমিকম্প চলছে। মেয়েদের এই বয়সে এমন হয়ই। ওরা নাকি সচেতন হয়ে যায় অনেক অনাগত বিষয়ে। তাই সব ওদের চোখে পড়া যায় না বলেই অত দূর দূর মনে হয়।

আমার মনে সহস্র প্রশ্ন একের-পর এক ঢেউ হয়ে আছড়িয়ে পড়ছিল। নয়নতারা আমার থেকে দু'এক বছরের বড়। অনেক ছোটবেলাথেকেই তো একসংগে খেলা করেছি। দিদিমার কোলের ভাগ নিয়ে ঝগড়া করেছি। ডান দিক বাঁদিক নিয়ে ঝগড়া হয়েছে, আড়ি হয়ে গেছে। আবার তো কতো সহজেই মিল হয়ে গেছে। কখনও দিদিমার মধ্যস্থতায়, কখনও কোনও পুতুলের হাত বদলে বা হোমিওপ্যাথিক শিশির লেনদেনে। তখনও তো মাঝে মাঝে নয়নতারা শাড়ি জড়িয়ে বান্ডিলটি হয়ে ঘরসংসারের কর্তৃত্ব করেছে। আমাকে দিয়ে ফুট-ফরমাশ খাটিয়েছে। ঐ যাঃ! এটা হয় নি, ওটা হয় নি করে হাহুতাশ করেছে। আর সেই ভ্রান্তিসমূহের নিরসনের জন্যে অসময়ে আমাকে ছুটোছুটি করতে হয়েছে। তাহলে সেই সহজ মেলামেশা হঠাৎই কেন বন্ধ হয়ে যায়? কেন মেয়েরা হঠাৎ হারিয়ে যায় তাদের স্বভাব থেকে? কেন একদিন তারা পরিচিত জনকে চিনেও চিনতে পারে না? মনে হয় অন্য কোনও গ্রহের প্রাণী! ওরা অন্য কোনও জগতের বাসিন্দা। কেন এমন হয়, কেন?

পরে যেদিন একেবারে একান্তে পেয়ে আমাকে বলেছিল ওর বিয়েতে যেন

আমি অবশ্যই আসি সেদিন আমি আরও বেশী অবাক হয়ে গেছিলাম। আবছা আবছা অন্ধকার। সন্ধ্যে হয় নি, কিন্তু আলোর শেষ রেখাটিও শেষ হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে থেকে প্রদীপ আসছে তুলসীতলায়। সেই সময়ে হঠাৎই পাশ থেকে ও ডেকেছিল ঃ শোন্ কথা আছে। থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। স্থান সময় এবং কণ্ঠস্বব সবই যেন কেমন মন-কেমনকরা গোছের। তখন বলেছিল ঃ আসবি কিন্তু। অন্ধকারেই ঘাড় নেড়ে চলে এসেছিলাম। কি ছিল সেই কথায় যা অন্য সময়ে বলা যেতো না? অনেকবারই তো গেছি দিদিমার ওখানে। ওদের বাড়িব উপর দিয়েও তো কতোবারই যাতায়াত কবেছি। একা অথবা দলবেঁধে। তাহলে?

সেদিন বুঝিনি। বোঝাব মতো মনের অবস্থাটা তৈবি হয় নি। বুঝেছিলাম অনেক পরে। কনকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে। সুন্দবকেও যে কখনও কখনও গোপনীয় হবে প্রকাশ পেতে হয় তা জানতে অনেক সময লেগেছে। মেয়েদের বোধহয় সময় কম লাগে। কে জানে?

———

।। মাঠ ।।

প্রত্যেক কিশোরেরই কিছু নেশা থাকে। কারো গল্প শোনার নেশা, কারো বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলার। কারো জামা-কাপড়ে, কারো বা চকলেট-লজেন্স খাবারে। কারো বই-এ, কারো পুতুলে। কারো নেশা মা'-দিদিমার কোল কারো বা মাঠ-ঘাট-জল-জঙ্গল। কেউ ঘরের কোণে কেউ বাইরের আকাশ-বাতাস প্রকৃতিতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। সকলের ছোটবেলা একরকম নয়, একভাবে কাটে না। প্রত্যেকে যার যার নিজের স্বভাবটি নিয়েই একদিন কৈশোরের বর্ণময় দিগন্তে হাবুডুবু খায় এবং এক সময় নিজের নিজের যৌবনকে আবিষ্কার করে। এই জীবন পরিব্রজ্যায় প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সংগ্রহে জমা হয়। অন্যের কাছে সেই সব বিচিত্র-বিভিন্ন সংগ্রহ একই রকমের মূল্য ধরে না বটে কিন্তু তাতে প্রত্যেকের সংগ্রহের মূল্য তার নিজের নিজের কাছে কিছু মাত্র কমে না।

আমার কিশোর-তরুণ জীবনের সংগ্রহের একটা সিংহভাগ জুড়ে আছে মাঠ। মাঠ আমাকে রাজাও করেছে, ফকিরও করেছে। তাই মাঠের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভোলার নয়। ভুলি নি, ভুলতে পারি নি। এটা যে ভিতরে ভিতরে নেশার পর্যায়ে চলে গেছিল তা প্রৌঢ় বয়সেও প্রমাণ পেয়েছি। মাঠের সবুজ, নিয়ম-চিহ্ন, জীবন্ত আকর্ষণ, বহুদিন, দীর্ঘ মাস-বছর-যুগ পেরিয়েও আমাকে হাতছানি দিয়েছে। আর সেই ডাক কখনই অস্বীকার করতে পারিনি। এমন কি চারদশকের কোঠায় যখন বয়স তখনও। মাঠ এবং খেলা দেখলে কোত্থেকে যে একরাশ তারুণ্য এসে দেহে মনে পেশীতে ছলাৎ-ছলাৎ ঢেউয়ের আঘাত তুলতো তার উৎস, এখন বুঝি, সেই কৈশোরেই উপ্ত ছিল।

শেষ থেকে নয়, প্রথম থেকেই সুরু করা যাক। আমাদের সময়ে কৈশোর বাবা-স্যুট বা টেরি-পোষাকে মোড়া ছিল না। মাপা সময়ে, মাপা দূরত্বে এবং মাপা কথায় বাঁধাও ছিল না। ছিল 'ইজের', নিম্নাঙ্গের জন্যে। ঊর্ধ্বাঙ্গ বিষয়ে কোনও উন্নাসিকতার প্রশ্নই ছিল না। আলোবাতাসের অবাধ আলিঙ্গন ছিল সেখানে নিত্য ; নৈমিত্তিক সময়ে গেঞ্জি বা সার্ট। সকালে উঠিয়া আমরা

মনে মনে হয়তো অনেক কথাই বলতাম এবং সারাদিন ভাল হয়ে চলার প্রতিজ্ঞাও বই-এর ভাষায় আর গুরুজনের প্রেরণায় উচ্চারণও করতাম। কিন্তু সেই মন আজকের তুলনায় অনেক বেশী চঞ্চল ছিল, সেই প্রতিজ্ঞায় উধৃত 'ভালত্ব' বিষয়ে অনেক উন্মুক্ত ধারণাও ছিল। তাই সেই সব গ্রাম্য কিশোর জীবনে আরোপ ছিল কম, স্বাধীনতা বেশী। তারা প্রায় সকলেই ছিল প্রকৃতির আপন ঘরের সুবিস্তৃত অঙ্গনে অবাধ বিচরণশীল।

আমাদের গ্রামেই ছিল তিনটি খেলার মাঠ। একটি স্কুলের নিজস্ব। সেটি ছিল বড়-সড়, পূর্ণ মাপের। দ্বিতীয়টি ছিল গ্রামের মধ্যেই, প্রায় পূর্ণ মাপের। তাছাড়া তৃতীয় যে মাঠটি ছিল সেটি গ্রামেরই অপর প্রান্তে। সেখানে ছোট মাপের মাঠের খেলাধুলো চলত। হাডুডু, দাঁড়ি-বান্দা ইত্যাদি। এই তিনটি স্বীকৃত খেলার মাঠ ছাড়াও ছিল অনেক জাঙ্গাল এবং প্রশস্ত পতিত জমি যেখানে ইচ্ছে করলেই যেকোনও খেলাই চালানো যেতো। তাই ব্যাপারটা আজকের দিনের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব হলেও উপলব্ধিতে কখনই সত্য হয়ে বাস্তব হবে না। আজ তো শুধু শহর নয়, আশ-পাশের গ্রামগুলোতেও ইটের পরে ইট মাঝে মানুষ কীট। জীবন বলতে এখন যাপনই বোঝায়। বেঁচে থাকা, যুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সার্থকতা নিরর্থকতার পরিভাষায় জীবন এখন কন্টকাকীর্ণ। সেখানে, আমাদের সেই গ্রাম্য জীবনে, জীবনের অন্য অর্থ ছিল, ছন্দ ছিল, ঢং ছিল। মাঠ নেই বলে আমাদের, ছোট-বড়দের কখনও কোনও অসুবিধা হয় নি। যা হোক একটা কিছু হলেই আমাদের চলে যেতো। ফুটবল, ভলিবল, টেনিকোয়েটের জন্যে যদিও বা মাধ্যমের প্রয়োজন ছিল, অন্য অনেক খেলাই ছিল যা মাত্র ক'একটি নিয়ম মেনে নিলেই খেলা যেতো। আর মাধ্যম যে কিনতেই হবে এমন কোনও কথা ছিল না। বাতাবি লেবু, বা যেকোনও শক্ত-পোক্ত গোলাকার গাছের ফল হলেই আমাদের একাধিক দিনের একাধিক মাঠের বহুজনের খেলার স্বাদ মেটাতে পারতো। তাছাড়া খড়ের বান্ডিল, কাপড়ের দলা, শুকনো ঘাঁস—এসব দিয়েও তো আমরা গোলাকৃতি বলের পরিবর্ত করে নিয়েছি। বড়রা তৈরি করে দিয়ে ছোটদের সাহায্য করেছে। মনের আনন্দে, মহা উল্লাসে বিভিন্ন মাঠে আমরা আমাদের পায়ে-বল (হাতে-খড়ি ?) করেছি। না তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঘাটতি হয়েছে, না তাতে খেলার আনন্দে ভাটা পড়েছে!

আজকের দিনে ব্যাপারটা এতো সহজ নয়। ছেলেরা অনেক বেশী সচেতন, অনেক বেশী বাস্তব। তারা চাঁদা তুলতে যে সময় ব্যয় করে, সেই চাঁদার টাকায় যে বল কেনে, আর যতটুকু খেলার সময় আর সুযোগ পায় তার সব বিষয় নিয়েই চুলচেরা হিসাব নিকাশ করতে ঝগড়ায় আর দলবাজিতে জড়িয়ে পড়ে। বর্তমানের কথা যাক। আমাদের একটাই অসুবিধা ছিল; এবং একটাই আকাঙ্ক্ষা আমাদের পীড়ার কারণ ছিল। অন্ততঃ আমার বেশ মনে আছে যে পনেরো-ষোল বছর পর্যন্তের স্বগ্রামের জীবনে আমার একটাই দুঃখ ছিল ঃ ওরা কেন আমাকে ওদের মাঠে খেলতে নেবে না? বয়সের তুলনায় যে দলে আমার খেলার কথা আমি সেই দলে, সেই মাঠে খেলতে চাই না। বড়দের দলে, বড়দের মাঠে খেলতে চাই। এই বাসনা নিয়ে আমার অনেক বিকেল মাঠের পাশে অশেষ মনো-যন্ত্রণায় কেটেছে। তবে এক সময়, কোনও এক দুর্যোগের মুহূর্তে যখন সেই সুযোগ এসেছে তখন তাকে হাত ছাড়া করিনি।

সুতরাং আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। গোলপোস্টের পাশে অপেক্ষা করেছি। যদি কোনও টিম গোলকীপার ছাড়াই হাজির হয়, যদি কোনও গোলকীপার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, বা আর্তবোধ করে। অথবা একাধিক গোল খেয়ে হতাশ হয়ে অত্যন্ত খারাপ খেলতে থাকে। সুযোগ এসে যেতো! এবং তখনই ঝাঁপিয়ে পড়েছি। প্রাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছি ঃ দেখ, দেখ, আমাকে কি মনে কর?

ক্রমশই সুনাম হয়েছে। জানাজানি হয়েছে! আমার চাহিদা বেড়েছে। বাইশ ইঞ্চি বুকের ছাতিকে বত্রিশ ইঞ্চি মনে হয়েছে। সেই ছোটবেলাতেই যখন আমার ইজেরের দড়ি সামনে লেটপ ঝুলতো, সেই তখনই আমার নাম হয়ে গেল। 'সি'-টিম থেকে ক্রমশ 'বি' ছুঁয়ে একেবারে 'এ'-র দিকে চোখ রেখেছিলাম। গ্রামের খেলায় যেমন, স্কুলের খেলাতেও তেমনি। স্বশ্রেণীর গোলী, কিন্তু কবে যে স্কুলটিমের গোলী হব সেই যেন ছিল আমার লক্ষ্য।

স্মরণের সেই শৈশব থেকেই মাঠের একপ্রান্তে দু'টো গোলপোস্টের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সামনের সচল পরিবর্তিত গতিশীল বলের প্রতিটি চলন যেন বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা দিতে থাকত। কাছে বা দূরে বলের সেই বিভিন্ন পথ পরিক্রমা বিভিন্ন আবেগ তৈরি করত। কখনও সোজা, কখনও তির্যক, কখনও

আকাশ-পথে। হঠাৎ হঠাৎ আছড়ে পড়া সেই বলের উপর আমার সেই ছোট্ট শরীরটাকেও আছড়ে পড়তে হয়েছে। ভীষণ নেশা, দুর্দমনীয় নেশা, দুরন্ত সেই সব মুহূর্তের মত্ততা। উল্লাস, হতাশা, প্রতিজ্ঞা! ভবিষ্যতের জন্যে সর্বক্ষণের চিন্তা যেন পুরোনো ভুল না হয়, যেন জয়কে অনিবার্য করা যায়, যেন মাঠ-ফাটানো চিৎকারধ্বনি রক্তে চাঞ্চল্য তৈরি করতে পারে। প্রত্যেকটি ভাল এবং বড় খেলা থেকে পরেরটির জন্যে উন্মুখ অপেক্ষা সমস্ত মনের আকাশ ভরে থাকত। সময় ফুটবল চিন্তায় নিছিদ্র ছিল। অবশ্য ফাঁকে ফাঁকে যে অন্য খেলার জ্বলন্ত দিনগুলো পরিবর্তন আনতো সেও কম উত্তেজক ছিল না—বিশেষ করে হাডুডু। দু'টো খেলাই নগদ পাওনায় বেদনাদায়ক অথবা আনন্দ উজ্বল ছিল। মাঠ-কেন্দ্রিক সেই স্কুলজীবন নিয়ে আমার কোনও দুঃখ নেই, ক্ষোভ নেই, তবে মা-বাবার ছিল। সম্ভবতঃ আমার ম্যাট্রিক মার্কসিটেরও অফুরন্ত দুঃখ থেকে থাকবে। আমার নেই।

প্রত্যেকটি খেলারই উত্তেজনা বাড়ে বা কমে দর্শকের সংখ্যা আর তাদের মানসিকতার জন্যে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমবেশী প্রত্যেকটি খেলাতেই তো থাকে। কিন্তু যদি দলের নামকরণ হয়? যদি খেলা পূর্বপাড়া-পশ্চিমপাড়ার মধ্যে হয়? ইনভলভমেন্ট বাড়ে, দর্শক সংখ্যা বাড়ে, প্রাণপাত জয়ের ইচ্ছা বাড়ে এবং সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বাড়তে থাকে। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি বড়রা দল তৈরি করে খেলানোর দিকেই ঝুঁকে থাকতেন। বিভিন্ন মাঠ, দল ও সময় আলাদা আলাদা হয়ে যেতো। আরও মজার ব্যাপাব ওখানে, আমাদের ছোটবেলায়, দেখেছি, গ্রীষ্মকালে সকালেও বহু প্রতিযোগিতামূলক খেলার ব্যবস্থা হত। দর্শকের ও অভাব বড় একটা দেখিনি। অর্থাৎ যে পরিমাণ দর্শক থাকলে খেলোয়াড়দের আগ্রহ আর তেজ, 'কিলার ইনস্টিংট্' জাগ্রত হয় সে পরিমাণ দর্শক জড়ো হয়েই যেতো। কোথা থেকে এরা চলে আসতো সেটা বড় কথা নয়। এসে হাজির হয়ে যেতো এটাই বাস্তব সত্য। সকালে হলেও এরা আসতো, বিকেলে হলেও। কোনও বাছ-বিচার ছিল না বয়সের এবং বৃত্তির। এ গ্রাম-সে গ্রাম, এ পাড়া ও পাড়া করে যারা এসে হাজির হত তারা প্রায় সকলেই, ছেলে হোক বুড়ো হোক সকলেই নেশাগ্রস্তের মতো প্রথম থেকেই চিৎকার আর চেঁচামেচি করে নিজেদের গলার জোর, খেলোয়াড়দের গতি-শক্তি আর খেলার মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য বাড়িয়ে তুলতো। একটা একটানা হৈ-হৈ, রক্তের

উত্তেজিত ওঠা-নামা, শিরা ফোলা হাতের সামনে-পাশে আস্ফালন ক্রমশ এতই তীব্র হয়ে উঠতো যে তা প্রায়ই মারামারি, লাঠা-লাঠিতে গিয়ে হুল্লোড়ে পেঁছে যেতো। খুবই যখন ছোট ছিলাম, তখন বাইরে থেকেও ভয় পেতাম, মাঠের মধ্যে যখন একজন হয়ে ওদের অত্যন্ত কাছে থাকতাম তখন আরো বেশী ভয় হত! গোলকীপারকেই তো সব থেকে কাছে এবং সহজে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায়।

হাডুডু খেলায় এই উত্তেজনা এতই চরম হত যে এই-মারে-তো-সেই-মারে অবস্থায় পেঁছে যেতো। আর সেখানে মাঠ ছোট, দর্শকরা সকলেই বড়। শুধু বড়ই নয় তারা বেশীর ভাগই মালকোছা মারা, লুঙি-ভাঁজকরা, আদুড়-গা। ওদের পেশীর দৃঢ়তা স্পষ্ট দেখা যেতো, হাতের শিরা আর কব্জির প্রস্তর-কাঠিন্য যেন বর্শা ফলকের ধার নিয়ে সদা-সতর্ক হয়ে চোখের সামনে উত্তোলিত থাকত। সব থেকে ভয়াবহ ছিল কাড়া-নাকাড়া ঢাক-ঢোল, হাঁড়ির মুখে পেতলের থালা বাজানো! সেই জগঝম্প বাদ্য-বাজনা যখন দু'পক্ষের তরফে একই সঙ্গে পেটান চলত তখন দেহের সমস্ত রক্ত ফুলে ফুলে উতলিয়ে উঠতো। খেলায় সৌন্দর্যের চাইতে শক্তি বেশী প্রকাশ পেতো, কৌশলের চাইতে হিংস্রতা, প্রয়োজনের চাইতে বেশী পেষন জুটতো প্রতিপক্ষের ভাগ্যে! ফলে খেলার মাঠের উত্তেজনা বাড়তো মাত্রাতিরিক্ত ভাবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের ঠেলা-ঠেলি মারা-মারি। এই অবস্থায় অক্ষত ফিরে আসা, বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন ছিল। কাজিয়া পর্যন্ত গড়াতো প্রায় সব খেলাই। তাই নিজের অপুষ্ট ছোট্ট প্রাণটার ভয়েই সেই স্বাস্থ্য-শক্তি নির্ভর নির্মম খেলা থেকে নিজেই ছুটি নিয়েছিলাম। ভয়ে এবং মায়ের চোখের জলের প্রস্রবনে।

রেফারীদের দুর্দিন সেদিনও যেমন ছিল আজও তেমনিই আছে। তখনও তারাই ছিল প্রথম বলি, এখনও তারাই আছে সেই একই ভাবে বলি প্রদত্ত। বহু মাঠে বহু রেফারীকে দেখেছি হঠাৎ কর্পূর হয়ে যেতে। বাঁচার জন্যে নিষ্ক্রমণের পথটিই ওদের আগেভাগে খুঁজে রাখা আবশ্যিক। বাঁশির জোরে নয়, নয় নিয়ম-কানুনের প্রয়োগে, ওদের পদদ্বয় যত সচল, যে রেফারী যত তাড়াতাড়ি আড়াল খুঁজে নিতে পারে, সেই তত সহজে পরের বার রেফারী হতে পারে। এতো গেল ফুটবল মাঠে। হাডুডু তে ওদের দেহের শক্তি,

দু'চার জোড়া হাতের বেষ্টন ছাড়ানোর ক্ষমতা এবং দু'চার ঘা জলের মতো হজম ক্ষমতা অত্যন্ত জরুরী গুণ বলে মনে হয়েছে। ছোট মাঠে বড় হাতের মার থেকে বাঁচতে অনেক বড় কৌশল আয়ত্বে থাকা চাই।

অথচ রেফারীর অভাব হত না! মাঠের মাঝখানের রাজা যে! মাঠে যখন ক'এক শ' থেকে ক'এক সহস্র দর্শক উপস্থিত, খেলা সুরুর আগ্রহে টগ্‌বগ্‌ করে যখন তাদের রক্ত উথাল-পাথাল, তখন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র কেন্দ্রমণি যে সেই তো রেফারী! সকলের চোখের সামনে, সকলের দৃষ্টির কেন্দ্রে, সম্রাট! তারই ইঙ্গিতে, একমাত্র তারই বাঁশির একটা তীক্ষ্ন ধ্বনিতে অতগুলো খেলোয়াড়, অত-শত দর্শক প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠবে! এটা কি কম পাওনা? কম উত্তেজক? হলই বা এটা অনিবার্য যে খেলার পরে সে বিস্মৃত হবে, হলই বা যে খেলা চলাকালে তার একটা ভুল, একটা সন্দেহজনক নির্দেশ একটা দলের সর্বনাশকে নিশ্চিত করে দিতে পারে, একটা খণ্ড যুদ্ধ তৈরি করে দিতে পারে?

একটু যখন বড় হয়েছি তখন দাম বেড়েছে ততোধিক। আমার বড় হওয়াটার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। আমার ওজন বা প্রস্থ বাড়েনি যখন আমি বড় হচ্ছিলাম! শুধু আকাশটা আরও কাছে আসছিল, সুপারি গাছগুলোকে নাকি ছোট দেখাতো। দৈর্ঘ্য বাড়ছে প্রস্থ বাড়ছে না এমন একটা বড় হওয়াতে অন্তত একটা সুবিধা আমি ছোট-থেকেই পেয়েছি। আকাশ আর সুপারি গাছের কথা তারাই জানে যারা বলেছে; আমি জেনেছি যে গোলপোস্টের উপরের সমান্তরাল বারটি আমার হাতে সহজেই এসে যেতো! এবং ঝাঁপ দিলে প্রান্তের পোল দু'টোও দূরত্ব হারাতো। সব দেখেশুনে আমার মনের বল বেড়েছিল আর যারা গোলকীপার স্থির করে দেয় তাদের সমস্যা কমেছিল। প্রায়ই দেখেছি আমার সিনিয়র গোলকীপার আকাশপথে এবং অরক্ষিত পার্শ্বে পরাভূত হয়ে দলের ভরাডুবি ঘটাচ্ছে। আকাশ এবং পার্শ্বদ্বয় ভরাট হবে ভেবে আমার স্থান বড়র দলে হয়ে গেল আমি বড় হবার আগেই।

সে তো না হয় হল। কিন্তু যারা আমার বিরোধী এবং খেলার মাঠে যারা প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সমর্থক তারা চাপা উল্লাসে অধীর অপেক্ষা করতো। ওরা অপেক্ষা করত সেই দিনটির যেদিন কোনও এক গোলমুখী বল তীব্রবেগে

ধেয়ে এসে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে পিছনের দর্শকদের মধ্যে ফেলে দেবে। আমি ছিন্নপত্রের মতো উৎক্ষিপ্ত ভাসমান হব। গোল হয়ে যাবে, ওরা হাততালি দিয়ে ব্যঙ্গ করবে! আমাদের সময়ে সেই গ্রামে গোলপোস্টের পিছনে কোনও জালের ব্যবস্থা ছিল না। জালে আটকে যে বাঁচব সে পথ ছিলই না। সারিবদ্ধ দর্শকদের বাঁধেই একমাত্র আমার আকাশ গমনকে নিরুদ্ধ করার সম্ভাবনা ছিল! আমি নাকি বিস্ময় চিহ্নের মতো ছিলাম গোলপোস্টের মধ্যে। দেখতেও বটে কাজেও বটে। বিরোধীদের কাছে দেখতে, সমর্থকদের কাছে কাজেও।

সত্যিই তাই। খেলার শেষে মাথা ঝুঁকিয়ে সন্তর্পণে ফিরে আসার স্মৃতি প্রায় নেইই। স্কন্ধারূঢ় অন্য-পদ-গতি দলবদ্ধ প্রত্যাবর্তনই ছিল নিয়ম। আর সেই থেকে নেশা ; নেশা থেকে আরও নেশার ইচ্ছা! মা বাধা দেবেন। বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন। একই টেবিলের এবং একই ক্লাসের সহপাঠী সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী, মন্টু, শ্রেণী পরীক্ষায় দ্বিতীয় হবে। জ্যাঠতুতো ভাই নির্মল প্রথম। তাই রামেশ্বরের দীর্ঘশ্বাস, হেমলতার বাধা দান। শ্রেণী তালিকায় আমার নাকি ওদের সরিয়ে দেওয়া দরকার। মা-বাবা তাই ভাবেন। আর তাই অশেষ কষ্ট-বোধ করেন। ওরা যেখানে প্রথম-দ্বিতীয় আমি সেখানে অফুরন্ত দূরত্বে প্রায় অ-দৃশ্য ; আর আমি যেখানে প্রথম-দ্বিতীয় ওরা সেখানে ভুলেও পা বাড়ায় না। এই প্রান্তিয় অবস্থানে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা কল্পনা করা যায়? ছিলও না কোন। আগ্রহ পছন্দ আর ইচ্ছার অভাব ঃ ওদের মাঠে, আমার পড়ায়। ওরা বইতে মুখ গুঁজে 'ভাল' ছেলে হয়ে ওদের কৈশোরের সবুজকে কেউ বা ম্যাট্রিকের কেউ বা আর একটু ঊর্ধ্বের বর্ণহীন সমাপ্তিতে ধূসর করে ফেলেছে। আমি মাঠে-জলে, ডাঙগায়-নৌকোয় যথেচ্ছ বিচরণ করে সবুজে-নীলে মাখামাখি করেছি।

তাই বাবা বলেছেন ওর কিছু হবে না, মা বলেছেন ওকে ফিরিয়ে আন। বাবা বলেছেন ও 'ছোপের কুড়োল', মা ফেলেছেন চোখের জল। আর এই হাহুতাশের মধ্যে সকাল-বিকেল আমার কেটেছে মাঠের নেশায়, অফুরন্ত 'বাহবা'র সমুদ্র-শব্দে, অজস্র মানুষের সোল্লাস প্রশংসায়। মাঠ আমাকে মাতিয়ে রেখেছে, আমাকে সর্বক্ষণ এবং সর্বত্র ডাক দিয়েছে।

ডাক আসতে লাগল দূর দূর গ্রাম থেকে, ক্লাব থেকে। তখন আর আমি

রাউণ্ডের খেলা খেলি না! কোয়ার্টার-সেমি-এবং প্রায়ই ফাইনাল খেলি। পাঁচ-মাইল-দশ-মাইল দূরের মাঠেও আমার অবাধ এবং কাঙ্ক্ষিত বিচরণ। সেসব অভিযানের কথা একটু পরে। আগের কথাই এখনও শেষ হয় নি যে!

ফুটবলে আমার আদর্শ গোপালদা। জ্যাঠতুতো দাদা। অনেক বড় আমার থেকে। আমি যখন গোলপোস্টের পাশে হাপিত্যেশ হাপুস নয়নে খেলা দেখি, গোপালদা তখন মধ্যমাঠের রাজা। গোপালদা ছাত্র ভাল, ছেলে ভাল, গোপালদাব হাতের লেখা সুন্দর, দেখতেও সুন্দর, সাস্থ্যও চমৎকার। এই গোপালদা বাছা বাছা খেলায, সেমিফাইনাল বা ফাইনালেই খেলেন; তাই সব মিলিয়ে গোপালদাই আমার আদর্শ, যদিও, এক খেলা ছাড়া অন্য কোনও দিকেই গোপালদার কাছে যেতে পারি নি। ছাত্র খারাপ, টেনে-টুনে পাশ করা, ছেলে যাচ্ছেতাই, হাতেব লেখা 'অখাদ্য', স্বাস্থ্যেব বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। এই আমি কিন্তু আমাব মামাবাড়ির গ্রামে এবং মাঠে অচিন্তনীয় আদরের, আকাঙ্ক্ষাব পাত্র। এমন ছেলে হয় না, 'এমন মিশুক, এমন সরল এমন সর্বজন স্নেহধন্য এবং খেলার মাঠে এমন প্রধান। তাই ছুটি হলেই মামাবাড়িব গ্রাম এবং আশেপাশের গ্রামগুলো আমাকে হাতছানি দিত। সেখানে প্রতিটি গৃহ ছিল আমার আপন গৃহ। তাব কতটা আমার নিজের অর্জন আর কতখানি আমার মা-এর জন্যে পাওয়া তা বুঝেছি অনেক পরে। আশেপাশের বাড়িগুলো ছাড়াও দু'চারখানা গ্রামে আমার মা ছিলেন প্রত্যেকের গৃহ-কন্যা, গ্রাম-কন্যা।

তাই মামাবাড়িতে গিয়ে আমার মামা-গ্রামে যাওয়া হত। সে ছিল আর এক ধরণের নেশা। স্নেহে আর ভালবাসায়, বন্ধুত্বে আর প্রীতিতে আমি মাতাল হয়ে যেতাম। যে ক'টি দিন থাকতাম তা ভরাট হয়ে পূর্ণ হয়ে উপচে পড়তো। চলে আসার সময় চোখের জলে প্রোথিত-পদ আমাকে দু'চার জনের সাহায্যে গৃহমুখী হতে হত। অন্তত বেশ কিছু দূর পর্যন্ত বিদায়-বেদনা সঙ্গী হয়ে সঙ্গ নিত।

ওখানেও রোজ খেলতে হত। দু'টো মাঠ ছিল। এমন অবস্থা হত, যখন কম দিন থাকতাম, যে দিনে দুটো খেলা প্রায়ই খেলতে হত। এটা চলেছে ছোট-বেলা থেকে বড়-বেলা পর্যন্ত। হাত ধরে টানাটানি এড়াতে খেলার

ব্যবস্থাটাই দু'বেলায় ছড়িয়ে দিতে হত। এমনও হয়েছে, এক বিকেলেই দুই মাঠে খেলতে হল। এ-মাঠ ছেড়ে ও-মাঠ। একটি খেলার পর অন্যটি!

সে সব দিন, সেই সব খেলা আর নেশা-নেশা নৈকট্য কি জীবনে কখনো ভোলা যাবে?

একটু বড় হতেই মা'এর শ্যেন দৃষ্টি পড়ল আমার দিকে। ছেলেকে 'ভাল' করতেই হবে, 'মানুষ' করতেই হবে। বহু কড়াকড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেল। আইন বা বিধান অমান্য করলে উত্তমমধ্যম। সে সব সবিস্তার অন্যত্র লিপিবদ্ধ রয়ে গেছে! কিন্তু আইন যত কড়া হয়, ফাঁকির পথও তত সূক্ষ্ম হতে থাকে! এই স্বাভাবিক নিয়মে কাছের মাঠের ডাক এবং খেলার ব্যবস্থা সহজই ছিল। কিন্তু দূরের মাঠের ডাক? সেখানে যে সময় লাগবে অনেক বেশি? তাই পালিয়ে, জল ঝাঁপিয়ে সরে পড়তাম যেমন, তেমনই বাড়ি ফিরে সবদিন পিঠ বাঁচানো সম্ভব হত না। পিঠ, কান এবং কখনও কখনও সর্বদেহই মা'এর হাতে সঁপে দিয়ে তাৎক্ষণিক পাওনা মিটিয়ে নিতাম। বকেয়া বা বাকি রাখা তখন আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ ছিল না। দু'দিনের পাওনা শাস্তি একদিনে নিতে পারার মতো শরীরের গঠন অবশ্যই আমার ছিল না। খেপে-খেপে নিয়ে নেওয়াই তখন আমার কাঙ্ক্ষিত পদ্ধতি ছিল। আর তা ছাড়া মা-এর দেওয়া এই দেহ মায়ের হাতে সঁপে দিতে আমার কেন কষ্ট হতে যাবে? পরের দিন বা তার পরের দিনও যে দূরে-কাছে কোথায়ও খেলা রয়েছে! মা আমার সেই মেঠো জীবনে একাই সব ছিলেন—অভিযোগও তাঁর, যুক্তি-তর্ক ওকালতিও তাঁর এবং বিচারও তিনিই করে রেখে দিতেন। আর সব থেকে বড় কথা হল সেই 'রায়'-এর প্রয়োগের জন্যেও কোনও পুলিশী ব্যবস্থার দরকার ছিল না! শাসন ব্যবস্থার কোনও বিভাজন ছিল না! এখন যেমন ফাঁসির দড়িটি টেনে দিতে কলকাতায় ভবানীপুরের কোনও এক ব্যক্তির প্রয়োজন এবং সদ্য সদ্য গুজরাটে ফাঁসি দিতেও মহারাষ্ট্রের ফাঁসুড়ের দরকার হয়, ডাক পড়ে, আমার ক্ষেত্রে কিন্তু ছিল মাতা-এব-কেবলম্! এবং এই শাস্তি প্রয়োগ প্রক্রিয়াটি ছিল বেশ পরিপাটি, যেমন ছিল আমার পরের বারের মাঠের ডাকের আকর্ষণে গৃহ-ত্যাগটি। মা যেমন নিঃশব্দে আমাকে নিয়ে খেলা করতেন (?) আমার কানের যাবতীয় ময়লা, পিঠের সহনশক্তি, চুলের

দুমুল গোছ ইত্যাদির কঠিন-কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন যখন আমাকে হাতের মুঠোয় পেতেন, আমিও তেমনি নিঃশব্দেই, হয়তো বা পরের দিনই, সরে পড়তাম ভর দুপুরে। ঘণ্টা দু'তিন-এর পথ হয়তো হাঁটতে হবে। টিমের তরফে সংগ্রাহকরা হয়তো অদূরেই কোনও ঝোপের আড়ালে বা গাছের মাথায় অপেক্ষা করে আছে আমাকে নিয়ে যাবে বলে। সময় নির্দেশ পেলেই বিড়ালের সন্তর্পণ পদক্ষেপে গৃহ-ত্যাগ! এটা গ্রীষ্মকালে যত সহজে হতে পারতো, বর্ষাকালে তত নয়। তখন তো আমাদের প্রত্যেকটি বাড়িই এক একটি দ্বীপ। নৌকোই একমাত্র চলাচলের বাহন। সেই দ্বীপ থেকে জল ঝাঁপিয়ে অপেক্ষমান নৌকোয় উঠতে হবে। এবং মা-এর শ্যেন চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে। তাই স্নানের সময় পালানোটাই ছিল প্রশস্ত। তা দুপুরের খাওয়া হোল কি হল না সে ছিল অবান্তর প্রশ্ন। দু'চার মাইল নৌকো, তার পরে হাঁটা। মাঠে পৌঁছে স্বস্তি।

সে ছিল আমার অত্যন্ত বিপরীত-অভিজ্ঞতার তীব্র অনুভবের দিন। দিনের পর দিন দু'টো আলাদা জগতের অধিবাসী। গৃহের বাইরে আনন্দের হাট, মাঠের নেশা, খেলার মাদকতা, এবং প্রায়শই জয়ের উল্লাস। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন আমার কাছে বিস্মৃতির অতলে। অত লোকের, বহুলোকের, আদর আপ্যায়ন, প্রশংসা, উৎকন্ঠিত অপেক্ষা যেন অন্তরে সমুদ্রের ঢেউ তুলে দিত। আমার সেই অত ছোট বয়সে অত বড় বড় ঢেউগুলো যেন আমার মনের খাঁচার দেয়ালগুলোকে ঝন্‌ঝন্‌ করে সফেন আনন্দে ডুবিয়ে-ভরিয়ে-ভাসিয়ে নিয়ে যেতো! চাল-ডাল নয়, টাকা-পয়সা নয়, মণ্ডামিঠাইও নয়, ব্যবস্থা থাকতো শুধু লেবুর! লেবু কেটে কেটে তাতে নুন মিশিয়ে থালায় করে বা পাতার ঠোঙায় মাঠে আসতো। সেই লেবু অমৃতের স্বাদ নিয়ে হাজির হত খেলার মাঝখানে, খেলার শেষে। নুন-লেবু আর শেষকালে, জয়ের পরে, উল্লসিত প্রশংসা মনের মধ্যে তীব্র ঝোঁক তৈরি করে দিত, মাথার মধ্যের কোষগুলো যেন জবজবে নেশায় হাবুডুবু খেতো। তাই তো মাঠের হাতছানি, খেলার আকর্ষণ কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব হয়ে পড়তো।

ভেবে পেতাম না বড়রা কেমন মানুষ হয়? ওদের কি মন থাকে না? মাথার মধ্যের কোষগুলো কি ওদের নড়ে চড়েও না? বিশেষ করে মা-বাবাদের? ছেলে স্কুলে প্রথম দ্বিতীয় হলে তো দেখেছি সেই সব ছেলের মা-বাবারা বেশ

গম্ভীর-গম্ভীর, ভারিক্কি-ভারিক্কি চালে অন্যসব ছেলেদের মা-বাবাকে উপদেশ-টুপদেশ দেন। তাদের মনে নিশ্চয়ই অনেক অনেক আনন্দ গুন-গুন করতে থাকে। আর বারবারই দেখেছি আমার মা-বাবার মুখ কেমন যেন শুষ্ক-শুষ্ক হয়ে গেছে, প্রাণহীন, অবসন্ন, দীর্ঘশ্বাসী! কেন এমন হয়? যে আমার শ্রেণীতে প্রতি পরীক্ষায় প্রথম হত সে তো মাঠ-থেকে শতহস্ত দূরে থাকত, আর যে দ্বিতীয় হত, এবং আমার টেবিলেরই অপরপ্রান্তের পড়ুয়া ছিল, সে তো থাকত সহস্র হস্ত দূরে? তাহলে কি বাল্যকালে এবং কৈশোরে পুঁথি-পুস্তক-প্রবেশই মা-বাবা-দের একমাত্র কাম্য তাদের সন্তানদের জন্যে? শৈশব বাল্য কৈশোর কি প্রাকৃতিক নিয়মে চলবে না? চলবে শুধু মা-বাবার বিধানে আর পুঁথি-পুস্তকের মরুবালুতে? যারা সেখানে ওয়েসিস বা মরুদ্যান খুঁজে পায় তাদের কথা আলাদা। মা-বাবারা সেই মরুদ্যানে তাঁদের সন্তানদের হাত ধরে নিয়ে যান তাই তারা জলও পায় ছায়াও পায় আনন্দও পায়। সেই ছোট বেলা থেকে বার বারই মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। লেখাপড়ার সঙ্গে এই গাড়ি-ঘোড়া চড়ার hedonistic সংযোজনটি কেন হল? একমাত্র সুখ কি গাড়িতে আর ঘোড়ায় চড়াতেই? অন্য কোনও সুখ, ভিন্নতর কোনও আনন্দ, অন্যতর কোনও প্রাপ্তির কথা কি জীবনের ঊষা লগ্নে বড়রা শোনাতে পারেন না, পারতেন না? পরিবার সমাজ পরিজনদের মধ্যে যাঁরা, (এবং কজনই বা তাঁরা?) গাড়ি চড়েন তাঁদের তুলনায় গাড়ি-না-চড়ার দল-ই তো সমধিক! তাদের সঙ্গেই তো শৈশবের ওঠাবসা, বাল্যের গল্পগুজব এবং কৈশোরের দাপাদাপি। তাহলে? যদি বলি গাড়ি চড়তে চাই না?

বঙ্কিমচন্দ্র মুশকিলে পড়েছিলেন এক নৈয়ায়িক মার্জারকে নিয়ে, আর সাজাইলের ক্লান্ত গ্রাম্য জীবনে আমার মা বিপদে পড়েছিলেন আমাকে নিয়ে। মাঠের বল-আকর্ষণ ছিল আমার মুভিং ফোর্স, আমার কেশাকর্ষণ ছিল মায়ের ডিপ্রেশন্ ফোর্স। দুধ মঙ্গলার দুয়েছে প্রসন্ন। সুতরাং বিড়ালের এবং বঙ্কিমের অধিকার সমান! আমার ক্ষেত্রে 'জীবন আমার, বাল্যকাল আমার, কৈশোর আমার।' আমার যা ভাল লাগবে তাই করব। গাড়ি ঘোড়া চড়ার কোনও পরিকল্পনা আমার নেই। সুতরাং কোনও সুবোধ বালকের গোপালত্ব আমাকে কোনও দিনই হাতছানি দেয় নি, দেবে না। জল কাদা, মাঠ-ঘাট,

বন-বাদাড়, ঝোপ-জঙ্গল—যেমন চলছে তেমন চলবে।

ঠিক একই রকমের অভিভাবকীয় যুক্তিতে আমার মা বঙ্কিমকে ছাড়িয়ে গেছেন। মঙ্গলার দায়দায়িত্ব, ভরনপোষণ, দেখাশুনো এবং ইত্যাদির যাবতীয় দায় মালিককে যে অধিকার দিয়েছিল, মার্জারকে তা দেয়নি। কিন্তু সেকথা সে বলতে পারল কৈ ? অহিফেনের প্রভাব তার গুরুমস্তিষ্কে অবশ্যই গুরুতর পরিবর্তন সাধন করে থাকবে। এই ব্যাপারটা আমার মা-এর ক্ষেত্রে একেবারেই ছিল না। তাই অনায়াসেই তিনি বলতে বা ভাবতে পেরেছেন ঃ ছেলে আমার, তার দায়-দায়িত্ব আমার। লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার দায় অধিকারও আমার। তাই স্বভাবতই যাবতীয় ক্রোধান্ধ এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া পদ্ধতির প্রয়োগে কোনও ব্যাঘাত ঘটার কারণ নেই। অন্য ভাবেও ছিল না। আমার শীর্ণ দেহ, ক্ষীণ কণ্ঠ এবং সব থেকে বড় কথা, পিতা-ভ্রাতা-মাসি-পিসি জাতীয় কোনও উদ্ধারকারীও ধারে কাছে ছিল না। [বাবা বৃহত্তর ব্যাপারে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেই অভ্যস্ত ছিলেন, দার্শনিক সমস্যার সমাধানে তাঁর যত আগ্রহ ছিল পারিবারিক সমস্যা সমাধানে ততটা নয়। তাছাড়া 'হোম-ডিপার্টমেন্ট'-কে স্বাতন্ত্র্য দেবার ব্যাপারে তাঁর নীতিগত নিষ্ঠা সর্বজনবিদিত ছিল।]

তাই একদিকে নিজে আমি আমাব যে হস্তপদ স্বভাবটি গড়ে তুলেছি, আর আমার মা আমার সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সঙ্গে অধিকন্তু আমার পিঠের, চুলের এবং ঘাড়ের যে সহ্যশক্তির অনিবার্য অনুশীলন, প্রথাসিদ্ধমতে, ঘটিয়েছেন তারই ফলস্বরূপ এই আমার বর্তমানের আমি !

দেশের গ্রামে বেড়ে ওঠা এই আমিটিকে ম্যাট্রিকের বেড়া টপকে যখন মহেশ্বরপাশাতে দিদির হেপাজতে জমা দেওয়া হল, তখনও বিশেষ কোনও পরিবর্তন হল না। অর্থাৎ মাঠের আকর্ষণ সমানই রয়ে গেল। মাঠ আমাকে ছাড়ল না, আমিও মাঠকে আঁকড়েই রইলাম। অবশ্য এখানের কঁএক মাস আমার উঠতি তরুণ দেহটিকে যৌবনের তাজা দুারদেশটিতে প্রবেশের ব্যবস্থা পাকাপাকি করেই করে দিল।

মহেশ্বরপাশার মাঠ ছিল বেশ বড়সড়। দর্শক ছিল কলেজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহুরে ভদ্রলোকেরা। এখানে খেলার মান, পদ্ধতি এবং কৌশল ছিল অনেক আলাদা। প্রায়ই মনে পড়ত চেনা পরিবেশে জানা সহখেলোয়াড়দের

প্রতিদ্বন্দ্বিতা-যুদ্ধ-প্রাপ্তি। কখনও তারাইলের মাঠ, কখনও ঘোনাপাড়া, কখনও কখনও মনের পর্দায় উঁকি দিত মাজড়ার মাঠ। খান্দারপাড়, আমডহ, হরিদাসপুর। আরো কতো কতো মাঠ! তারা কতই আলাদা আলাদা। কিন্তু মূল প্রকৃতিতে সব মাঠই একরকম ছিল। বহমান খরস্রোতা নদীর ধারের মাঠ আর পাথার-প্রান্তর হাটের পাশের বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যিখানে কোদালের চিহ্নে নির্ধারিত মাঠ, খেলার সময় একই রকম মনে হত। যেন কত চেনা, কত আপন। আবার জঙ্গলে ঘেরা আম-কাঁঠালের ঘেরার মধ্যে যে মাঠ আর শস্যক্ষেত্রের সবুজের মোড়কে বাঁধা যে মাঠ সেও তো কখনও নোতুন মনে হয় নি। মনে যে হয় নি তার প্রধান কারণ দলবদ্ধতা, জানা-চেনার জগৎ। প্রতিটি খেলোযাড়কেই প্রায় ব্যক্তিগতভাবেই চিনি, জানি তাদের শক্তি এবং দুর্বলতা। মাঠের মধ্যে যুদ্ধকালেও ওদের বেশিরভাগেরই মনের সঙ্গে মনের আনাগোনা কত সহজেই হতে পেরেছে। দর্শক ঘেরা মাঠের প্রতিটি কোণের দর্শকদের ব্যবহার জানা, তাদের আনন্দ, উত্তেজনা, উল্লাসের প্রকাশগুলোও তো চেনা। মাঠের হাওয়া, উঁচু-নিচু অবস্থাগুলো বহু পদচারণায় অতি চেনা। এতো সব চেনাজানা ছেড়ে যখন এই মহেশ্বরপাশার মাঠে অত্যুগ্র আগ্রহে এবং উত্তুঙ্গ বাসনা নিয়ে খেলতে গেলাম তখন প্রথম দিনেই সব যেন বেলুনে পিন হয়ে চুপ্‌সে গেল। কেউ চেনে না, কেউ জানে না, কেউ বোঝে না! সেই মাঠের কর্কশতা যেন ঘাসের আবরণ ভেদ করে প্রতিনিয়তই আমার বেদনার কারণ হয়ে উঠেছিল। গোল হলে সব দোষ এই 'নন্দ ঘোষের', ভাল খেললে সে'তো স্বাভাবিক মাত্র! সব যেন কেমন বিস্বাদ বলে মনে হত। সেই দুলাল নেই ব্যাকে, গগন নেই হাফ্ ব্যাকে। চিনিনা ওদের পদ্ধতি, জানিনা ওদের শক্তি-দুর্বলতা! কিন্তু ওরা জানে আমি নোতুন। আমি নবাগত। ওদের নিজেদের মধ্যে ভাই ভাই ভাব, আমার বেলায় ওরা অকারণেই কৃপণ।

খেলার মাঠে প্রতিষ্ঠা পাবার আগেই আমি স্থানীয় ছেলেদের মধ্যে পাত্ পেয়ে গেলাম। সে আমার ছবি আঁকার ক্ষমতায় আর স্বাস্থ্যোন্নতির দ্রুততায়। আমরা তখন সকালে শরীর চর্চা করি বিকেলে কুস্তি! দেখতে দেখতে শরীরের গড়ন গঠন উজ্জ্বলতা বেড়ে যেতে লাগল। সব মিলিয়ে যে'কটি মাস ওখানে সহজভাবে কাটাতে পেরেছিলাম তা আমার তারুণ্যের জমার ঘরে

অবিস্মরণীয় ! আবার এই মহেশ্বরপাশাতেই প্রথম জীবন যুদ্ধের শঙ্খ নিনাদটি শুনেছিলাম। দিদির আওতা থেকে সরে যেতে হল। সুরু হল একাকী জীবন। সেও বেশীদিন টিকল না ! সরে যেতে হল কলকাতায়। সেখানে, সেই কলকাতায়, আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম যেন একটি ভাসমান পত্র। বিক্ষুব্ধ, উজ্জ্বল, চলমান, উদ্বেল কলকাতা আমাকে আত্মস্থ করতে রাজী নয়। আমি টিকে থাকতে বদ্ধপরিকর। সে অন্য ইতিহাস, অন্য কাহিনী। তাই তার জন্য অন্যত্র ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমার মেঠোজীবনের শেষ অনুচ্ছেদ কলকাতার মাঠ। তখন বয়স গড়িয়ে গেছে বলা যায় ! একান্ন বাহান্ন সাল। কলকাতা পুলিশ টিমের হয়ে খেলতে গেলাম ! আমি অথৈ সমুদ্রে হাবুডুবু খেলাম। টিম ভাল ছিল না, ডিফেন্স নেইই বলা যায়, গোলকীপার খেলতে গিয়ে প্রায় নিজের দিকের অর্ধেক মাঠের দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে বসল। সেন্টার লাইন পার হলেই সে বল নিশ্চিত গোলে আছড়ে পড়বে ! অবস্থা এমন ! তাই খেলা শেষে মাথা নিচু করে যখন নিঃশব্দেই চলে আসছিলাম টেন্ট এর দিকে তখন ঘটকবাবু আমার মনের ক্ষতকে তাঁর হৃদয়ের গলিত উত্তাপে ভরাট করে দিলেন। 'থঙ্গরাজ' থাকলেও কিছু করতে পারতেন না। তুমি কিছু কষ্ট পেয়ো না !'

সেদিন আমি অনেক চোখের জল ফেলেছিলাম ! অনেক অনেক ! এবারে দ্বিতীয় পর্যায়। ভেটারেন্স। অনেক খেলেছি কিন্তু উল্লেখযোগ্য নয় তার কোনওটাই। যদিও উজ্জ্বল প্রশংসায় সে সব খেলা তরুণদেরও লজ্জিত করেছে। বেশীরভাগই স্থানীয়। যুবক দল বনাম বৃদ্ধদের দলের খেলায় ট্রফিটা অবশ্যই আমাদের দখলে থাকত। এই পর্যায়ের শেষ খেলা কোচবিহারে বাহাত্তর সালে। শিক্ষক-শিক্ষক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উৎসব বলা যায়। বলা যায় সৌজন্যমূলক খেলা। কিন্তু দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই গোটা খেলাটা আর খেলা রইল না, যুদ্ধে পরিণত হয়ে গেল। দর্শকের সংখ্যা অবশ্যই সুপ্রচুর। সকল ছাত্ররাই কলেজের এবং স্কুলের চারধার ঘিরে রেখেছে। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ এবং জেনকিন্স স্কুল। দু'দিন আগে ক্রিকেটে স্কুল হেরে গেছে। ইনিংস ডিফিট। শিবনাথবাবু, শিবনাথ চ্যাটার্জী, গত দিনের নায়ক। নয়টি উইকেট, বোধহয় পঁয়ত্রিশ রানের মধ্যে ! আর এই আজ। হাতে ব্যাটে যে পরাজয় তার প্রতিশোধ পায়ে মাথায় নিতে জেনকিন্স শিক্ষকরা

বদ্ধপরিকর ছিলেন। সময় চলে যাচ্ছে। সাফল্য ওঁদের হাতছানি দিচ্ছে। বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ছে আমাদের কলেজের গোলপোস্টে! বার বার প্রতিহত হয়ে ওদের জেদ বাড়ছে। বয়সে ওরা সুবিধাভোগী। তাই ওদের তেজেও প্রতাপের ছড়াছড়ি। পনেরো কুড়ি ফুট দূর থেকে 'সেকেণ্ড বার'-এ বল তীব্রগতিতে ছুটে এলো। ডাইভ্! রেফারী গোলের বাঁশী বাজিয়ে দিলেন। তিনিও অত্যন্ত উত্তেজিত। বুকের ভিতর থেকে যখন সেই বল বার করে উঠে দাঁড়ালাম তখন দীর্ঘ হাততালি! রেফারী সিদ্ধান্ত বদল করলেন গোলজাজের মত নিয়ে। মাঠের কলেজ ছাত্রবা লাফালাফি করে মাঠ মাতিয়ে তুলছে। দ্বিতীয় হাফে হতাশাগ্রস্ত স্কুল টিম ভেঙে পড়ল। গোল কেন হচ্ছেনা? কিন্তু ওঁদের ভাগ্যদেবী অলক্ষ্যে সেদিন মুচকি হাসছিলেন। খেলাটা চলছিল প্রধানতই আমাদের অর্ধে। তাই ওঁরা সকলেই এগিযে আক্রমণে চলে এলেন। ধরেই নিলেন কলেজ টিমের আক্রমণের জন্যে জমা শক্তির কিছু মাত্র অবশিষ্ট নেই। নিজের টিমের রাইট আউটকে প্ল্যান দিলাম। দুজন এগিয়ে থাকুন! বল দেবো ওঁদের দলের মাথা পার করে। যেমন পরিকল্পনা তেমন কাজ। অরক্ষিত ডিফেন্স ভেদ করে মুহূর্তে একটা গোল হয়ে গেল! জয়, জয়। নিশ্চিত জয়, কারণ শেষ বাঁশি সমূহ ছিল।

আবার 'টক্ অব দি টাউন'। কলেজে স্কুলে এবং সর্বত্র। প্রদীপ নেভার আগে যেমন শেষবার দপ্ করে জ্বলে ওঠে তেমনি সেদিন সেই মাঠে উজ্জ্বল প্রাপ্তিতে আমার মেঠো জীবন কানায় কানায় ভরে গেল।

কিন্তু বেলুন বেশি ফুলে গেলে কি হয়? তাই হল। আমার আত্ম-বিশ্বাসের বেলুনটি ফেটে গেল পরের মাঠেই। অনেকক্ষণ প্রাকটিস করার পর সুরু হল পেনাল্টি প্রাকটিস। কলেজ মাঠ। ক'একটি শট্ চেষ্টা করেছি; বেশিরভাগই সফল। কারণ ওরা কেউই রেগুলার নয়। একটি ছেলে এগিয়ে এলো। আলোর গতিতে বল ছুটল কোণের দিকে। ডাইভ দিয়ে এক হাতে পাঞ্চ করলাম! হাতে লেগেও বল গোলে ঢুকে গেল। কিন্তু উঠতে পারছিনা কেন? আমার হাত আমার কথা শোনে না কেন? দেখলাম আমার বাঁ হাতটি কব্জি থেকে ঝুলছে! ওরা ছুটে এলো। সহজেই বুঝে গেল ফ্র্যাকচার! সর্বনাশ! সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল। ডাক্তারদের মধ্যে দু'এক জন চিনলেন, ছাত্ররা পরিচয় দিল! দুর্ঘটনার বর্ণনা দিল। ছেলেটি লজ্জায় দুঃখে একেবারেই

ভেঙে পড়েছে। ডিস্ট্রিক্ট প্লেয়ার। তীব্র স্পিড ওর শটে। আমি জানতাম না। আগের আগের শটগুলো যে শক্তিতে আটকেছি তার থেকে বেশি ব্যবস্থা করি নি। মূল্য দিতে হল। তিনমাস হাত প্লাস্টার করা ছিল।

সেই শেষ। মাঠ এখনও আমাকে টানে, তবে ভিতরে প্রবেশের আহ্বান নয়, বাইরে দেখার আমন্ত্রণ মাত্র!

———

গ্রাম-শহর

যখন শুনলাম বাবার সঙ্গে শহরে যাবো তখনকার সেই আনন্দের ছলাৎ ছলাৎ চাঞ্চল্য আমার এখনও মনে পড়ে। মাটিতে আমার পা পড়ে না। এমনিতেই তো ঘর আর বাইরের মধ্যে বাইরেটাই অনেক বেশি টানতো। তাতে আবার শহরের গন্ধ! যায় কোথায়? 'ক্যাটার‍্যাকট'-কি তা তখনও জানি না। চোখের ছানি, তাও আবার কাটাতে হয়? কি করে কাটে? কষ্ট হয় না? রক্ত পড়ে না? এমতো অনেক প্রশ্ন আর সন্দেহ কোথায় যেন, ভেসে উঠেই তলিয়ে যেতো। মনের উপরে চলমান কল্পনার প্রতিরূপের সদাসন্তরণ আথালিপাথালি। শহর তো কল্পনার আর রূপকথার এলাকা। কলকাতাকে চিনি। চিনি মানে হারুকাকা, হাজুকাকা, ছোটকাকা-রা যেখানে থাকেন সেই স্বপ্নের শহর। সেই কলকাতায় নয়। ফরিদপুর শহরে যাবো। আমরা দু'জনে। বাবা আর আমি। তাহলে কি আমি এবারে বড় হয়ে গেলাম? অষ্টম শ্রেণীতেই পেয়ে গেলাম এই স্বীকৃতি? ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াই আর মনে মনে সুদূরের হাতছানি অনুভব করি। একতলা-দোতলায় সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠা নামা করি, মনে হয় পাখনা নেই কেন? দু'টো করে ধাপ লাফিয়েও যেন মন মানে না! দিদির দিকে অনেক গভীর করে তাকাই, বোঝাতে চাই বড় হলেই বড় বলে স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। বড়োর অনেক দায় থাকে, দিদির নিশ্চয়ই তা নেই। তাইতো আমি নির্বাচিত; ওঁরা কি আমাকে মনোনীতও করেছেন? মনের টানে নীত? মেয়ে এবং ছেলের প্রভেদ ততদিনে একেবারে বুঝি না তা তো নয়! তবুও সুযোগ পেলে প্রাধান্য বিস্তার তো প্রকৃতিরই স্বভাব। আর ছোট? সেতো অনেকই ছোট! প্রশ্নই ওঠে না। ছোট বোনের কাছে এমনিতেই আমি ভয়াবহ বলে পরিজ্ঞাত। আমার হাতের শক্তি, দেহের বল, আমার কুবুদ্ধি প্রসূত চৌর্যের সদাসঙ্গী আমার ছোট বোন তো একই সঙ্গে শিহরিত এবং আনন্দিত। তোড়জোড় শেষ হলে একদিন যাবার দিন সত্যিই কাছে এসে গেল। অনেক উপদেশ নির্দেশ আমার উচাটন মনের গভীরে গেঁথে দেবার জন্যে মায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কোনও ঘাটতি ছিল না। গায়ে মাথায় হাত দিয়ে চোখের জলকে অনেক কষ্টে নিবারণ করে তিনি

তাঁর আত্মজ হওয়া সত্ত্বেও তিনটি কড়ির বিনিময়ে ফিরে পাওয়া পুত্রকে নিয়ে অনেক উৎকণ্ঠায়ই দিন কাটিয়েছেন এতোদিন। এবারে চোখের আড়ালে সর্বস্বের সঙ্গে নিজেব যথাসর্বস্বকে পাঠিয়ে দিতে গিয়ে মাঝে মাঝেই কণ্ঠ-রুদ্ধ হয়ে পড়লেন। মন তাঁর যেতে দিতে চায় না, তবুও যেতে দিতে হয়। ছোট্ট করে একটি পত্র লিখে দিলেন তাঁর দিদিকে। (সেই প্রথম জানলাম মা 'চিঠি'-লিখতে পারেন এবং হাতের লেখা দেখে আমার চোখ বড় বড় হয়ে গেল! দিদির হাতের লেখাও ভাল। বহুবার দেখেছি। কিন্তু একবারও ভাল বলে স্বীকার করিনি। কারণ হিসেবে একমাত্র সমালোচনা যা তীরের মতো ছুঁড়ে দিতাম তা 'মেয়েলী', 'গোটাগোটা অক্ষর'। ওটা একটা আবার হাতের লেখা নাকি? আর মায়ের হাতের লেখাটি যেন সজীব, প্রাণবন্ত, ঋজু।)

নির্ধারিত দিনে মা'কে প্রণাম করে, চিঠি সঙ্গে নিয়ে বাবার পিছনে পিছনে রওনা দিলাম স্টেশনের দিকে। প্রায় ছ'মাইল পথ। হাদান সঙ্গে। যে পথ দিয়ে বহুবার যাতায়াত করেছি সেই পথই যেন নোতুন নোতুন ঠেকল। পরিপাটি পোষাকে, শহরের হাতছানি সঙ্গে নিয়ে সবই যেন কেমন অন্যরকম মনে হতে লাগল। চেনা মুখ দেখলেই আমার মুখে একটা গম্ভীর গম্ভীর ভাব আপনা থেকেই স্থির হয়ে যেতে লাগল। দেখেও সকলকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বাবাই উত্তর দিচ্ছিলেন। আমার বয়সীরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকছিল। যারা জানে না তারা অবাক হয়ে পথের পাশেই বা বাড়ির ঢালে থ' হয়ে থেমে যাচ্ছিল। একটা বড় বড় ভাব করে, আমি, এসব যে বড় হয়ে যাওয়া ছেলের দায়িত্ব তা, নিজের পদচালনায় এবং চোখেমুখের হাবভাবে পরিষ্কার করে তুলতে সদাই সচেষ্ট ছিলাম।

গ্রামকে ক্রমশ পিছনে ফেলে অপরিচিত এলাকায় ঢুকে পড়তে বেশি সময় লাগে নি। রাস্তাব পাশের খাল, পথের বাঁক আর আবার একটা গ্রাম। দেখতে দেখতে, সঙ্গে সঙ্গে, পাশে পাশে যেতে যেতে কখন যে নিকটকে হারিয়ে ফেলেছি, চলার শক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলেছি তা বুঝি নি। নিঃশব্দে চলেছি। পায়ে চলা গতির একটা যান্ত্রিক বেদনা বোধ আছে। সেই প্রথম তা অনুভব করলাম। কেমন যেন একা একা মনে হতে লাগল। সে কিছুক্ষণ মাত্র। একটু বসলে হয় না? হাদানের কাছে নিজেকে মেলে ধরলাম।

সামনের গ্রামে একটু বসা যাবে। সিদ্ধান্ত। কষ্ট হচ্ছে? বাবার প্রশ্ন। না, তেমন নয়। তার পরের রাস্তাগুলো অন্যরকম হয়ে গেল। বাবা অনেক কথা বলতে বলতে আমাকে জাগ্রত করে রাখলেন। মাদারীপুর এবং পালং, গোপালগঞ্জ এবং বরিশাল। যাবার পথের অনেক বর্ণনা বিবরণ দিলেন। জলপথ, স্থলপথ, ট্রেন, স্টিমার, নৌকো। সেই প্রথম বাবার একান্ত পাশটিতে চলতে চলতে তাঁকে যেন অনেক কাছে থেকে দেখতে আরম্ভ করলাম। এর আগে আমাদের হেডমাস্টারমশাই-এর সঙ্গে একাধিকবার মামা বাড়ি গেছি। একা একা! কারণ তিনি যে হেডমাস্টার। গৌর কান্তি, বড়-বড় চোখ, রাশভারী। আমরা ছাত্ররা কোন ছার, শিক্ষকরা পর্যন্ত তাঁকে প্রভূত ভয় এবং অত্যন্ত সমীহ করতেন। তখন বারে বারেই মনে ভয় হত যদি কোনও পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করে বসেন? ছাত্র হিসেবে তো আমি বহুগুণান্বিত! ভয় তাই সমধিক। তবে ভরসা ছিল এই যে তিনি নবম শ্রেণীর নিচের ক্লাস নিতেন না। সে সব মামাবাড়ি যাওয়াগুলোও তাই একা একা, সন্তর্পণ ছিল। একটা দূরত্ব সদাসর্বদাই যাত্রীদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করেই থাকত। হেডমাস্টারমশাই-এর তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ ছিল না, আমার কোনও অসুবিধা বোধ ছিল না। একটা অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা হয়ে আমি তাঁর পিছন পিছন চলতে থাকতাম। মামাবাড়ির মাইলখানেক দূর দিয়ে তাঁর বাড়িতে যাবার মেঠো পথটি লম্বমান ছিল। আমি একটা কথায় সুতোটা কেটে দিয়ে দৌড় দিতাম ঃ আমি যাই?

কিন্তু এই কাশিয়ানী স্টেশনের পথে ডাইনে-বাঁয়ে সবুজ ক্ষেতের আল পথে চলতে চলতে বাবার চেষ্টায় অনেক সহজ হয়ে তাঁর পাশে পাশে চলতে লাগলাম। এটা কিসের ক্ষেত, ওটা কিসের, এটা কি গাছ, ওটা কি জিনিস? এই সব শত প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে তিনি আমাকে উৎকর্ণ করে তুলতে পেরেছিলেন। কখন কোন ফসল চাষ হয়, কখন তোলা হয়, কার ফলন কত, কে কত মূল্যবান, এমতো চাষ আবাদের কথা, এবং আরও অনেক অনেক কথা বলতে বলতে বাবা আমাকে বইপত্রের বাইরে যে জানার জগৎ সেখানে টেনে নিয়ে গেলেন। আমার আগ্রহ বাড়ছিল। এবারে এটা কি ওটা কি করে আমি সজীব হলাম। পথটা যে কখন শেষ হয়ে গেল তা টের পাবার আগেই থমকে গেলাম! অনেক দূরে সর্পিল গতিতে নাকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে

একটা ট্রেন যাচ্ছে। বাবা বললেন ওই ট্রেনটাই ফিরতি পথে আমাদের নিয়ে যাবে। ওটা ভাটিয়াপাড়া, শেষ স্টেশনে, যাচ্ছে। সামনে দীর্ঘ বিস্তৃত মাঠের ছোটবড় গাছ-গাছালির আড়ালে চলমান ট্রেন যে দেখেনি সে ট্রেনের গতি সৌন্দর্যই দেখেনি। আর তাছাড়া ট্রেনেব পিছনে যে গ্রাম, যে ঝোপঝাড় একটা আঁকাবাঁকা আকাশ-রেখা তৈরি করে রাখে সেই গাঢ় সবুজ পর্দার সামনে দিয়ে তার সরু-দীর্ঘ শরীরটা মসৃণ চলনে দ্রুত সামনে এগিয়ে যায়, ফাঁকে ফাঁকে পিছনের আবছা সবুজ ঝলকে ঝলকে দেখা দেয় আর হারিয়ে যায়! সে এক অপূর্ব ছবি। বাবা পিছন ফিরে আমাকে ডেকে নিলেন। আমি যে কতক্ষণ স্থানুর মতো নিশ্চল দাঁড়িয়েছিলাম তা বুঝতে পারিনি। ট্রেন চলে গেল। সম্বিৎ ফিরে এলো। বাবার ডাকে দৌড়ে ওঁদের ধরে ফেললাম। নোতুন করে প্রাণ এলো। এবারে তাড়াতাড়ি যাওয়া আমার ইচ্ছা। কতক্ষণে রেল লাইনের ধারে যাব। পথ যেন আর শেষই হয় না!

এখনও যখন সেই প্রথম রেল লাইন দেখার দিনটির কথা মনে পড়ে তখনই পথের পাঁচালীর অপু-দুর্গা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শেষ ঝোপটি পার হলেই যখন রেল লাইন ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এসে যাবে বলে মনে হচ্ছিল তখন অত্যন্ত বেরসিক দানবের মতো সামনে পড়ল রেলের জন্যে মাটি কেটে নেওয়া ছোট-বড় খালের অন্তরাল। মাঝে মাঝে পথ ছিল তাই রক্ষে। এক দৌড়ে লাইনের ঢালে। বাবা বললেনঃ অদূরে ঐ পোস্ট-এ কান পাত, আর কি শুনতে পাও বল। কান পাততেই বিস্ময়, শুধু বিস্ময়। একটা যান্ত্রিক কিন্তু মিষ্টি শব্দ। শব্দ নয় তো গান, গান নয় ঝংকার। একটানা শোঁ-শোঁ করা একটা সিমফনি। যেন বহু বাদ্যযন্ত্র একই সঙ্গে সুর-সাধনায় নিমগ্ন। কান আর সরাতে ইচ্ছে করে না। একান ওকান করে করে কান ব্যথা করে ফেললাম। তৃপ্তি আর হতে চায় না। বোঝা নামিয়ে হাদানুও একবার কানের সুখ করে নিল। বাবার মুখে সন্তুষ্টির স্নিগ্ধ হাসি। আমার যে কী ভীষণ ভাল লাগছিল তা বলা সম্ভব নয়। বিশেষ করে এই যিনি অজানা-অচেনা জগতের মধ্যে আমাকে হাত ধরে নিয়ে এলেন, পথ নির্দেশ করে আনন্দের অভিজ্ঞতার স্বাদ পাইয়ে দিলেন তিনি আর কেউ নন, আমার বাবা। বাবাকে একেবারেই অচেনা লাগল, নোতুন ব্যক্তিত্বে, উন্মেষিত মাধুর্যে। এক মুহূর্তেই বাবার অনেকটা কাছে চলে এলাম।

রেল লাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সামনে পিছনে দেখতে বললেন। এগিয়ে গেলাম। মাঝখানে দাঁড়ালাম। আর এ-কি দেখলাম? কি করে গাড়ি যাবে? লাইন যে সরু হতে হতে বিন্দুর দিকে চলে যাচ্ছে? গাড়ি পড়ে যাবে না? বাবা অনেক ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন। কেন রেলপথ উঁচুতে হয়, কেন পাথর বিছানো দরকার, কেন দু'টো রেলের সংযোগ রেখা একটু ফাঁক রাখা হয়। এ মতো আরও কত কি? আমার মনের মধ্যেকার অনেক প্রশ্ন অনেক সন্দেহ এক এক করে প্রশ্ন হয়ে বাবার উত্তরের জন্য মুখ বার কবতে লাগল। তার পরে বালসুলভ চপলতায় কখনও রেলের লোহার উপর দিয়ে সার্কাসের ভঙ্গিতে হেঁটে হেঁটে, কাঠের স্লিপার গুলোর উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে একসময়ে স্টেশন দেখতে পেলাম।

কাশিয়ানী বিরাট বাজার সংলগ্ন রেল স্টেশন। পুরু শনের চালা। অনেক বড় আটচালাগোছের, সুপরিসর। বসার জায়গা আছে। সব থেকে ভাল লাগল ঠান্ডাজলের সংরক্ষণ ব্যবস্থা দেখে। বেশ নিচু প্লাটফরম। উঁচু প্লাটফরম তো এই সেদিনের কথা। গাড়িকে চওড়া করে সিঁড়িকে অপ্রয়োজনীয় করে তবেই তো প্লাটফরম উঁচু হল। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার অনুবত নে।

মনে আছে অনেক নুড়ি কুড়িয়ে সংগ্রহ করেছিলাম। বিভিন্ন আকারের মসৃণ সব পাথর। কি করে এগুলো এমন হল? বাবা তখন বুঝিয়ে বলেছিলেন। স্টেশন, স্টেশনের বসার জায়গায় বসার ব্যবস্থা, বাইরেটা, একা একা গাছেদের ছাতামাথায় একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহারাদার পাহারাদার অস্তিত্ব, দূরে স্টেশন মাস্টারের বাসস্থান, সামনের বাগান, ছেলেমেয়েদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চেহারা—সব দেখে দেখে কেমন যেন নেশা নেশা অভিজ্ঞতা হচ্ছিল। বাবা বোধহয় আমার চলাফেরা, চোখের ভাষা বুঝেছিলেন, বলেছিলেন আরও কত নোতুন দেখতে পাবে, কতো বিস্ময়, কতো অবাক করা অভিজ্ঞতা। সে সব যদি মনে করে রাখতে পার তবে সে হবে তোমার সংগ্রহ। নুড়ি সংগ্রহ তখন অত্যন্ত চপলমতি কাজ বলে মনে হবে। তখন বুঝি নি, কিন্তু জীবনের পাতাগুলো যেমন যেমন উল্টে গেছি তেমন তেমন বাবার কথার সত্যতা যেন প্রাণবন্ত হয়ে বারে বারেই স্মরণের সজীবতায় সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সত্যি, বর্ণে বর্ণে সত্যি; বাবার কথাগুলো সর্বপর্বেই সত্যি ছিল।

ট্রেন আসার ঘোষণা যে অত তীব্র তা আগে জানা ছিল না। স্কুলের ঘন্টাও তীক্ষ্ন; কিন্তু সেখানে মাস্টারের এবং ক্লাসের ভয় তার তীব্রতাকে বাড়িয়ে তোলে। স্বাভাবিক। কিন্তু একটা বিশেষ ছন্দে সেই ঝোলানো কম্পমান লোহার দ্বিমুখী রেলে যখন অন্য একটা লৌহদণ্ড দিয়ে সেই বিশেষ ছন্দটি রূপ পেল তখন এক দৃষ্টে সেই দিকে অনেকক্ষণই তাকিয়ে ছিলাম। শব্দ ঝংকার ঘন্টাবাদকের সঙ্গে শেষ হয়ে গেল না, রিন রিন করে চারপাশে অনুরণন সৃষ্টি করেই চলছিল। শেষ হয়ে গেলেও মনে হল শেষ হয় নি বোধ হয়। স্টেশন চত্বরে নড়াচড়ার কর্মমুখরতা ক্রমশই বাড়তে লাগল। বাবা বললেন—টিকিট কাটার ঘন্টা।

শেষকালে একসময়ে হুড়মুড় করে ট্রেন এসে পড়ল। স্টেশন থেকে একটু দূরে গিয়েই একটি বাঁক তৈরি হয়েছে। আমার যে কি খারাপ লেগেছিল তা বলে বোঝানো যাবে না। একদৃষ্টে ট্রেনের আসার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কিছুদূর গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে, বাঁকের জন্যে, লাইনটি হারিয়ে গেছে। একসময়ে বাবা বললেন—ট্রেন আসছে। তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। বললেন, শব্দ শুনতে পাচ্ছ? কান খাড়া করে উৎকর্ণ হলাম। অচেনা একটা গুরু গুরু শব্দ টের পাচ্ছিলাম অবশ্যই। কিন্তু কে জানে ঐ শব্দই ট্রেনের কিনা? প্রথমে ধোঁয়ার আভাস আকাশের গায়ে গাছের মাথা ছাড়িয়ে। তার পরে সেই কালদৈত্য ঝক্-ঝক্ ঝক্-ঝক্ করে একেবার যেন ঘাড়ের উপর হুড় মুড় করে এসে গেল! যদি কাত হয়ে, টাল খেয়ে পড়ে যায়? ভয়ে আমি বাবাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। আমার প্রথম ট্রেন দেখাটা বাবার কোলে মুখ গুঁজেই সমাপ্ত হল।

বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছিলাম তখন মনের কোণে একটা তির-তির ভয় ছিল: বাবার সঙ্গে একা একা যেতে হবে। তা সেই ভয়টা হারিয়ে গেছিল উত্তেজনার অহর্নিশ আনাগোনায়। তলিয়েই ছিল। মাঝ পথে দু'একবার সে মাথা তুলে শিং নাড়া দিয়েও ছিল। তখন হাদান ছিল সঙ্গে। এখন ট্রেনে উঠে বসার পর মনের সেই ভয়টা যেন আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। পালিয়ে গেছে বাবার মনের যে ছোঁয়াটা পেয়েছিলাম তারই তাপে বোধহয়। ট্রেন ছেড়ে দিলে হাদান দূরে সরে যেতে লাগল। একসময় গোটা পিছনটাকেই হারিয়ে সামনের দিকে চোখ গেল। সামনে, পাশে, দূরে, কাছে। ভিতরে

লোকজন, চেনা মুখ বলতে একমাত্র বাবা। বেশির ভাগই গ্রামের। দু'চার জন একটু চকচকে। নিশ্চয়ই কাশিয়ানীর। সেই সব অচেনা অজানার ভিড় থেকে গ্রাম্য স্বভাবের তাড়নায় বাইরেটাকেই বেশি আপন বলে মনে হল। জানালার বাইরে যে জগৎ তাই দেখতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ ধরেই ক'একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বিস্ময় ক্রমশই আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। মনে মনে জানি যে ট্রেনটাই ছুটে চলেছে। কিন্তু ট্রেনের বাইরে এটা কি হচ্ছে? কি ঘটছে? এ জানালা ছেড়ে গুঁটি-গুঁটি ওপাশের জানালায় গেলাম। একই ব্যাপার! ট্রেনের ঠিক নিচেটায় দেখছি তো বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছি ট্রেনটাই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ঘাস-মাটি-পাথব ছড়ানো রাস্তাটা আবছা-আবছা হয়ে পিছনেব দিকে অক্লান্ত ছুটে ছুটে যাচ্ছে। একটু দূরে মাটি-কাটা খাল, খালের ধারের ঝোপঝাড়গুলো সেই তুলনায় বেশ আস্তে আস্তে যাচ্ছে। মাঠের মধ্যে তালগাছ, শেওড়াগাছ. হিজল গাছগুলো যেন টুপি মাথায়, ছাতা কাঁধে অনেকটা আমাদের দিকেই, আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছে। তাই কি? আর একটু দূরের গ্রামগুলো, সেখানেব ঘন-সবুজ ঝোপঝাড়গুলো তো পাল্লা দিযে ট্রেনের সঙ্গে, কিন্তু মনে হয় যেন আগেই, দৌড়ে যাচ্ছে। কাছ থেকে দূবে আবার দূর থেকে কাছে চোখ সরাতে সরাতে কেমন যেন নিজের মাথাটাই নির্বোধের মতো হাল্কা ঘুরপাক খাচ্ছিল। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কেন এমন হচ্ছে? কেন এমন হবে? চোখ ভাল করে বগড়ে আবার সেই বাইরেটাকেই দেখতে লাগলাম। বাবা বোধহয় আমাকে অনেকক্ষণই লক্ষ্য রেখেছিলেন। বললেন: প্যারাল্যাক্স। বুঝিয়ে দিলেন অনেক কবে। আমি কি ক্রমশই বড় হয়ে উঠতে লাগলাম? অজানার জগৎ জানার এলাকায় এসে গেলে কি যেন একরকম আনন্দ হয়, কি যেন একটা উত্তরণ ঘটে। মন সম্পন্ন বোধ করে। বাবা কতো জানেন। আমি কিছুই জানিনা! কিছুই জানা হয়নি।

বাইরের ঘূর্ণমান মাঠ-প্রান্তর, খাল-বিল-গ্রাম, একপেয়ে তালগাছ আর দলবদ্ধ ঝোপঝাড় যেন আমাকে পেয়ে বসেছে তখন। একদিকে ট্রেনের চাকায় আর লোহার রেলে একধরনের ছন্দ-ঝংকার অন্যদিকে গ্রামবাংলার মাঠ-ঘাট-জলাশয়, ক্ষেত-খামার-চাষবাস, জাল-জেলে, উদোম শিশু আর হাঁটু-কাপড়

শালুক-তোলা মায়েরা মেয়েরা—সব মিলে আমি যেন এক অন্য জগতে অন্য চেতনায় অন্য মাধুর্যের নেশাগ্রস্ত অনুভবে নিমগ্ন! ভাল লাগা যে এতো ভাল লাগে তা আগে আর কখনও এমন করে অনুভব করি নি! পাখি তো কতোই উড়তে দেখেছি এর আগে। কিন্তু এই চলমান ট্রেনের জানালায় সেই পাখির আঁকা বাঁকা উড়ে যাওয়া যে একটা কবিতা তা আগে জানা হয় নি। কোনও পাখি হঠাৎই উড়ে গেল, একা একা অথবা ঝাঁক বেঁধে, কোথায়ও চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে বিলের পাড়ে একে একে সুশৃঙ্খল ভাবে টুপ টুপ করে বসে যাচ্ছে, আবার কোথায়ও স্বল্প জলে অতি সন্তর্পণে দীর্ঘ-পদ বক্ মাছের জন্যে উন্মুখ, শনৈঃ গতি স্থির দৃষ্টি! দেখছি আর দেখছি। অনন্তকাল ধরে যদি এই প্রকৃতির বৈচিত্র্যই শুধু দেখা যায় তাহলেও বোধহয় তৃপ্তি আসে না।

গ্রামের মধ্যে মাইলের পর মাইল হেঁটেছি। সেই মন্থর গতিতে যে প্রকৃতি চোখে ধরা পড়েছে সেই সব দৃশ্যেরই যে এমন একটা মধুর মধুর মাত্রা আছে তা এই ট্রেনের গতিতে নিজেকে পেয়ে যেন প্রথম ধরা দিল। একই দৃশ্য যে কতো ভাবে দেখা যায়, কতো বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সূচনা করে তা প্রকৃষ্ট বুঝেছি অনেক পরে। দৃষ্টির মিলন মাধ্যমে বাইরের জগতটা যে এমন বর্ণে ছন্দে তাৎপর্যে মনের গভীরে প্রবেশ করে, একাত্ম বোধ তৈরি করে, আপন করে চিনে নেয়, তা সেই প্রথম যাত্রায় বিন্দুপরিমাণ বুঝতে পারলেও, সেই বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ ছিল।

স্টেশনে ট্রেনের থেমে দাঁড়ানোটাও যে একটা মধুর অভিজ্ঞতা তাও সেই প্রথম টের পেলাম। একটা গান শেষ হলে তার রেশ চলে অনেকক্ষণ। একটা ট্রেন থামলে একটা সঙ্গীত থামে, ধীর লয়ে, গতিতে এবং মন কেমন করা ধ্বনিতে। আর সুরু হয় অন্য একটা 'সিম্‌ফনি'। চিৎকার চেঁচামেচি, ওঠানামার শব্দ এবং নির্দেশ উপদেশ, মালপত্রের টানা হেঁচড়া, ছেলেমেয়ের শাসন, স্বামীকে স্ত্রীর নির্দেশ হুঁশিয়ারী, পুত্রের প্রতি পিতার জলদগম্ভীর পরামর্শ, কুলির জন্যে হাঁকডাক, দাম দস্তুরের কিচিমিচি, চা খাবারের ভেন্ডারদের হাঁকাহাঁকি, পানিপাঁড়ের ঘোষণা—সব মিলে একটা ব্যস্ততা যেন এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটে ছুটে যাচ্ছে ফিরছে। এতো সব দ্রুততা ব্যস্ততা গোলমালের মধ্যে একমাত্র নির্বিকার আমাদের ট্রেনটি। তার ঘোড়ার

মতো পা দাপানো নেই, গরু মহিষের মতো ল্যাজে মাছি তাড়ানো নেই। গলায় ঘন্টিও নেই যে নড়ে চড়ে শব্দ তৈরি করবে। একটা ঘুমন্ত দস্যুর মতো অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে একটা সোঁ সোঁ শব্দ। বাবা না বললে বুঝতেই পারতাম না যে ওটা স্টিম ইঞ্জিনের হাঁস্ ফাঁস্। ট্রেনের তো প্রাণ নেই, তাহলে ? বাবা সুরু করলেন ইঞ্জিনের বয়লার কয়লা স্টিম শক্তি এবং এই যন্ত্র দানবের চলন ক্ষমতার ব্যাখ্যা। গোগ্রাসে সেই সব গলাধঃ করলাম। গ্রামে বেড়ে ওঠা আমার জ্ঞানের মরা গাঙে নোতুনের জোয়ার তীব্র অনুভব নিয়েই প্রবেশ কবতে লাগল। আগ্রহী ছাত্র পেয়ে পিতা-শিক্ষকের ধৈর্য অনেক বেড়ে গেল। আমি সম্পন্ন হতে লাগলাম।

ট্রেন যাত্রায় গোধূলি পর্যন্ত ঠিক আছে ; রাত্রি কেন হবে ? বাইরেটা চোখ থেকে হারিয়ে গেল, ভিতরটাও আবছা, অপরিষ্কার আলোআঁধারিতে ছেয়ে গেছে, পরিচয়ের আলোটুকুও গড়ে ওঠেনি ! কি বিষম কষ্ট। অন্ধকার কি বেদনার বার্তাবহ ? ভয়ের ? নিজেকে হারানোর ? কে জানে চোখের কাজ যখন ফুরিয়ে যায় তখন মনের মধ্যে শত শত অজানা অচেনার ভিড় বেড়ে যায় কি না ? আমার হয়েছিল ! মুখ ঘুরিয়ে শরীরটাকে ঘষটাতে ঘষটাতে বাবার একেবারে কাছটিতে টেনে নিয়ে গেলাম। ভয় করছে ? মা'র জন্যে মন কেমন করছে ? সাথীসঙ্গীদের জন্যে ? কোন উত্তরই দিতে পারলাম না। সবই ঠিক আবার ঠিক নয়ও। অন্ধকারে আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। বাবা বলেছিলেন : অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না বলে কান এবং মন অনেক বেশি সচল হয়ে ওঠে। রাজারা কান দিয়ে দেখেন বলে সংস্কৃতে বলা আছে। কানের একটা নিজস্ব সৃষ্টিশীল জগৎ আছে। তাকে যদি দেখতে পাও, প্রত্যক্ষ করতে পার তাহলে জানবে অভিজ্ঞতার অন্য একটা সিংহদ্বার তোমার কাছে খুলে গেল। যারা অন্ধ তারাও তো এই জগতটাকেই দেখে। কি করে ? আবার মন চঞ্চলও যেমন স্থির লক্ষ্যও তেমনি। মুনিঋষিরা মনকে একাগ্র করে সাধনা করেন। আবার আমরা, চঞ্চলমতি দৈনন্দিনের আমরা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সরে সরে যাই, খুঁজে খুঁজে বেড়াই। অন্ধকারকে ভয় না পেলে সে তার গহ্বর থেকে তোমার জন্যে প্রত্যক্ষের মণিমুক্তার ভাণ্ডার তোমার মনের সামনে তুলে ধরতে পারে। দেখায় যেমন চোখ লাগে, শোনায় তেমনি কান লাগে। আরও অনেক কথা বলেছিলেন। আমার কেমন কঠিন কঠিন

লেগেছিল। তবুও অনেকক্ষণ বাবার কথা শুনতে শুনতে একটা যেন কেমন পরিবর্তন হচ্ছিল মনে মনে। কামরার মধ্যের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে-শুয়ে থাকা সহযাত্রীদের কোনও কথাই আমার আগে কানে যায় নি। এখন যেন সে সব কথা-বার্তা, সেই সব উচ্চারণগুলো প্রাণ পেতে লাগল।

বাইরের দৃশ্য হারিয়ে যেতেই আমি অসহায় হয়ে না পড়লে শব্দের জগতকে ঘনিষ্ঠ করে পেতাম। সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্যছন্দ মনকে মোহময় করে রেখেছিল। তাই দৃশ্যহীন সঙ্গীতকে অর্থহীন বলে ভুল করে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। ধীরে ধীরে ট্রেনের চলমান শব্দ, কোথায়ও ব্রীজ-পার হবার ছন্দে কোথায়ও প্রান্তর পার হতে গিয়ে উদাস-উদাস হাল্কা হাল্কা গতিশব্দ আবার হঠাৎ হঠাৎই 'সম বা যতি'র মতো ঝোপ-ঝাড়-বাড়ি-ঘরের নৈকট্যজনিত চাপা-চাপা সাঁই-সাঁই শব্দ। সব যেন এখন ধীরে ধীরে আমার 'দেখার' মধ্যে ধরা দিতে লাগল। ট্রেন যেন চলতে চলতে তার ডাইনে-বাঁয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আত্মীয় স্বজন, পরিবেশ পরিজনদের সঙ্গে প্রতিনিয়তই কথা বলে, আলাপ করে, কুশল বিনিময় করে ছুটে চলেছে। ওদের সকলকেই যেন একেবারে আলাদা আলাদা করে চিনে নিতে পারছি। নোতুন করে পরিচয় হতে লাগল বাইরের সঙ্গে।

ভিতরেও নোতুন উদ্ভাস আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। দিনের বেলায় যাদের দেখেছি তাদের চিনতে পারিনি। এখন ছবিটা যখন নেই তখন যেন ওদের একে একে চিনতে পারছিলাম। কোনও ন্যাওটা ছেলেকে কোলের মধ্যে চেপে ধরে কোনও মা থাপড়িয়ে থাপড়িয়ে গুন গুন করে ঘুম পাড়াচ্ছেন। অতি পরিচিত সেই 'দৃশ্য'। পিতাপুত্রে জমি জিরেত নিয়ে নিম্নস্বরে আলাপ চলছে। অপরিচিত কিন্তু নোতুন বিষয়, নোতুন দিগন্ত। ভাই বোনে মৃদু খনসুড়ি চলছে। হৃদয়ের তাপে চেনা। একটুখানি শোয়ার জায়গা পেতেই, অথবা কে জানে, যেমন-আছে-তেমন অবস্থায় দূরে কোথায়ও নাকডাকার শব্দ। যেন ট্রেনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। হঠাৎই কোনও ক্ষুধার্ত সন্তান তীক্ষ্ন চাপা কণ্ঠে তার ক্ষুধার কথা ঘোষণা করল। সব মিলে যে জীবন-প্রকাশ সেই চার দেওয়ালের গতিশীল কক্ষে অনুক্ষণ সরব-সচল প্রকাশে অন্ধকারকে জীবন্ত করে তুলছিল তা যেন আমার মনকে বেশ আকর্ষণ করতে পারছিল। বাবা যে সারাক্ষণই চুপ করে বসে আছেন তা

কি এই জন্যে যে তিনি তাঁর সকল ইন্দ্রিয় এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে একসাথে এবং আলাদা আলাদা জানা-শোনা-দেখায় সদাব্যাপৃত রাখেন বলেই ? হতে পারে। তাই আমার আর ভয় ভয় ভাবটাও রইল না, একা একাও নয়। আমি হঠাৎই বেশ বড় হয়ে গেলাম বলে মনে হতে লাগল।

কখন শুয়ে পড়েছিলাম, কখন ঘুমিয়েছি এবং কখন কোন ফাঁকে যে নিজেদের বাড়িতে মা'এর পাশে পাশে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিলাম তার কিছুই আমার জানা ছিল না। হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচিতে, হাঁক-ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়্-ফর্ করে উঠে বসলাম। কি যেন একটা বড় স্টেশন হবে। বাবা বললেন কালুখালি জংশন। কত রাত তখন তা বুঝে ওঠা আমার সাধ্যের বাইরে। তবে আলোয় আলোময় স্টেশন, চারদিকে অত রাত্রেও অনেক যাত্রীর ছুটোছুটি, নড়াচড়া, মালপত্রের ওঠা-নামা, কুলিদের হাঁক-ডাক, আর সব ছাপিয়ে হঠাৎ কানের কাছে অনেক দূর থেকে ভেসে আসা গভীর শব্দের উচ্চারণ 'চা-আ-আ'! আমাদের বাড়িতে আমার জিতেনদার গানের শখ ছিল। ছিল একটা হারমনিয়ম্। কখনও একা একা হারমনিয়মটা পেলে তার প্রথম রীডে এবং শেষ রীডে চাপ দিয়ে 'বেলো' করতে আমার ভীষণ ভাল লাগত। প্রান্তিক স্বর। একটা গম্ভীর ভারি, অন্যটা তীক্ষ্ণ সরু। এই প্রথম মনে হল যেন হারমনিয়মের প্রথম রীডটি চেপে ধরতেই 'চা' ধ্বনিটি বেরিয়ে এলো। পরের জানালায় যখন সেই একই স্বর ধ্বনিত হল তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম মানুষের কণ্ঠস্বর এমনও হতে পারে ? 'চা'-ডাক পরে আরও শুনেছি। কিন্তু প্রথম শোনা কালুখালি স্টেশনে গভীর রাতের বিস্ময়কর চেতনার হদিস্ আর কখনই তেমন করে পাইনি।

স্টেশনের বাইরেটা যেন কোনও ভূতুড়ে এলাকা। বড়-বড় আলোগুলোও যেন অন্ধকারের ভয়ে ক্ষীণ হয়ে গুটিশুটি মেরে গেছে। ভুস্ ভুস্ আর ইঞ্জিনের স্টিমের ফ্যাঁস্ ফোঁস্, তীব্র হুইশ্‌ল্-এর চিৎকার, কয়েকবার অত্যন্ত দ্রুত চাকা-পিছলে যাওয়া মতো শব্দ করে কোথায় কোন ইঞ্জিনের বা ট্রেনের ক্রমশ এগিয়ে চলার চেষ্টা। ঠুলি-পরানো একচক্ষু একধরনের লণ্ঠনের দুলে দুলে এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্তে চলে যাওয়া, সব মিশে আমাকে একটা 'ঘোরে' পেয়ে গেল। কিছু বুঝি কিছু বুঝিনা। এখানে ওখানে স্তূপ স্তূপ অন্ধকার আর ফাঁকে ফাঁকে তীব্র আলোর ঝলকানি। দেখা-না-দেখার

আলো-আঁধারি বোঝা-না-বোঝার আবছা-আবছা অনুভব। বিস্ময় শুধু বিস্ময়! জানালা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, কখন বাবা আমাকে সোজা করে শুইয়ে দিয়েছেন, কিছুই আমাব মনে নেই।

জেগে উঠলাম বাবার ডাকে। ফরিদপুর স্টেশন এসে গেছে। চার ধাবে আলো ঝলমল সকাল। জানালা দিয়ে সূর্যের আলো আমার গায়ে, ট্রেনের মধ্যে। বাইরে তাকিয়ে মনে হল এ কোথায় যাচ্ছি? এতো দালানবাড়ি অট্টালিকার পাশাপাশি ভিড়? বুঝলাম শহব এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাজুকাকার অনেক গল্প প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। ছোটকাকার অনেক বর্ণনা। মনটা আমার নেচে উঠলো। একেবারে জানালার দিকে মুখ কবে আসন কবে বসে যথাসম্ভব 'শহর' দেখতে চেষ্টা করলাম। শহর এসে গেল, শহব! শিহরণ। মন আনচান করা শিহরণ।

কতো প্রথমের বর্ণনা করব? বাবা একটা ঘোড়ার গাড়ি নিলেন। লেখাপড়া না করেই ঘোড়া-গাড়ি চড়া হয়ে গেল। গাড়ি ও চড়লাম, ঘোড়ার টানে পথও চললাম। কিন্তু ঘোড়ায় চড়া? অতশত কূট বিষয় তখন মনে ওঠেনি। ঘোড়ার অধীর পদতাড়না, ঘনঘন উত্তেজিত পুচ্ছ-ব্যজনা এবং একএক ঝটকায় রাস্তায় খুরের বাদ্যিবাজনা সবই আমার কাছে অবাক বিস্ময়ের ব্যাপাব। একবার ডানদিক একবার বাঁদিক করে সোজা-ঝুঁকে সব শহরটাই যেন একবাবে দেখে নিতে চাইছিলাম। বুকের মধ্যে আনন্দের অনুভবগুলো পুটুলি-পুটুলি হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এপাশ-ওপাশ করছিল। যত দেখি তত বিস্ময়, যত বিস্ময় তত আগ্রহ। একটা দীর্ঘ দুলকি চালে খট্-খটাখট্ তালে কোনও একটা ব্রিজ পেরিয়েই সামনে গিয়ে থেমে গেল। আমরা গাড়ি থেকে নেমে দু'পা এগিয়েই মেসোমশাইয়ের আস্তানায় প্রবেশ করলাম।

দোতলায় উঠে গেলাম বাবার পিছন পিছন। মেসোমশাই এগিয়ে এসে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। প্রথম সুযোগেই মায়ের নির্দেশ পালন করতে ভুল করলাম না। ঝুঁকে প্রণাম করলাম। বড়রা কথা বলতে বলতে সিঁড়ি পার হচ্ছেন। উপরে উঠেই সামনে দেখলাম, মাসিমাই নিশ্চয়। সব যেন কেমন ভুল হয়ে গেল। এমন হয়? একেবারে আমার মা যেন সামনে দাঁড়ানো। তাহলে আমার মা'ও কি এ-তো সুন্দর, এতো মা-মা দেখতে? স্নেহ যেন তাঁর

সর্বঅস্তিত্ব দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে আমাকে খুঁজে নিল। আমার সম্বিৎ ফিরে এলো বাবার নির্দেশে। তোমার মাসিমা, প্রণাম কর। ঝুপ করে পায়ের ধুলো মাথায় নিলাম। নিজেকে মাতৃ নির্দেশ লঙ্ঘনকারী কুলাঙ্গার বলে মনে হল। কেন ভুলে গেলাম? সেকি আমার দোষ? মাসিমা কেন অমন হলেন, অমন স্বতঃ স্নেহময়ী? কেন আমাকে ভুলিয়ে দিলেন আমার প্রাথমিক কর্তব্য? প্রণাম শেষ হতে না হতেই দুহাত দিয়ে আমাকে আদর করে তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন। আগে হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও তারপরে কথা। কলতলায় নিয়ে গেলেন। ফিরে এসে দেখলাম আমার জন্যেই শুধু নয় আমাদের সকলের জন্যেই জল-খাবারের ব্যবস্থা পরিপাটি সাজানো।

মাসিমার কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। হয়নি। দু'টি মেয়ে। মঙ্গলাদি, সাগরদি। আমার ল্যান্ডিং-বিষয়ে অন্যত্র বলেছি। এতোই বিলম্বিত সেই অবতরণ যে তা আর বলে কি বোঝাবো। আমার দেহটি যখন সবেমাত্র অনুভূমিক থেকে ভূমিলম্বে রূপান্তরিত তখন আমার জ্যেঠতুতো দাদার এবং দিদির প্রথম সন্তানরা সেজেগুজে স্কুল ছাড়িয়ে বৃহত্তর জগতের হাতছানি অনুভব করছে! মাসতুত বোনেদের সন্তানরাও কেউ পিছিয়ে নেই! জন্মসূত্রে অন্যান্যদের তুলনায় এতো 'বেঁটে' হয়েই জন্মেছি যে দাদাদের কাকা, দিদিদের মাসি, আর ভাইপো-ভাইঝি, বোনপো-বোনঝিদেরই ভাইবোন দাদা দিদি বলতে ইচ্ছে হত! এর জন্যে ওদের কেউই দায়ী নয় আমার অবতরণ আলস্যই কারণ। আর, একবার দেরিতে সুরু করে সারাটা জীবনই সব ব্যাপারেই লাইনের একেবারে পিছনেই থেকে গেলাম! সকলের যখন সব শেষ তখন আমার সুরু হত। এতোই কষ্ট হত সে সব কথা ভেবে যে এখনও তা স্মৃতি-কণ্টক হয়ে বেদনা-বিদ্ধ করে।

আমাকে পুত্রাধিক আদরে আপন করে নিলেন। মাসিমা, মেসোমশাই। দু'জনেই। আমার ভিতরের গ্রাম্য আমিটা কেমন যেন সব দেখেশুনে হকচকিয়ে গেল। একটা বন্য আমিও ছিল আমার মধ্যে। সেটাকে যেন আর খুঁজেই পাচ্ছিলাম না। পরিবেশ কি এতো বড় প্রভাবশালী? গৃহের ভিতরটা টানটান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, গোছানো গাছানো বাইরেটাও তেমনিই। বাথরুম পায়খানা, নিচের কলতলা, দাওয়া। একটু বেরিয়েই পিচঢালা রাস্তা। সটান সোজা

দূরের অজানা আকর্ষণে যেন সদাই প্রাণবন্ত। উপরের বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সচল পথের জীবনকে যেমন নোতুন করে দীর্ঘসময় ধরে দেখার সুযোগ হচ্ছিল, তেমনি দু'একদিন যেতে না যেতেই একেবারে ধারে গিয়ে, পাশে দাঁড়িয়েও সেই গতিময় সদা চলমান জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে পারছিলাম। আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন যেন বেশ গুন-গুন করে তার সচেতন ঘটমান বর্তমানকে জানান দিচ্ছিল। গ্রামের চোখে শহরকে দেখছিলাম আর শহরের দৃষ্টিতে গ্রামকে। ফেলে আসা জীবন, সেই মাঠ-ঘাট, জল-জঙ্গল, জমির আল আর ঘাসের সবুজ। সেখানে আমার মা, মায়ের যত্ন আর শাসন, স্নেহের প্রকাশ আর শৃঙ্খলার চাপ, বন্ধু বান্ধব ভাই বোন, সেই পুকুরঘাট ঝুপঝুপ স্নান আর খাতাবই হাতে দৈনন্দিন গুরুভার—সব যেন পিছনে টানতো। আবার কখন যেন বর্তমানের মোহময় শহুরে জীবনের মধ্যে একেবারেই তলিয়ে যেতাম। মাসিমার স্নেহ ভালবাসার পরিবেশ, আদর আপ্যায়নের আন্তরিকতা, আশেপাশে ধোপদুরস্ত পরিচ্ছন্ন জীবনের গতিময় সরলতা, বই পত্র থেকে অনাবিল ছুটি, পরিপাটি আহার-বিহারের দিনান্ত ব্যবস্থা, দিন-রাতের প্রভেদ ঘুচিয়ে গ্যাস লাইটের দ্যুতি—সব যেন কেমন মায়াময় করে আমার অনুভবে আনন্দের শিহরণ তুলতো। প্রথম প্রথম বারে বারেই নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। মাসিমার স্নেহাঞ্চলখানিই ছিল তখন একমাত্র আপন। ধীরে ধীরে নিজেকে, মাকে এবং মাসিমাকে নোতুন করে জানতে পারলাম। তুলনা আর প্রতিতুলনা। একই মায়ের দুই সন্তান, মা আর মাসিমা। একজন সাজাইলের ক্ষেত-খামার-তেজারতির গার্হস্থ্য জীবনে ক্রমশ আমার মা, অন্যজন বাইরে বাইরে চাকুরি জীবনের টানাপোড়েনে স্থান থেকে স্থানান্তরে, এ শহর থেকে সে শহরে ঘুরে ঘুরে অবসর জীবনে ফরিদপুর শহরের আলোক উজ্জ্বল অঞ্চলে আমার মাসিমা। কৈশোর জীবনেরই একটা মোড়ে এসে দু'জনের জীবন দু'টি ধারায় প্রকাশ পেল। কতটা দূরই না তাঁরা সরে গেল চলতে চলতে, কতই না প্রভেদ দু'জনের জীবন যাপনে, মূল্যবোধে, প্রত্যক্ষে ঘটে গিয়ে থাকবে, একজন যা হয়েছে অন্যজন তা হতে পারেনি। আমার মায়ের অবসন্ন অপরাহ্ন ক্লান্তি আনলে ক্ষণিকের জন্যে পানের বাটা নিয়ে বসে অনারব্ধ অবশিষ্ট কাজের জন্যে শক্তির যোগান সংগ্রহ করে। মাসিমার দ্বি-মাত্রিক জীবনে অপরাহ্নই দিনান্ত ঘোষণা করে। রাত্রে ফলাহারের ব্যবস্থা। কথাবার্তা

গল্পস্বল্প একটু-আধটু বেড়ানো-টেড়ানো। সাজাইলের মা কর্ম-মার্গে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, ফরিদপুরে কর্মের সীমান্ত আমার মাসিমা। সেখানে, গ্রামে, মুখমণ্ডলে খরসূর্যের কঠিন ছাপ, কর্মক্লান্ত দিনের ভ্রূকুটিখানা ঝুলে থাকে কপালে। এখানে, শহরে, হাসি-আনন্দের চন্দ্রালোক মুখখানিকে মাতৃমঙ্গল করে তোলে, পরিশীলিত সুশৃঙ্খল সংসার যাপনের তৃপ্তির আভাস ঢেউ খেলে যায় শান্ত-মসৃণ প্রসারিত কপালে। দিনের সব কাজ সুসমাপন করেও মাসিমার প্রচুর উদ্বৃত্ত সময়। মা'এর আমার কাজই শেষ হয় না, সময়ের অভাব যেন সেখানে অর্থের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী! দূরে গিয়ে মাকে আমি অনেক কাছে থেকে দেখলাম। মাসিমার কাছে এসে আমি আমার অনেক গ্রাম্য বিড়ম্বনাগুলোকে চিনতে পারলাম। ওদের দুজনের অত প্রভেদসমূহের মধ্যেও বার বারই একটা ঐক্যকে যেন প্রত্যক্ষ করতে পারছিলাম। দু'জনেই অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্তই মা। মাসিমার স্বভাবে আমি মায়ের প্রতিফলন দেখলাম, আর সেই নোতুন দৃষ্টিতে আমার মা-এর মধ্যেও আমার মা-কে দেখে নিলাম। সেই প্রথম আমার প্রধান শত্রু আমার পরম মিত্র বলে মনে হল। এই পাওয়াটুকু যে কী অসীম সিন্ধুর ব্যঞ্জনা বহন করছিল তা তখন বুঝিনি। এখন বুঝেছি যে এই বিন্দু-পরিমাণেই লুকিয়েছিল আমার ক্রম পরিব্যাপ্ত ভবিষ্যৎ। সে অনেক পরের কথা, পরে বলার বিষয়।

মাসিমা আমাকে এখানে ওখানে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। কখনও কখনও মেসোমশাই-এর সঙ্গেও গেছি। তিনি গল্প বলতেন, প্রশ্ন করতেন, জানতে চাইতেন এবং জানাতে ভালবাসতেন। সারাজীবনের অভিজ্ঞতায় ভাণ্ডার ছিল পূর্ণ। কিন্তু পাত্র হিসেবে আমার না ছিল যোগ্যতা, না ছিল বয়স এবং বোধশক্তি। তাই তার অনেক কথাই অকারণেই হারিয়ে যেতো, হারিয়ে গেছে। লেগে আছে শুধু তার সঙ্গে-সঙ্গে চলতে গিয়ে যে নৈকট্যের স্বাদটি পেয়েছিলাম সেই অনুভবটুকুই। এমনি এক দিন হাঁটতে হাঁটতে একটু বেশি দূর চলে গেলাম মাসিমার সঙ্গে। এতোটা দূরই যখন এলাম তখন আর একটু এগিয়ে স্বামী জগদ্বন্ধুর আশ্রমটা দেখেই যাই—বলে মাসিমা আমার হাত ধরে সেই আশ্রমে নিয়ে গেলেন।

দূর থেকে মনে হল একটা ছবি। সুন্দর যেন সবুজ হয়ে ওখানে পাখা গুটিয়ে মন্দির হয়ে, বাগান হয়ে ফুলের পাপড়িতে মঙ্গলের আরাধনায় সাধনা

রত। মন্দির এতো ভাল হয়? এতো সুন্দর? এতো আকর্ষণীয়? আমার সেই কিশোর মনে একটা বিরাট দোলা বারবার ঢেউ হয়ে হয়ে আমাকে উত্তাল করে তুলছিল। অকল্পনীয়, অভাবনীয়! বাগান পার হয়ে মন্দিরের কাছে গেলাম। পথে বাগানের এখানে ওখানে দু'চার জন মুণ্ডিত-মস্তক গেরুয়া বসন সৌম্য-দৃষ্টি সন্যাসীদের দেখতে পেলাম। শান্ত সমাচ্ছন্ন। কেউ বাগানে জল দিচ্ছেন কেউবা তদারকি করছেন, আবার কেউবা একান্ত আপন মনে ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছেন। এই পৃথিবীরই এঁরা? এঁরাই কি ঈশ্বর, ভগবান?

তার পর এই জীবনে অনেক সাধুসন্ত স্বামীজিদের দেখেছি, দেখেছি অনেক মন্দির, মসজিদ্, গীর্জা। তার অনেকগুলি ভাস্কর্যে সৌন্দর্যে সৃষ্টিতে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে অসীমের এবং অনন্তের প্রতিভূ। কিন্তু সেই কৈশোর জীবনে সেই প্রথম দেখা ছোট-শহরের সেই প্রভুজিকে, সেই মন্দিরকে যে কী চোখেই দেখেছিলাম তা আর আজ হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারবো না। সেদিন আমার ছোট্ট মনটাকে একেবারে প্রাণের মূলে নাড়া দিয়েছিল। প্রভুজির প্রধান শিষ্যই বোধহয় আমাদের সাদরে কাছে ডেকে নিলেন। মাসিমাই বোধহয় সেই নৈকট্যের কারণ। অনেকক্ষণই সেখানে আসন করে বসেছিলাম। স্বামীজির সেই দেব-উপবেশন, মুদ্রিত-নয়ন, চারধারে ফুলের সমারোহ, ধূপের গন্ধ, নিঃশব্দ উপস্থিতি এবং মৃদুগতি আনাগোনা সব মিলিয়ে আমার ভিতরের আমিটাকে যেন অবশ করে, নেশাগ্রস্ত করে তুলেছিল।

যখন পূজা এবং আরতি সুরু হল তখন সম্পূর্ণ বাতাবরণটি এক নিমেষেই পাল্টে গেল। আকাশ-বাতাস-বিশ্বপ্রকৃতি যেন এতক্ষণ মৌন-মাধুর্যে এই বিশেষ সময়টির জন্যেই উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিল। মন্ত্র যেন গান হয়ে আদিগন্ত প্রবাহিত হচ্ছিল, প্রতিটি ব্যক্তিই যেন সেই যৌথ-প্রণামে সঙ্গ দিচ্ছিল। আমি আবার হারিয়ে যেতে থাকলাম। নিজেকে যেন আর নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। একটা বোবা অনুভব আমার সমগ্র অস্তিত্বকে ঘুরে ঘুরে অন্য কোথায়ও অন্যকোনও উপলব্ধিতে নিয়ে যেতে চাইছিল।

আচ্ছন্নের মতো মাসিমার সঙ্গে ফিরে এসেছিলাম। সেই প্রভু-সন্ধ্যা যে আমাকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা ওঁরাও বোঝেননি, আমিও বুঝিনি। তার পরে অনেকদিন সেখানে গেছি। অনেক সন্ধ্যায় পূজা-আরতিতে বসে

থেকেছি। বাবার চোখের ছানি কাটা হয়ে গেছে। সেখানে সকালে একবার বিকেলে একবার যাই। তাছাড়া কখনও গোলাপী দিদির বাড়িতেও যাই। গোলাপী দিদি আমার জ্যাঠতুতো দিদি, জিতেনদার ও বড়, প্রথম সন্তান। তার কথা সময়ান্তরে বলা যাবে। কিন্তু সারাদিনটিই যেন আমার কাছে সেই সন্ধ্যার জন্যে অপেক্ষা মাত্র। সব গান যেমন সমে এসে থামে, সব জীবন যেমন ভূমাতে আমারও তেমনি হল সেই জগদ্বন্ধুর আশ্রম। প্রভুতে আমাকে পেল; আমি প্রভুর জন্যে সদাসর্বদাই একমনা হয়ে পড়েছিলাম। প্রধান শিষ্য ছেড়ে এবারে প্রভু-সান্নিধ্য আমার দৈনন্দিন হল। আমাকে একটা ছবি দিলেন, সবসময়ে সঙ্গে রাখার জন্যে। আমার মধ্যে তিনি অনেক কিছুই দেখতে পেয়েছিলেন বলে জানালেন। আমি অভিভূত, প্রভাবিত, অনুধ্যানে নিমজ্জিত।

এবং ক'দিনেই এমন হল যে আমি সকালে-বিকেলে যেতে আরম্ভ করলাম। আমার যেন অন্য কিছু আর ভালই লাগে না। প্রভু আমাকে টানেন, আমাকে ডাকেন। নিশিতে পাওয়ার মতো আমার দিন কাটে না, আমার মন মানে না। প্রভু ধ্যান, প্রভু জ্ঞান প্রভুজি কেবলম্ অবস্থা। বড়রা টের পান না কেন কে জানে? মনে মনে আমি যখন প্রভুসর্বস্ব তখন একদিন বাবা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন। তখনও চোখে তুলোর বান্ডিল তাঁর দৃষ্টিকে আড়াল করে রেখেছে, তখনও পাশে চামড়া লাগানো ঠুলি-চশমা চলছে। সব আকর্ষণ আমার উবে গেছে। মাসিমার মমতামাখা মাতৃমুখ, শহরের কর্মমুখর দিন, আত্মীয় স্বজন, আমার বাবা আমার মেসোমশাই, আমার কৈশোর আমার গ্রাম্য ডানপিটে মন—সব, সব যেন কোথায় তলিয়ে গেছে! একমাত্র ভেসে আছে প্রভুর ছবি, মন্দির, আর একটা মন-উচাটন অনুভব। কোথায় যেন আমার পৌঁছোনোর কথা, কী যেন আমার সামনে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছিল। মনে মনে সব পরিকল্পনা স্থির; দিন, সময় এবং লক্ষ্য নিশ্চিত। শুধু অপেক্ষা।

সেই অপেক্ষা আমার কাজে লাগল না! তার আগেই বাবার চশমা হয়ে গেল, টিকিট কাটা হল এবং আমরা আবার ট্রেনে চড়ে বসলাম। কিসে যে টেনেছিল আর কিসেই যে সে টান খুলে গেল তা আর স্মরণে নেই।

———

॥ নাও চলে দেহ চলে না ॥

জীবনের বিকেল বেলায় এখন প্রায়ই তো দিনের বিকেলটা বিছানার আলস্যে কাটে। সারা জীবন কার্যব্যপদেশে একঘাট থেকে অন্যঘাটে ঘুরেছি, এক নদী ছেড়ে অন্য নদীতে জীবনের তরীখানি বেয়ে বেড়িয়েছি, আর এখন দ্বিপ্রহরের দিবা নিদ্রাটুকু শেষ হলেই অলস ভেসে বেড়াই ভাবনার নাও বেয়ে, চিন্তার দাঁড় টেনে অনুভবের গুণ দুহাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে নদীর পাড় বেয়ে সামনে ঝুঁকে টান টান টেনে চলি। তখন নৌকোর তলায় তলায় সর-সর খল-খল করে জল সরে সবে যেতো, এলাকার পর এলাকা পার হয়ে যেতো. গ্রামের পর গ্রাম। এখন আর সেই যাওটাই হয়ে ওঠে না, বিছানার চাদর কুঁচকে যায়, এ-পাশ ও-পাশ করে আলস্য আর দেহ দুইই যেখানে ছিল সেখানেই ভারি হয়ে অপেক্ষা করে! কল্পনা পাল তুলে দেয়, মন ছুটে ছুটে যায় সেই নাও-এর তর তব বেগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। ফেলে আসা থৈ থৈ জলের দিগন্ত বিস্তার, দিকচক্রবালে সবুজের অসীম সমারোহ আর তারই মাঝে মাঝে কোমর-গলা জলে ডুব দেওয়া দূরের গ্রাম গুলোর থেকে থেকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকা। বিছানার নিষ্প্রাণ দেহে নিজের বয়োভারে ক্লান্ত দেহখানি রেখে মাঝে মাঝেই ছুটে যাই পুরোনো দিনের সেই জল-যাত্রায়! নৌকোর গলুইয়ের নিচে জলের আপ্যায়ন, সেই কুলুকুলু ধ্বনি, ছোট ছোট তরঙ্গের সঙ্গে চলমান পালতোলা নৌকোর কলতান আর এখানে ওখানে কখনও কচুরিপানা ভেদকরার সময়ের পটাস্-পটাস্ প্রতিবাদ অথবা ধানক্ষেতের পাশঘেঁষে যাবার সময় নৌকোর দেহে আর ছই-এর শরীরে লেগে অপসৃয়মান ধানগাছের যৌথ সর-সর, খস-খস, ফিস ফিস বাক্যালাপ—সবাই যেন কেমন বর্তমানকে হারিয়ে দিয়ে সত্য হয়ে ওঠে; টেনে নিয়ে যায় জীবনের সকাল বেলায়, মধুময় করে তোলে ফেলে আসা কৈশোর।

তারপর দীর্ঘদিন বাসে ট্রামে আর ট্রেনে কাটালাম। জীবনটাও যেমন যান্ত্রিক হয়ে গেল, যানবাহন ও তেমনি যান্ত্রিক থেকে গেল। পিছন থেকে হাতছানি দেবার আর কেউ রইল না। কাজ কাজ আর শুধু কাজ; চিত্ত এখন প্রায় বিকল হয়ে যাবার দাখিল। দেখে দেখে, ঘুরে ঘুরে সংসারের এক থেকে

একশো রকমের প্রয়োজনের সংগ্রহে কেটে গেল কম দিন তো নয়! নিজের সংগ্রহে কৈ তেমন কিছুই তো জমা পড়ে নি! যা কিছু জমার ঘরে জমা আছে আজ এই অপরাহ্নে, তার হিসেব করতে গিয়ে বার বারই তো সেই সব অতীতে হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে যে অতীত অনেকদিন আগেই চিরতরে ফেলে এসেছি! বয়সের সব সংগ্রহ গুলোই তো সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে দাঁত খিঁচিয়ে চোখ লাল করে দাঁড়িয়ে আছে। মিস্ত্রি ডাকো সারাই কর, রং ফেরাও, পরিবর্দ্ধন করো, প্রতিপালন করো। শুধু এটা করো আর ওটা কর, লালন কর আর পালন কর, যদি মন পেতে চাও তা হলে সব ব্যবস্থার তদারকি কর, অর্থের যোগান ঠিক কর; সব সংগ্রহগুলোই তো ভিড় করে কাছে দূরে উচ্চাবচ কণ্ঠে ধ্বনি তুলছে—করো করো, দাও দাও। এই সব ব্যস্তসমস্ত নাদ-ধর্মী উপস্থিতির মধ্যে একমাত্র শান্ত পলায়ন, অলস অনুভব আর উজ্জ্বল উদ্ধার তো সেই কিশোর অতীতের অবগাহনে।

একেবারে ছোট বেলায় যখন নৌকো করে বিদ্যালয়ে যেতে হ'ত তখন বাড়ি থেকে পাঠশালার পথ যেন দীর্ঘ মনে হত। তখন নাও চলত, দেহ চলত, কিন্তু মন চলত না। গাড়ি-ঘোড়া চড়ার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সুড়সুড়ি টুকু অকারণেই মাঠে মারা যেতো—গ্রীষ্মে মাঠে আর বর্ষায় জলে মারা যেতো। তখন গাড়ি ঘোড়া ছিল একেবারেই ডুমুরের ফুল; কদাচিৎ কখনও কোনও খুন-জখম-কাজিয়া-দাঙ্গা হলে দারোগা-ম্যাজিস্ট্রেট ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে পেঁছতো গ্রীষ্মের মেঠো পথ ধরে, অথবা নৌকোয় বর্ষার থৈ থৈ জলে বাহিত হয়ে। সেইটুকু গাড়ি-ঘোড়া আমাদের লেখাপড়া করানোর জন্যে বেশ যথেষ্ট ছিল কিনা তা পণ্ডিতজনেরাই বলতে পারবেন। তার চাইতে বেশি জাগ্রত দেবতা ছিলেন টেবিলে রাখা থার্ড মাস্টারের তৈলাক্ত বেত্রদণ্ডখানি, অথবা শ্রীশ মাস্টারের কর্ণমর্দন প্রক্রিয়াটি। তখন বেশিরভাগ মাস্টারমশাইরাই তান্ত্রিক মতে আস্থাবান ছিলেন। তাই অমনোযোগী ছাত্রদের স্কুলগামী নৌকোয় গতি অবশ্যই ছিল, মন কিছুতেই বিদ্যালয়মুখী হতে চাইতো না। মাস্টারমশাইদের মধ্যে যদিও বা দু'একজন তাঁদের স্নেহের স্পর্শে আর অনুভূতিশীল অন্তরে আমাদের মন টানতেন, বিষয়বস্তু আর পাঠ্যতালিকা সদা-সর্বদাই চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাতো। ইংরেজী বই-এর অবোধ্য শব্দশয্যা, গ্রামারের রক্তচক্ষু ভ্রূকুটি, অংকের জটিল সব ধাপ আর অমিল উত্তরের ক্রূরহাসি, সংস্কৃতের খটমট

শব্দরূপ, ইতিহাসের নাম ধাম সন তারিখের ভিড়, ভূগোলের দিক্-বিদিক জ্ঞানশূন্য করা গোলকধাঁধাঁ—সবমিলিয়ে স্কুলের পথে প্রায়ই নৌকোডুবি ঘটে যেতো! মেঠো কাদা রাস্তায় পা পিছলে পতনই ছিল বাঁচার—ছুটি পাবার—একমাত্র পথ।

নাও যেমন স্কুলের ছুটির ব্যবস্থা করে দিত তেমনি ছুটির দিনে মুক্তির বাহন হয়েও দেখা দিত। ছোট ছোট সময়ের ফাঁকগুলো নৌকোয় করে কাছে পিঠে চো'ড়ের ধাক্কায় অথবা বৈঠার টানে ভেসে বেড়ানোর মজা প্রাণভরে উপভোগ করেছি। বড় বড় ছুটির সময়গুলো কখনও মা'এর সংগে কখনও বাবার সংগে দূর পাল্লায় ভেসে গেছি। নৌকোর উপর বাঁশের মাচান আর মাঝখানে ছইএর সংস্থাপন ঘটলেই মন যেন পেখম তুলে নাচতে সুরু করে দিত। মামাবাড়ির ছবি চোখের সামনে জ্যান্ত হয়ে উঠতো। নৌকোর 'গুরোগুলো' বাঁশের মাচানে ঢাকা পড়ে যেতো, ডালিতে বসলে মায়ের সাবধানবানী সচকিত করে দিত। হাদান মাঝির কাছে গলুইয়ের চরাটে ভাগ বসিয়ে নিঃশঙ্ক মুক্তির আনন্দ অনুভব করতাম। সামনে উপরে আদিগন্ত নীল আকাশ, ভাসা ভাসা খণ্ড খণ্ড মেঘের অলস যাতায়াত, উদয়রবির তরুণ আলো আর উর্ধ্বআকাশে দু'চারটে চিলের ইতিউতি মুক্তপক্ষ বিচরণ, মনের আকাশের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ জুড়ে একটা ছুটির আমেজে ভরিয়ে দিত। রাস্তার উপরেই একগলা জল। চারধারের সবুজের মধ্যে সাদা জলের একটা দীর্ঘরেখা যেন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো। পাশের কাটাখালের জল আরও গভীর। শাপলা পাতা জলের সংগে আবক্ষমিতালি করে সমান্তরাল শুয়ে আছে; অগুণতি, অসংখ্য। আর শাপলা ফুলের দৃপ্ত উন্নতশির দুধে-আলতা পাপড়িরা আকাশদৃষ্টি; যেন আমাদের দেখার জন্যে নয়, সূর্যের সংগে মিতালি করার লোভে, দলগুলো একটুকু ফাঁক করে, আদর আর আপ্যায়নের ভঙ্গিতে উন্মুখ! চলমান নৌকোর তলায় শাপলার প্রশস্ত হৃষ্ট পাতার সংগে বল্লমের মতো উঁচিয়ে থাকা পটপটি ঘাসের দেহগুলো মথিত-পিষ্ট হয়ে যাওয়ার শব্দ মিলে যাচ্ছে নিম্নধ্বনি জলাঘাতের কলতানে। এক মধুর ঐক্যতান।

প্রকৃতির ঠিক মাঝমধ্যিখান দিয়ে এই যে আমাদের যাওয়া এখানে নাও ও চলে মনও চলে। চোখের তৃপ্তি আর মনের শান্তি ধীরগতি নৌকোর চলনে

কখনও তো মনে একঘেয়েমির দানাটি পর্যন্ত উপ্ত হতে দেয় নি! দেখে দেখে চিত্তের বিকল হবার কারণ কখনই তো দেখা দেয় নি। কোথায়ও আকণ্ঠ নিমজ্জিত বাঁশের পোল। তার উপরে পাখনা গুটিয়ে বসে থাকা দু'একটা পাখি, অদৃশ্য-কাণ্ড বৃক্ষের জেগে থাকা ঝাঁকড়া মাথা ডালের উপর মৎস্যলোভী কাকের অবস্থান, নিঃসাড়ে একপা দু'পা করে শিকার খোঁজা বকেদের নিবদ্ধ-দৃষ্টি একাগ্রতা, কোথায়ও নৌকোর গোলুইয়ে বসে ছিপ হাতে মাছ ধরায় একমনে বসে থাকা মেছুড়ে। কোথায়ও কোন পিঠ ভাসান ভিটের ধারে নৌকো বেঁধে রেখে দুচার জন তরুণের কর্মব্যবস্তা। দেখতে দেখতেই নৌকো কোনও গ্রামের পাশ দিয়ে, গ্রামকে বেড় দিয়ে আরও সামনে এগিয়ে যাবে। ঘাটের মেয়েরা ভাববে কে যায়? পুরুষেরা চিনে ফেলবে। হাদান মাঝির সঙ্গে দু'টো কথাও বলবে। কাজের কথা, অকাজের কথা। কুশল বিনিময়, প্রীতির আদান প্রদান।

সবই আছে। এখনও আছে। কিন্তু আমার কাছে সবই স্মৃতি হয়ে গেছে। আমাদের সকলের কাছেই। সবই হারিয়ে গেছে, হারিয়েই যায়। অথচ কেমন স্পষ্ট হয়েই তারা ফিরে ফিরে আসে, হারিয়ে গিয়েও যেন হারাতে পারে না। কাজের বোঝাটি নাবিয়ে রেখে এখন যখন অলস অবসর নিয়ে অকাজে সময় কাটাচ্ছি তখনই জানতে পারলাম কিছুই হারায় নি, কিছুই হারায় না।

।। শীতের শিশির ।।

মানচিত্র আর মনচিত্রে স্থান কাল পাত্র কতই না আলাদা হয়ে হয়ে যায়! আমাদের সকলের মনচিত্রে আমাদের শৈশব কৈশোরের স্থান কাল পাত্র কখনই উজ্জ্বলতা হারায় না। এমন কি দ্বিতীয় শৈশবে এসেও সেই প্রথম শৈশবের বর্ণ শব্দ গন্ধ, স্থান কাল পাত্র, মাঠ ঘাট প্রান্তর সমান সতেজ থেকে যায়। আর শুধু সমানই যে থেকে যায় তাইবা কেন, যেন অনেক বেশী উজ্জ্বলতা পেতে থাকে। সেকি শুধু স্মৃতি সততই সুখের বলে? মনে হয় শুধু স্মৃতি বলে নয় কারণ তাহলে তো আরও শত সহস্র স্মৃতির—সারা জীবন ধরে স্মরণের যে অফুরন্ত ভাণ্ডারটি আমরা সুদূর অতীত থেকে সদ্য বর্তমান পর্যন্ত জীবনে ভরে তুলি —সেই সকল স্মৃতিরই দাবি সমান হত। তাতো হয় না! এই যে হয় না তার কারণ কি? সেই কারণ স্মৃতির স্মরণে নয়; শৈশবের কিশলয় মনের গঠনে নয় কি?

কোনও না কোনও কূলে আমাদের জন্ম, জীবন কিন্তু যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিজের নিজের অন্বেষণে দিক-বিদিক ছুটোছুটি করে মরে। এই জন্মের কূল জাতি-ধর্ম-বর্ণের হিসেবে নয়, গৃহ-গ্রাম-পরিবেশের কূলে। অনেকটাই নদীর জন্মের মতো, উৎসের মতো। আমরা তাই কেউ 'সাজাইল' কেউ 'তারাইল' কেউবা 'রাইতকান্দি', 'সোনাকান্দির' উৎসে জাত, সেই সেই গ্রামের পটভূমিকায় লালিত পালিত। তাই আমাদের কারো যৌবন কারো প্রৌঢ়ত্ব কারো বার্ধক্য হাওড়া কলকাতার জনারণ্যে, পাটনা দিল্লির ভোগ জঙ্গলে অথবা দমদম-নৈহাটির কর্মব্যস্ততায় কাটলেও প্রাণের জীবনদায়িনী উৎসটি সুপ্ত অব্যক্ত অতীতের সেই দুকূল সরস শৈশব-বাল্যের-কৈশোর-তারুণ্যের উৎস মুখকে বার বার চেতনে অবচেতনে খুঁজে মরে। হারিয়ে ফেলেও আমাদের অতীত তাই হারিয়ে যেতে পারে না; বার বারই শয়নে স্বপনে নিশি জাগরণের একান্ত আপন মুহূর্তে স্পর্শ করে যায়, হাতছানি দিয়ে দিয়ে ডাকে, হঠাৎ হঠাৎ পিছন থেকে ছুঁয়ে দেয়, দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে দিয়ে যেন ফিস ফিস করে প্রশ্ন করেঃ চিনতে পার? বলতো কে? আমরা তাই উন্মনা হয়ে যাই, স্মরণের বিস্তারিত প্রসারে ভেসে যাই, আর মনে মনে ভাবি

এখনই, এই বর্তমানেই, বোধহয় আমরা হারিয়ে গেছি। সেই অতীতের স্মরণ বর্তমানেই বোধহয় আমরা নিজেদের খুঁজে পাই, খুঁজে পেতে পারি।

আমরা যারা তরুণ, যুবক কালে জীবন প্রবাহের উৎস মুখটি ছেড়ে এসেছি সেই আমরা অনেকেই আজ বৃদ্ধ অথবা দ্বিতীয় শৈশবের মোহানা জীবনে এসে গেছি। কলকল্লোলিত প্রথম শৈশব ছিল সবুজে শ্যামলে জলে স্থলে মাঠে প্রান্তরে মাখামাখি একাকার। আমাদের দ্বিতীয় শৈশব নির্মম-নীরস, ঝরাপাতা শুষ্কতায় প্রাণহীন, মরুপ্রায়। অথচ স্মরণ পথের জোনাকি আলোয় এখনো দেখতে পাই, তখনকার দেখার চোখে, বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের ঘাসের আচ্ছাদনে মোড়া পুকুর পাড়ে, শতরঞ্চ মোড়া বৈঠকখানার অলস অভ্যন্তরে অথবা দূর আকাশের নিচে আম জাম কাঁঠালের তুলি আঁকা গ্রাম রেখার দিকে পড়ন্ত বেলাকে আত্মগত অনুভবে আপনকরে নিয়ে পদচারণারত।

ছেচল্লিশ সাতচল্লিশে যাঁরা উত্তর যৌবন মধ্যবয়স পার করেছেন নিজ নিজ শৈশবের আনুপূর্বিক অনুসরণে, সমপ্রবাহে, তাঁরা আজ অনেকেই নেই। তাঁদের বেদনাবোধগুলো দীর্ঘশ্বাস হয়ে হয়ে হাওড়া কলকাতা দিল্লি পাটনার আকাশে অনেক কার্বনডাই অক্সাইড ছড়িয়েছে বোধ করি। আমরা আমাদের খেলাঘর ছেড়ে উত্তর জীবনে যে যেমন পেরেছি ঘর বানিয়েছি, ঘর সাজিয়েছি। তাঁরা তো তাঁদের খেলাঘরকে আবাসগৃহের সম্পন্নতায় টেনে নিয়ে গেছেন সেই ফেলে আসা সবুজের পটভূমিতে জলতরঙ্গের মাঝমধ্যিখানেই। তাঁরা আউল বাউলের তানে আর ভাটিয়ালির গানে, তর্জার ঘন বুনোটে আর কবিগানের আখরে আখরে জীবনকে শৈশবথেকেই যৌবনে, যৌবন থেকে মধ্যবয়সে পেঁীছে দিয়েছিলেন। তাঁরা তাই কেবলমাত্র অতীত উৎস থেকে বিচ্ছিন্নই নন, তাঁরা নিঃস্ব, তাঁরা রিক্ত, তাঁরা অসহায় হয়েই বাকি জীবনকে শুধু দিন যাপনের গ্লানি বলেই বেঁচে নিতে বাধ্য হয়েছেন! জীবনের যে ধন হিসেব নিকেশের কলমে কাগজে অঙ্কের পরিভাষায় প্রকাশ করা যায় সে ধন নয়, তাঁরা সকলেই জীরনের সেই ধনে নির্ধন হয়েছিলেন যা কেবলমাত্র দীর্ঘশ্বাসের হতাশায় লেখা যায়, চোখের জলের নির্মমতায় প্রকাশ করা যায়। অনেকেই তাই অসময়ে নিজেদের চিরতরে হারিয়ে ফেলে সকল হারানোর বেদনা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। প্রাণরসের স্বাভাবিক উৎসটি শুকিয়ে যেতেই তাঁদের আশৈশব সংগ্রহ-পুষ্ট চেতনার সবুজটুকু ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপেই রাজনীতির

হৃদয়হীন শুষ্ক সুবিধাবাদের তাপে শুকিয়ে গেল। আমাদের অনেক বাবাকাকা জ্যেঠারা, অনেক দাদা দাদু ঠাকুমা দিদিমারা ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের সেই হৃদয়হীন শুষ্ক ঝড়ে ঝরে গেলেন। যাঁরা তবুও টিকে ছিলেন, জীবনের নিজস্ব স্বভাবে যাঁরা জীবনকে নোতুন করে খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন, তাঁরাও অনেকেই নির্দয় শহরজীবনের আক্রমণে, অন্তরহীন সভ্যতার পীড়নে আর রাজনীতির ক্রুর ছোবলে বিষাক্ত দেহ ছিন্নভিন্ন চেতনা আর নিঃশেষিত প্রত্যাশা হয়ে, বোধহয় মনে মনে ফেলে আসা সেই সবুজ প্রান্তরের টানেই ছুটে চলে গেলেন। বলা যায় স্বর্গে গেলেন। স্বর্গ তাঁদের কোনও কল্পনার এলাকা ছিল না ; স্বর্গ তাঁদের কাছে জননী ছিল ; জন্মভূমির শ্যামল কোমল অঙ্কটিই তাঁদের শৈশবের লীলাভূমি যৌবনের বারানসী এবং বার্ধক্যের তপোবন ছিল যে! যাঁরা চলে গেলেন ঝরে গেলেন তাঁরা যে সেখানেই গেলেন সেটুকু সান্ত্বনা-ভাবনা তাঁদের জন্য আমরা অন্তত দিতেই পারি।

সেই স্বর্গ, সেই সবুজ প্রাণের প্রথম উৎসটি, সেই আমাদের নিজ নিজ গ্রামটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানচিত্রে নেই। বাল্যকালে প্রথম প্রথম যখন ভূগোল বই আর ইংরেজী বাংলা ছাপা মানচিত্র হাতে পেয়েছি তখন আমরা সকলেই উপুড় হয়ে ঝুঁকে পড়ে আমাদের স্ব স্ব স্বর্গকে খুঁজেছি। ক'জন পেয়েছি ? শহর আর উপশহর ছাড়া, ক'একটি বাছা বাছা স্থান ছাড়া, আর আর সবই তো সেই সব মানচিত্রে কোনও মান পায় নি ; অচিহ্নিত পৃষ্ঠারা ধূসরতায় হারিয়ে গেছে। নিজ নিজ স্বর্গের এই অনির্দেশ্য হারিয়ে যাওয়াটাই শেষ কথা হয়নি কারণ তারা সকলেই আমাদের তাজা প্রাণ স্পর্শ গন্ধ বর্ণ স্বাদের গভীর অনুভবে জড়িয়ে ছড়িয়ে মনচিত্রে চিরসুন্দর খোদাই হয়ে গেছে। অন্য দিকে তখনও যেমন এখনও তেমনি শহরের পিচ রাস্তার প্রাণহীনতা ইঁটের সড়কের ধুলো জঞ্জাল আর যন্ত্রসভ্যতার রথ চক্র ঘরঘর, প্রাণের পাখা মেলতে সাহায্য করে নি, মনের গভীরে দাগ কাটে নি। মনচিত্র নয়, মানচিত্রই তাকে ধরে রেখেছে।

মানচিত্রে সূর্যোদয় থাকে না, থাকার কথাও নয়। মনচিত্রে সূর্যোদয় থাকে, এবং তা চিরদিনের হয়ে থেকে যায়। এখন এই বিঁভূই-এ বসে, দ্বিতীয় শৈশবে, সেই কথা ভেবে কষ্ট হয়। আমরা শৈলশিখরে ছুটে যাই, প্রদেশ পাড়ি দিয়ে সমুদ্রের ধার খুঁজি যাকে দেখার জন্যে সেই সূর্য আমাদের প্রথম শৈশবে

ঘরের দরজা-জানালা দিয়ে ঊষালগ্নেই ডেকে তুলেছেন তাঁর সপ্তরঙের রথে চড়ে। হাতছানি দিয়ে ঘরের বাইরে টেনে এনেছেন, ধু-ধু প্রান্তরের ওপারে তুলিতে আঁকা সবুজ-শ্যামল গ্রাম-গ্রামান্তরের ফাঁক দিয়ে অথবা আদিগন্ত শস্যক্ষেত্রের হঠাৎ-মাঝখান থেকে দুধে-আলতা প্রশস্তবৃত্ত মহাদ্যুতি হয়ে দেখা দিয়েছেন। কত সহজেই শ্যামল পৃথিবীর মস্তক চুম্বন করে দিনটির যাত্রারম্ভ করেছেন। বিশ্বচরাচরে যেন ছড়িয়ে পড়েছে একই কথা অয়মারম্ভং শুভায় ভবতু!

এখন, সভ্যতার মধ্য দিনে আর আমাদের উপান্ত সময়ে, আমরা ছুটোছুটি করি সূর্যোদয় দেখতে। অথচ তখন, আমাদের সেই প্রথম জীবনে এবং অবশ্যই এখনও সেই আমাদের ফেলে আসা গ্রাম-জীবনে, সাজাইল-তারাইল, রাইতকান্দি-সোনাকান্দির রাত-ভোর নিঝুম জীবনে, ভানুমতির খেলার মতো উদয়-ভানু নিজেই ছন্দ-বন্ধ শিশু চলনের নৃত্যভঙ্গিমায় আমাদের ঘুম ভাঙাতেন, দর্শন দিতেন, 'রাই জাগো রাই জাগো'-র প্রভাত ফেরিতে আমাদের সকলের মনকেই রাঙিয়ে তুলতেন। আর এখন আমাদের শহর-আধা-শহর জীবনের সুদীর্ঘ সংগ্রাম জীবনে শহর-প্রসব আমাদের সন্তানরা ঊষাকে জানে অভিধানে, পাখির কলকাকলিতে নয়, প্রভাতকে জানে স্নানান্ত স্কুল গমনের ক্ষণ বলে, রবির করে অন্তরের ধ্বনিকে অনুভব বা প্রকাশ করাব সময় বলে নয়। একমাত্র টেলিভিশনের অনুষ্ঠান আরম্ভের মুহূর্তকে বর্নময় ধ্বনিময় করে তোলার জন্যে প্রকৃতির টুকরো টুকরো সুন্দর আমাদের বসার ঘরের চারদেয়ালে প্রেক্ষিতহীন প্রবেশ করতে পারে মাত্র। সুজলাং-সুফলাং তাই চৌদ্দ-একুশ ইঞ্চির পরিসরে দৃশ্যমান, মলয়জ শীতলাং একটু মাইক্রো মাত্রায় ধরা দেয় মাত্র। শাপলা ফুলের অলক্ত-রঞ্জিত অন্তর খানির জন্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন ছাড়া আমাদের চোখের ক্ষুধা, যদি এবং যেখানে যেখানে সেই ক্ষুধা কাতরতার জন্ম দেয়, এখনও দেয়, সেই ক্ষুধা মেটাবার অবকাশ কোথায়? সব বঞ্চনাই বেদনার, কোনও কোনও বঞ্চনা বোধহয় নির্দয় যন্ত্রণাময় হয়ে দেখা দেয়!

অবশ্য ধরিত্রীকে পদ-আনত করে যারা নিজ নিজ পদ-উন্নতির স্বপ্ন দেখে সভ্যতা-সম্পন্নতা-গর্বী সেই সব পদাতিকদের মানচিত্রেই মতি থাকার কথা, মনচিত্র নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। থাকার কথাও নয়। প্রকৃতিকে জানা,

প্রকৃতির অমিত শক্তিকে মানুষের কাজে লাগানোর মধ্যেই সভ্যতার ক্রমবিকাশ, উন্নতি। অতীত দিনে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল, মানুষ ছিল মানুষের দাস। আধুনিক সময় দাস প্রথাকে সার্বিক করেছে, প্রকৃতিকে মানুষ তার দাস বানাতে বদ্ধপরিকর! দাসপ্রথার সাফল্যে, সার্বিক সাফল্যেই, মানুষের সার্বিক সাফল্যেই মানুষের সার্বিক সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে আমরা ইঁটের পরে ইঁট সাজাতে ব্যস্ত। কবির ভাষায় আমরা সেই ইঁটের মধ্যে কীটের মতো স্নেহ-ভালবাসাহীন প্রাণধারণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। এই পড়ছি বলেই কি আমরা ক্রমাগত মানচিত্রে আকর্ষণ বোধ করছি? মানচিত্রের টান কমে যাচ্ছে?

সারাজীবনই তো সংগ্রহকে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তুলে স্তূপাকার করে তুলেছি। সে তো আজকের কথা নয়! কিন্তু সংগ্রহ যত প্রয়োজনেরই হোক না কেন, প্রতিনিয়তর শত চাহিদার যোগান দিতে যত সক্ষমই হোক না কেন, বার বারই তো প্রাণের তাগিদে সেই শৈশবের সবুজে ছুটে ছুটে যেতে হয়েছে, হচ্ছে! কেন? বিরস মুহূর্তে, তন্দ্রাচ্ছন্ন আত্মনিমগ্নতায়, পরিবেশ ক্লিষ্ট অবসন্নতায় অথবা পরাজয়ের অসহায়তায় বার বারই কেন খুঁজে মরি কৈশোরের মনচিত্র-জীবনকে? সেই উদার আকাশ, প্রশস্ত দেশকালের প্রসার, ঘাস-বিছানো পায়ে চলা পথ, খাল-বিল-নদী-নালার নকশি-কাটা জীবনের আঁচল? পাখির ডানায় চঞ্চল আদিগন্ত নীল, মরালগতি শান্ত অচঞ্চল ছায়াঘেরা গভীর জলরাশি? কেন, কেন? কেন খুঁজি?

খুঁজে মরি বোধহয় নিতান্তই নিজের জন্যে, নিজেদের জন্যে। রোটি-কাপড়া-মকান-এর জীবন-সংগ্রামে আমরা সকলেই স্বল্পথেকে বহুর সঙ্গে সম্পর্কিত। পরিবার-পরিজন, আত্মজন-আপনজন, প্রতিবেশী-প্রতিযোগী-জন। সেখানেই আমাদের প্রতিনিয়তর লাভ-ক্ষতি; দেনা-পাওনা, সংঘর্ষ-সংগ্রহ। প্রাপ্তির নেশায় আর অপচয়ের হতাশায় আমাদের সামাজিক আমিগুলো উত্তেজনা-আশঙ্কা-উৎকণ্ঠায় যখন জর্জরিত হয়ে ওঠে তখনই বোধ হয় আমরা নিজ নিজ অন্তরের গভীরে পালানোর জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠি। অনেকটাই যেন শিশুদের মতো। বিপদ বুঝলেই মায়ের আঁচলখানি সম্বল করতে চায়। -আমরাও কি তাইই করি না? নিজ নিজ বর্তমানের বিপদ থেকে, অসহায়তা বোধ থেকে মুক্তি পেতেই কি আমরা ছুটে যাই না সেই

মায়েরই আঁচলের মাঝখানে ? তারায় তারায় খচিত নীল-নভ চাঁদোয়ার নিচে, বুটিদার ঢাকাই কাজ করা শ্যামল অঞ্চলে ? নিজেদের 'আমি'-টুকুর ঐ একফালি অতীত ছাড়া বাঁচার মতো আর কীই বা আমরা অবশিষ্ট বলে বাঁচাতে পেরেছি ? সেই ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের উৎপাটনপটের পরে নখ-দন্ত জীবন সংগ্রাম আর লেলিহান যজ্ঞ ধূমের ঝলসানো অস্তিত্বে আর যা কিছু ছিল সবই তো ধ্বংসে আর আহুতিতে শেষ হয়ে গেল ; বেঁচে রইল শুধু শান্ত সংগ্রহের কৈশোর বাল্যের সেই দূর্বাদলশ্যাম অতীত, সেই আকাশ, সেই বাতাস, সেই সহৃদয় গ্রাম গ্রামান্তর নিকট দূর অনুভবগুলো। তাই বারে বারে সেখানে ছাড়া যাবার আর ঠিকানা কোথায় ?

কিন্তু আমাদের সন্তান সন্ততিরা ? ওদের শৈশব কাটছে সম্পন্নস্কুলে ভর্তি হবার জন্যে নির্মম শৃঙ্খলার পেষণে, বাল্যকাল কাটছে যোগ্য ফলাফলের তাড়নায় আর কৈশোর কাটছে প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান অধিকারের ঊর্ধ্বশ্বাস প্রস্তুতিতে। তরুণ হতেই ওরা জীবনের 'রেসের' মাঠে পা ঠুকে ঠুকে বেগ সংগ্রহ করছে। যৌবন ওদের হাড় ভাঙ্গা ঘাড় ভাঙ্গা প্রাপ্তি আর সংগ্রহের বেড়াজালে ঘেরা হয়ে যাচ্ছে। ওরা যখন আমাদের মতো পালাতে চাইবে ? ওরা যখন নিতান্তই নিজের নিজের বাঁচার জন্যে অন্তরের গভীরে হাতড়িয়ে মরবে, অতীতের গহ্বরে মাথা কুটে হিমশিম খাবে, তখন ? থাকার মতো যে ওদের কোনও অতীতই রইল না! অতীত হীন জীবন যে কতো ভয়ানক হতে পারে তা এই দ্বিতীয় শৈশবে এসে যেন পরিষ্কার বুঝতে পারছি।

আমাদের জীবনেও হাতেখড়ি ছিল, যেটা ছিল না তা সেই খড়ির সঙ্গে একটা বেড়ির ব্যবস্থা। জীবনের প্রথম দিকের অনেকখানি সময়ই, কিশলয়ের মতোই, আমরা স্বাধীন বেড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছি। বর্ণমালা আমাদের জীবনে দৃষ্টিকে পুষ্ট করে চলেছে দীর্ঘদিন ; আক্রমণে দেবী সরস্বতীর বাহন রূপ মা বাবার বেত্র হস্ত হয়ে আবির্ভাব ঘটতে অন্ততঃ পাঁচ 'ছটি শীতের বিলম্ব ঘটত। তাই আমরা অঙ্গনের মাটি আর পথের ধুলোকে সকালসকালই আপন অঙ্গ বর্ণে অকাতরে মেখে নিতে সময় পেয়েছি, ঘাসের গালিচায় আর গাছের তলায় ঝরা পাতার বিছানায় আমরা অনেক সকাল দুপুর বিকেল গড়াগড়ি দিতেও সুযোগ পেয়েছি, অকারণ পুলকে মাঠ ঘাট

জাঙ্গাস ভেঙে ছুটোছুটি করেছি, চপল খেলায় একে অন্যের গায়ে জল ছিটিয়েছি, কাদা মাখামাখি করেছি, করিয়েছি। অবেলায় অনেক রোদে পুড়েছি, বিষ্টিতে জবজবে হয়ে ঘরে ফিরেছি। আমরাও যেমন জলে জঙ্গলে স্বাধীনতা উপভোগ করেছি, শাসনকর্তা শাসন-কর্ত্রীরাও তেমনি আমাদের কানে চুলে পিঠে স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। এই ভোগ দুর্ভোগ বেশ ফেলে ছড়িয়েই সমাপন হয়েছে; 'লেনে'র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর 'দেনে'র হাত কঞ্চি লাঠি কিছুই আর ফেলে রাখেনি, বাকি বকেয়া থাকেনি। শেষ হয়ে চুকে বুকে গেছে। পলায়নের তৎপরতা আর বুদ্ধি কৌশল, শাসকের হৃদয় পরিবর্তনের মানসে সুরবিন্যাস বা অশ্রুসেচন family penal code এর প্রয়োগকে অক্ষম দুর্বল করে দিত। এই সব কলা কৌশল আমাদের শৈশবকে অনেক বেশি স্মরণ যোগ্য করে রেখেছে।

শহর আর শহরতলিতে শীতকালে সকালে কুয়াশা-ধোঁয়াশা আর বিকেলেও, প্রায় সন্ধ্যের হালকা অন্ধকারে, শব্দদূষণের উপাদান নিয়ে কুহেলিকা দেখা যায়। দেখা যায় এবং নাকেমুখে তারা ঢুকেও যায়। সর্দি কাশির আকর এই সব যন্ত্র চিমনি লরিবাসের নির্গত ধোঁয়া-ময়লা-ধুলো যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই এখন বিধি। নির্দেশও বটে। কিন্তু গ্রামের পটভূমিতে ঝুলে থাকা টান টান হালকা কুয়াশার আস্তরণগুলো যে কতো নয়ননন্দন, মনোমুগ্ধকর তা যারা না দেখেছে তারা উপলব্ধি করতে পারবে না। দার্জিলিং বা অনুরূপ শৈলশিখরে দাঁড়িয়ে যারা নিচে-উপরে, কাছে দূরে, সন্ধ্যার আবছা আলো জগৎ-সংসার গ্রাস করার আগেই, ভাসমান নিশ্চল সাদাসাদা 'মেঘকে' না দেখেছে তাদের বোঝানো যাবে না। দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়েও প্রায় একই রকম সাদা সুতোর শতশত 'লাছি' মতো কুহেলিকা অনেক নিচে গ্রামের কাছে কাছে, গাছপালার ঘন বুনোটের পাশে পাশে দেখা যায়। কিন্তু সেই সব দৃশ্য থেকে অনেক আলাদা পূর্ববাংলার গ্রামের সান্ধ্য কুয়াশার পেলব আস্তরণগুলো।

মাইলের পর মাইল ধরে চারদিকেই শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে দূর-দূর গ্রাম। গ্রাম বলতে বোঝায় পাতলা সবুজের আদিগন্ত মসৃণ শস্য চাদরের মাথা টপকে গাঢ় সবুজের তুলির টানে টানে, সবুজের ফাঁকে ফাঁকে, একটু উঁচুমাথা বার করে, আমজাম নারকেল সুপারির মাথাগুলো যেন গলা জড়াজড়ি করে একাত্ম

হয়ে অবস্থান করে আছে। যেন যুগযুগান্তের সম্বন্ধে ওরা, ঐ শস্য সবুজের পাতলা চাদর আর গাঢ় সবুজের ঘনবিন্যস্ত ভালবাসার আদর, গ্রামের রূপ নিয়ে জেগে আছে অন্তরের প্রতীক্ষায়। বিকেল গড়িয়ে যখন এই সবুজ শ্যামল গ্রাম প্রান্তরে সন্ধ্যার আগমন ক্ষণটি ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে আর গ্রামগুলি নীল আকাশের চাঁদোয়ার নিচে অন্ধকারের এক একটা তুলির আঁচড় হয়ে শোভা পেতে থাকে তখনই দেখা দেয়, শ্বেতবসনা সুন্দরীর রূপ লাবণ্যে, হঠাৎ হঠাৎ কনিষ্ঠ গ্রামসহোদরা কুয়াশার ভাসমান ছবিছবি তুলির টানগুলো। শীতের সন্ধ্যায় বিশ্বচরাচর মৌন। উপরে নীল মহাকাশ তার নীলকে ক্রমশ হারায়, একটা দুটো করে শত শত অনিমেষ দৃষ্টি তারাদের আলোর আড়ালে। গ্রামগুলো দূরে দূরে একেবারে একা একা ঘন শীতের চাদর মুড়ি দিয়ে নিঝুম ধ্যানমগ্ন। মাঠের শেষ পাখিটিও রাতের বিশ্রাম উপভোগ করতে চলে গেছে আর আকাশের নিঃশেষিত আলোর রেশমী অবশেষকে সিরসির নাড়া দিয়ে ক্লান্ত পাখার হালকা নাড়ায় উড়ন্ত বিহঙ্গরাও যে যার ঘরে ফিরে গেছে। আর ঠিক এই সময়টিতেই কুয়াশার চাদরখানা এ গ্রাম সে গ্রাম সব গ্রামকে নিকট করে যেন থমকে ভেসে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে সঙ্গ দেবে বলে, শীতে উষ্ণতা দেবে বলে, রাতে অভয় দেবে বলে।

আমাদের মতো যাদের পাঠে মন নেই, মন পড়ে আছে মাঠে, তাদের মনের মনচিত্রে চিরদিনের হয়ে যেন বিশ্বচরাচর ধরা পড়ে যায়, প্রায়ান্ধকার প্রকৃতির উজ্জ্বল সুষমাটুকু যেন সনাতন বিস্ময় হয়ে বসে যায়। সংগ্রহ উপচে পড়ে, স্মরণ অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে। এবং একটু পরেই যতীনের বাড়ির দাওয়ায় এক বিন্দু আলো যেন এই নিশ্চল ছবির এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে গিয়ে স্থির হয়ে যায়, মকসেদের ঘরের জানালা যেন তার পড়ার টেবিলের হারিকেনের ঝিলিক হয়ে দেখা দেয়। কোনও দূর গ্রামে কোনও ল্যাম্পের আলো বা প্রদীপের শিখা যখন এঘর থেকে ওঘরে যায় তখন ছবি যেমন প্রাণ পায়, কল্পনাও তেমনি কোনও হাসিনা কোনও হামিদার ডুরে পাড় লালশাড়িকে সেই আলোর পিছনে দ্যুতিমান দেখতে পায়।

আমাদের জীবনে তখনও স্বপ্ন দেখার সময় আসে নি তাই আমরা প্রকৃতিকেই দেখেছি স্বপ্ন নীল চোখে। মোরগ ডাকা সকালেই আমাদের মন

আনচান করে উঠতো। নিশি শয্যা আমাদের কাছে শরশয্যা বলে মনে হত। অন্ধকারের প্রতি সারমেয়কুলের তীব্র প্রতিবাদ এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে, এ গ্রাম ও গ্রাম থেকে আমাদের চোখের অবশিষ্ট ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতাকে নিমেষেই তাড়িয়ে দিত। সদ্যজাত সারমেয় শিশুকুলের কুঁই কুঁই ডাকে আমাদের অন্তরে মাতৃস্নেহের লালনেচ্ছাকে হুই হুই লেলিহান করে তুলতো। আমাদের অনেকেরই সেই শৈশবকালে এক একটি তখনও ভাল করে চোখ না ফোটা কুকুরছানা নিজের নিজের একান্ত আপন করে নিশ্চিত হয়ে যেতো। অপত্য স্নেহ কি তা তখনও আমাদের হয়তো জানা হয় নি, 'গোদ' নেওয়া বা দত্তক নেওয়া ব্যাপারটাও অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু ভুলো বাঘার সন্তানদের নিয়ে আমাদের যে টানাটানি ভাগাভাগি তা অনেক চোখের জলে, বহু হাঁচড়ে পাঁচড়ে আমাদের প্রতি শীতের অভিজ্ঞতা, বিছানা ছেড়ে আমরা ছুটে যেতাম আমাদের নিজ নিজ পোষ্যের তত্ত্বাবধানে। ক'এক গোছা খড়ের আস্তরণের বিছানায় একমাত্র মায়ের উষ্ণতাকে সম্বল করে গ্রাম্য শীতের তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে সারারাত যুদ্ধ করে ক্লান্ত আমাদের প্রিয় পোষ্যরা হয়তো সারারাতই চিৎকৃত প্রতিবাদ জানিয়েছে ভাগ্যের বিরুদ্ধে। আমরা সে খবর রাখি নি। কিন্তু প্রভাতের সূর্যতাপে আমরা পোষ্য পোষক মিলে জীবনকে অনেক ঘনিষ্ঠ করে একে অপরের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট শুষে নিতে চেয়েছি। আদরের উষ্ণতায়, স্নেহের তাপে আর পরস্পর ভালবাসার অঙ্গাঙ্গী চেতনায়। বেলা যত বেড়েছে খেলা তত স্বাভাবিক হয়েছে। প্রাণের প্রাচুর্য উঠোনের দৌড়ঝাঁপে মাত্রাতিরিক্ত ছুটোছুটি করে আমাদের শৈশবকে ভরাট করে তুলেছে। ছোটর সঙ্গে ক্ষুদ্রের সেই মন দেওয়া নেওয়া, আজ মনে হয়, যেন গ্রাম প্রকৃতির নিজস্ব সংসারের অন্তরের দান।

স্থির রাত্রির অবসানে সচল প্রভাতের আগমনটি ধীরগতি হয়েও কেমন অনিবার্য ছিল। লালপাড় আটপৌরে ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা হাঁসের খাঁচার দরজাটা একটুখানি খুলে দিতেই প্যাঁক্ প্যাঁক্ করে হেলে দুলে ছোট বড় হাঁসের দল যেন লাইন করে পুকুরের দিকে চলতো। কারো ঘাড় উঁচু; আকাশের বিরুদ্ধ শত্রুর সম্ভাব্য উপস্থিতি জরিপ করে নিচ্ছে। কারো সামনে লম্বা নিচু গলা খাদ্যান্বেষী দৃষ্টি, কোনওটা বা রাতের খাঁচা-ঝগড়াকে লাইনের-খোলামেলায় টেনে আনতে চায়; ঠোঁট দিয়ে অপরকে আক্রমণ করে

প্রতিশোধ নিতে সচেষ্ট। সারা উঠোন থপ্ থপ্ করে ওরা দল বেঁধেই জলে নেমে যায়।

তরুণ তপনের মৃদু আলো পিঠে-বুকে মেখে দু'চারটি বক ততক্ষণে মাঠে এসে নিশ্চুপ বসে গেছে। তপস্বীর সাধনায় যেন ছবি। দু'একটি তখনও আসছে। স্থান খুঁজে নিতে ইতি-উতি পাখনা ঝাপটাচ্ছে, সরু সরু পা ফেলে ফেলে কেউবা অপছন্দ স্থান ত্যাগ করে কাছেই কোথায়ও যোগ্যস্থান দেখে নিচ্ছে। গাছের ডালে বসে যে কাকগুলো ঘাড় কাত করে করে ইঙ্গি ইঙ্গি করে নিচের landscape-টি নিরীক্ষণ করছিল তারা একে একে পুকুর পাড়ে মাঠের শুকনো জমিতে টুপ-টাপ্ করে নেমে আসছে। ওদের কর্কশ চিৎকারে শ্বেতপক্ষ বকেদের মৎস্য সাধনার কোনও ব্যাঘাত ঘটছে বলে মনেই হয় না। ঘাটের পাশ দিয়ে পুকুরের ঢালে নেমে বুড়ি-পিসি চুবড়ী কাঁখে শাক খুঁজতে নেমে পড়েছেন। ন্যাংটো ছেলেটি ইজের ধরে পাড়ের ও-ঢালে ছুট দিয়েছে। গোয়াল থেকে গরুর দড়ি হাতে হাদানরা বাঁশের মুগুর নিয়ে সেই পুকুরের পাড় ধরে সতেজ ঘাসের সন্ধানে এগিয়ে চলেছে। স্থান নিশ্চয় হলেই জমির গভীরে খুঁটো পুঁতে দিয়ে পুব আকাশের অসীমে তাকিয়ে সময় ঠিক করে নিচ্ছে। মাঠে কেটে রাখা ধান একসঙ্গে করে মোট বেঁধে ঘরের উঠোনে জমা করতে হবে। ক্ষেত্রের আল ধরে ধরে দু'একজন করে কাস্তে হাতে আদুড় গা কৃষক নিজ কাজের উদ্দেশে চলতে সুরু করেছে। ছোট ছোট বাছুরগুলো ঘাস খাবার চাইতে খেলা-ছুটোছুটিতে বেশী মন দিয়েছে। অনেক দূরের জিলা সড়কের উপর দিয়ে জোড়া-জোড়া হাল কাঁধে বলদের দল মন্থর পদে যেন নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিচ্ছে। মাথায় গামছাবাঁধা চাষীর দল দিনের নামে ঘর থেকে ক্ষেতের দিকে ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে। দূরের গ্রামে হালকা সাদা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সবুজপাতার আড়াল ভেদ করে যেন ছাতা ছাতা আভাস দিচ্ছে। সকালের রান্নায় যাদের তাড়া আছে তাদের ঘরে উনুন তো জ্বলবেই। নিজে গ্রামে ঘরের মধ্যে পাশের ঘরে সুবোধবালক ভাল পড়ুয়াদের তীক্ষ্ণকণ্ঠ পাঠের অনুসরণ ক্রমশই তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠছে। গোয়াল থেকে গাভীটির হাম্বারব গৃহস্বামীর মনোযোগ টেনে ধরছে। বেলা হয়ে গেল এখনও বৎসকে দুধ পান করানোর স্বাধীনতা পায় নি সেই গাভীমাতা। তাই তার হাম্বারব প্রতিবাদ। ঘটি হাতে দোহনকারিণী ত্বরিত পদ হবেন। সঙ্গে

সঙ্গে নাচতে নাচতে তার কিশোর পুত্র গামছাহাতে মায়ের পিছু নেবে। গামছা দিয়ে মাছি মশা না তাড়োলে দোহনকারিণীর নৈপুন্যে আর গাভীর স্থির অবস্থানে সমূহ বিঘ্ন ঘটবে। কিশোরটির চোখে-মুখে আনন্দের তরঙ্গ ভঙ্গ। ওলান থেকে চ্যাঁক চোঁক করে গরুর বাট মুক্ত হয়ে দুধের তীরাঘাত ঘটি অবতরণ যেমন মন টানে, দৃষ্টিকে নন্দিত করে, তেমনি পঠনপাঠন থেকে ক্ষণিক হলেও যে অনাবিল মুক্তি তার স্বাদও মধুর রমনীয়, বিশেষ করে শাসক নিজেই যখন সেই মুক্তির ভগীরথ!

প্রভাতের ইতি-উতি নড়াচড়া ততক্ষণে সকালের চঞ্চলতায় সরে এসেছে। সকলেই শত কাজে ব্যস্ত। দাওয়ায় বসে জ্যেঠামশাই গুড়ুক গুড়ুক করে দিনের প্রথম ষ্টিম সংগ্রহে ব্যস্ত পাশে বাবা অথবা কাকা অবশিষ্টের অপেক্ষায় স্থিরদৃষ্টি। ধানকাটার বিষয় অথবা অন্যকোনও অনাবশ্যক সমস্যা নিয়ে কালহরণ করে চলেছেন। খাটো শাড়ি মেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় পাশের গ্রাম থেকে নালা ডোবা খাল বিলে মাছের সন্ধানে হোচা পোলো খালুই নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। অপেক্ষাকৃত বয়স্করা পরিধেয় শাড়ির প্রায় সবটুকু ঊর্ধাঙ্গে সমূহ করে নিচের জলেব হাত থেকে বাঁচিয়ে, মাছ ধরতে লেগে গেছে। পিঠের উপর খেপলা জালের কাঠি-পোরা মাথাটিকে নিম্নমুখী ঝুলিয়ে দিয়ে বুকের কাছে মুঠোয় পোরা ল্যাজটি ধরে জেলে মেছুড়ে চলেছে কাছে দূরে নদীর দিকে। বাঁ হাতে খালুই, কোমরে গামছা। ওদিকে কাটা ধানের শুকনো আঁটিকে পাহাড় প্রমাণ দেহ সম্ভার দিয়ে চাষী আসছে সেই বোঝা মাথায় গৃহ অঙ্গনের দিকে। দেখে মনে হবে যেন শস্যের আঁটিগুলো দু'প্রান্তের বাহু দুলিয়ে দুলিয়ে নিজেরা নিজেরাই মাঠ পার হয়ে আলেব উপর দিয়ে হালটের মাঝমধ্যিখান হয়ে নেচে নেচে ঘরে চলে আসছে। যেন মাঠের জীবনে শস্যের ছড়িয়ে ছিটিয়ে দীর্ঘ একা একা জীবনের অন্তে এই যে দলবদ্ধ ঘরে আসা এটাই তাদের শষ্য জীবনের আনন্দ মুহূর্ত। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে, পাশে এসে অপেক্ষা করলে শোনা যাবে এই সব শস্য পাহাড়ের শুকনো শিষের পরস্পর নড়াচড়ার সঙ্গীত! ছন্দে ছন্দে শর শর সন সন ঝিপ ঝিপ। এই শষ্য পাহাড় আসছে আর আসছে। উঠোনের প্রান্ত বরাবর পালা পালা জমা হয়ে থাকছে! সেখানেই ওদের আপাতত সঙ্গীতের অবসান, আনন্দের সমাপ্তি।

শুভ্রবসনা মরালবাহনা বাগদেবীর বীনা যন্ত্রটি যাদের অন্তরের তন্ত্রীতে

সময়কালে যথেষ্ট ঝংকার তুলতে পারে না তাদের হাতে অফুরন্ত সময় থেকে যায়। তার সঙ্গে যদি স্বস্ব কর্ণ পৃষ্ঠ কেশগুচ্ছের প্রতি যত্র তত্র উদার ব্যবহার মেনে নেবার মতো কা তব কান্তা······'দার্শনিক চেতনাটি স্বভাবের গভীর থেকেই নিজের করে অনুভব করা যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। সকলের ভাগ্যে অবশ্যই ঘটে না কিন্তু যে স্বল্পসংখ্যক বালকের ভাগ্যে প্রকৃতির দেওয়া অফুরন্ত সময় আর ধরিত্রীর কাছে পাওয়া অসীম সহ্য শক্তি জুটে যায় তাদের ভবিষ্যত মার খেলেও বর্তমানগুলো বেঁচে যায়। এই বেঁচে যাওয়া বর্তমানগুলোকে দিয়েই তারা তাদের ভবিষ্যতের মার খাওয়া মরুভূমিতে মরুদ্যান তৈরি করে স্মরণের সেচন খুঁজে নেয়।

ধান কাটা তো সারা হয়ে গেছে। টাক মাথা প্রান্তর কিছুদিন প্রাণহীন পাণ্ডুবর্ণ প্রসারে গায়ে তাড়ানো বাপে খেদানো সন্তানের মতো বিরস বদন ধরাশায়ী। প্রকৃতির সংসারে মানুষের স্বার্থের আক্রমণ যে কতো অসুন্দর কতো নিষ্ঠুর তা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। এই তো ক'দিন আগেও বাতাসের খেলার সঙ্গে শস্য শীর্ষের আনন্দ হিল্লোল কতই না মনোরম দেখেছি। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে সেই সব দিগন্ত ভোলানো ধানগাছের দীর্ঘদেহ জীবন সজল সরস কেমন যেন হঠাৎই, জল সরে গেলে প্রান্তরের কর্দমাক্ত শয্যায় দেহরক্ষা করে সটান দলবদ্ধ শুয়ে পড়তো। কৃষকেরা শষ্যশীর্ষ মাথাগুলো মুট করে করে চুলের মুঠি ধরার মতো করে খড়ের দৈর্ঘ্যে ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ করে কেটে ফেলতো। তারপরে প্রয়োজনের বোঝা হয়ে সেই সব কর্তিত শষ্যদেহরা যখন বোঝা বোঝা গৃহাঙ্গনে চলে যেতো তখন আদিগন্ত প্রসারিত প্রকৃতিতে টাক পড়ে যেতো। নাড়ার দীর্ঘদেহ পাণ্ডুবর্ণ শরীরগুলো যেন তখন ধরিত্রীর নগ্নদেহকে আবৃত করে, লজ্জা নিবারণে, ঢেকে রাখার চেষ্টা করতো।

আর তখনই সুরু হত সেই নীরব নিশ্চেষ্ট প্রকৃতি দেহের সর্বত্র চরাচরের অবিরল অন্বেষণ! সভ্যসমাজে মৃতদেহ নিয়ে টানাহেঁচড়ার বহু নমুনা জানা হয়ে গেছে ; কিন্তু প্রকৃতির আপন রাজত্বে এ'মতো খোঁজা-খুঁজি খোঁচা খুঁচি যেন অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অসুন্দরও। হলে কি হবে? কাক শালিক বক চিল সাপ খোপ যেমন স্বস্ব স্বভাবের তাড়নায় সেই প্রকৃতি দেহের এখানে ওখানে সর্বত্রই বিলি বিলি চষে বেড়ায় তেমনি শামুক ঝিনুক মাছের খোঁজে ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়িরাও তন্ন তন্ন করে চষে ফেলত। অনেক চাষী বোধহয়

প্রকৃতি দেহের সেই অনাবরণ সবুজ পোষাকে ঢেকে দেবার বাসনায়ই ধামায় করে রবিশষ্যের বীজ ছড়িয়ে দিত নাড়ায় ঢাকা প্রান্তরেই। অনেকে 'নাড়া' সরিয়ে টেনে টেনে এক এক জায়গায় ঢিবি করে তার পরে বীজ ছড়াতো। প্রকৃতি দেহের সর্বত্র তখন নানা জাতের পদচিহ্নে বসন্তের, pox-এর, দগদগে দাগের মতো অসুন্দর ক্ষতগুলো ফুটে উঠতো। দাঁড়ি বান্দা খেলার মতো করে আমরা জমির আল বেয়ে বেয়ে মুক্তির উন্মুক্ত আনন্দকে বুনো ঘোড়ার স্বাধীনতায় ছুটিয়ে দিতাম। দু'চার দিন যেতে না যেতেই প্রান্তরের জলে চকচক পাণ্ডুর টাকে কচি মুগ মুসুর কলাই ডালের সবুজ পাতা খেলা করতে মাথা তুলে আমাদের ডাক দিত। প্রকৃতি আবার ঘন সবুজের আবরণ সর্বদেহে মেলে ধরে আমাদের কচি মনে আনন্দের হিল্লোল তুলে দিত।

আমাদের সময় অফুরন্ত ছুটিও অফুরন্ত! যখন বিদ্যালয়ে গেছি তখন ছুটি এসেছে পলায়নে কখনও বা স্কুলের ঘোষণায়। বড়দিনের ছুটি ছিল ঘোষণায় ছুটি। সেই সময়ে প্রতিবছরই শহরবাসী কোনও না কোনও আত্মীয় গ্রামে আসতেন। শহর জীবনে পদতলে পিচের কাঠিন্য মাথার উপরে বিদ্যুতের তারের জাল। দৃষ্টিপথে ইটের পরে ইট আর সেই ইট সিমেন্টের জঞ্জালের আড়ালে মানুষ কীট। তাই বোধহয় গ্রামে এসেই পায়ের নিচে শিশির ভেজা নরম ঘাসের স্পর্শ পেতে সেই সব আত্মীয়দের কেউ কেউ উতলা হয়ে উঠতেন! মাথার উপরে পাখি ওড়া আকাশের নীল আর অবাধ দৃষ্টির সামনে শ্যামল শস্যক্ষেত্র, দূর দূর গ্রামের গাঢ়সবুজ তাঁরা মনেব মনচিত্রে আকণ্ঠ পুরে নিয়ে মানচিত্রের শহর জীবনে ফিরে যেতেন। কে তাদের সঙ্গ দেবে? সকলেরই তো নানা কাজে আর অকাজে ব্যস্ত জীবন। তাঁদের মধ্যে আমাদের মত যারা, যাদের কাজে লাগানোর মতো কোনও কাজই নেই অথচ নষ্ট করার মতো অপর্যাপ্ত সময় আছে তারাই তাই এই সব প্রবাসী আত্মীয়দের একাকিত্ব মোচনে আগ বাড়িয়ে এগিয়ে আসত। আমাদের জুটে যেতো শাস্তিহীন যত্রতত্র বেড়িয়ে বেড়ানোর সুযোগ আর আত্মীযদের বেড়ানোর আনন্দ। আমরা অধীর আগ্রহে কলকাতার শহর জীবনের খুঁটিনাটি জানার চেষ্টা করতাম ওঁরা গ্রামজীবনের। শহর জ্ঞানে আমরা কতোটা সমৃদ্ধ হতাম তা জানিনা তবে মনে মনে সুপরিচিত আত্মীয়ের মনে গ্রামের তথ্য পরিবেশনের তৃপ্তি পেতাম।

বাংলাদেশের মাঠেপ্রান্তরে জলে-বিলে গ্রামগুলো ছিল ছড়ানো ছিটানো।

বিচ্ছিন্ন একা একা সেগুলো জেগে থাকত একে অন্যের longshot-এ কিন্তু একই প্রকৃতির বিশালতায় থেকে তারা সকলেই যেন দূরে দূরে অপেক্ষমান নিশ্চল প্রহরীর মতো বিশ্বচরাচরের চারদিকে তাল নারকেল সুপারির সঙিগন উঁচিয়ে সৈনিকের সবুজ ধূসর পোষাকে স্থির দাঁড়িয়ে থাকত। তেতলা ছাদে চোখ নিয়ে গেলে দিকচক্রবালে ছিন্ন-বৃত্ত পরিধিস্থিত গ্রামের ছবিগুলো যেন মন কেমন করা অচঞ্চল parallex বলে মনে হত। মনে হত গ্রামগুলো যেন বিশাল বিপুল শস্যের মহাসাগরে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানসি-নৌকো, সবুজের পটে শ্যামলের তুলিতে আঁকা। স্থির অচঞ্চল নিরুদ্দেশ একাকিত্বের বেদনায় ছিন্ন এবং ভিন্ন। স্বল্পস্রোত শান্ত নদীতে কচুরিপানার এ'মতো ছিন্ন এবং ভিন্ন একাকিত্বের বহমান বেদনাকে অনেক অনেকবারই দেখেছি নদীর ভাঙ্গা পাড়ের উঁচুতে দাঁড়িয়ে। সেখানে তবু গতি দেখা যায় এগিয়ে যাবার একটা নিজস্ব ভবিষ্যৎ থাকে। গ্রামগুলো যেন অনাদি অনন্তকাল ধরেই সবুজের মহাসাগরে নিঃস্ব রিক্ত গতিহীন।

এক পা দু'পা করে অলস গমনে শীতের সকালে অথবা অপরাহ্নের মিষ্টি রোদে যে কোনও একটা গ্রামের দিকে এগিয়ে যাবেন, কাছে যাবেন আর তখনই আপনার বিষাদ কর্পূরের মতো উবে যাবে। মনে হবে যে গ্রামকে দূর থেকে দেখা মৌচাকের মতো গাছের নিরুত্তাপ-নিষ্প্রাণ স্থির দেহাংশ বলে মনে হয়েছিল, সেই গ্রামই কাছ থেকে দেখা মৌচাকের মতো প্রাণচঞ্চল কর্মপ্রবাহে উত্তাল, বালক বালিকার কলকণ্ঠে সোচ্চার, জীবন্ত দেখাচ্ছে। মন আপনার গান গেয়ে উঠবে, আনন্দের অনুভব কণ্ঠের ভাষা পেয়ে অপরিচয় দূরত্বকে আলাপনের নৈকট্যে টেনে আনতে চাইবে। গ্রাম আপনাকে আপন করে নিতে চাইবে চাটাই মাদুর আসন পিঁড়ি মোড়া চৌকি এগিয়ে অভ্যর্থনায় আত্মস্থ হয়ে উঠবে। আর তখনই আপনি বুঝে যাবেন যে long shot-এ দেখা জীবন জীবন-সত্য নয়। close shot কত নিকট দৃষ্টি করে তোলে। গ্রামবাংলার জঠরের মধ্যে প্রবেশ করলে তার নিজস্ব আপন বোধের hormone আপনার শহুরে বিচ্ছিন্নতাবোধকে এক লহমায় শুষে নেবে নিঃশেষ করে দেবে এবং কাছে টেনে নেবে। বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রতিটি গাছের ছায়ায় আর পুকুরের পাড়ে এই আপন করা প্রাকৃতিক hormone বহমান। একবার সেখানে গেলে আপনার অস্তিত্বের গভীরে, আপনার বিচ্ছিন্নতাবোধের অন্তরে, আপনার

একাকিত্ব অনুভবের শিরায় শিরায় সেই আপন করে নেওয়া hormone আপনার হৃদয়খানিকে শাপলা ফুলের অন্দরের আলতা রাঙা সুন্দরে ছুপিয়ে দেবে, দেবেই দেবে। আপনি নবজীবন পেয়ে সারা দেহ মনে গ্রামের সবুজ মেখে যখন আবার শহরে ফিরে যাবেন, তখন ? তখন আপনার শহরের বর্তমানগুলো অবশ্যই সদ্য অতীতের স্মৃতি সুরভিতে অবগাহন করে বাঁচাটাকে রোটি কাপড়া মাকানের বাইরে, ঊর্ধ্বে নিয়ে যাবে। মৃত শহরের চাহিদা যোগানের ঘূর্ণিতে আপনার প্রাণ তখন আর হাঁপিয়ে উঠবে না। উঠবে না কারণ তখন আপনার স্মৃতি আছে ; নাইবা হল শৈশব বাল্যের, পুষ্টি আর সমৃদ্ধিতে আপনার মধ্যজীবন সংগ্রহই বা এমন কি খাট ?

যখন আপনারা যাবেন গ্রামের জীবনে তখন অবশ্যই আমাদের কাউকে খুঁজে নেবেন। খুঁজে নিলেই হবে না আমাদের মায়েদের হাত থেকে আমাদের কান-পিঠ চুলের ঝুঁটির ছুটির ব্যবস্থাটি করে নেবেন। না নিলেও আমরা আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে মাঠে ঘাটে যেতে রাজী, তবে নিলে আনন্দ বাড়ে। তাছাড়া শহরের আপনারা যদি গ্রামের মায়েদের কিছু বলেন তাহলে আমাদের যে সাতখুন মাপ হয়ে যাবে। তাতে অবশ্য আমাদের বাকি সহস্র খুনের দায় থেকেই যাবে, 'সাত' তো সেখানে সমুদ্রে শিশির বিন্দু ! আমাদের গ্রাম্য কান রোদে পোড়া জলে ভেজা পিঠ আর তেলের নৈমিত্তিক ব্যবহারে রুক্ষ চুলে সম্বৎসরেব সে পাওনার কথা আপনাদের না ভাবলেও চলবে। আপনাদের নৈকট্যে শহরের বাতাস আমরা মনের গভীরে সঞ্চয় করে নেবো। সেকি আমাদের কম লাভ ?

আমি যাঁর guide সেই আমাদের আত্মীয়কে এক সকালের অভিযানে প্রশ্ন করতে পারি, 'আপনি রামধনু দেখবেন ?' তিনি অবাক বিস্ময়ে একবার আকাশের দিকে, একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখবেন। একদিকে শীতের সকালের বোকা আকাশ অন্যদিকে আমার গেঁয়ো মুখে অজ্ঞতার আভাস দেখে তিনি হয়তো মৃদু হেসে বলবেন, 'এখন রামধনু কোথায় ?' ততক্ষণে আমরা বাড়ির নিচের মাঠটুকু পার হয়ে পতিত জমির ঘন ঘাসের গালিচা মাড়াতে সুরু করেছি। পূর্বাকাশে সূর্যোদয় ঘটে গেছে। অরুণ কিরণ ঘাসের ডগায় শিশির সমুদ্রের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বে প্রতিফলন সুরু করেছে। বলব, 'ঘাসের দিকে তাকান, বিন্দু বিন্দু জলকণায় তরুণ রবির প্রথম স্পর্শে বর্ণ-ছটাকে

দেখুন।' এবারেও অবাক বিস্ময়ে একবার সবুজের প্রসারে রামধনু দেখে আর একবার নীল আকাশের প্রান্তে আরক্তিম সূর্যকে দেখে দৃষ্টিতে বিস্ফার ঘটিয়ে আমাকে দেখবেন! তাঁর বিশ্বাস হবে না, হতে চাইবে না। তবুও নিজের চোখকে অনুসরণ করে করে তন্ময় হয়ে যাবেন। বক্র রামধনু আর তারই উপরে নিচে শুভ্র দীপ্তির আভাস-glow-দেখে দেখে শহরবাসীর চিত্ত আপ্লুত হবে। মনের মণিকোঠায় অবিস্মরণীয় বর্ণালিকে ধরে রেখে ঘাসের অত্যন্ত কাছে গিয়ে, আমাকে অনুসরণ করে, হাতের তালু দিয়ে আলতো করে ঘাসের শিষগুলোর মাথার উপর দিয়ে, জল সরানোর মতো করে, হাতকে ডানদিকে বামদিকে চক্রাকারে বুলিয়ে নেবেন। আমি বলব, 'কি পেলেন?' শহরের চোখ দুটি গোল গোল করে আত্মীয় বলবেন, 'সরস প্রাণের সজল পরশ!' শীর্ষছিন্ন দু'চার টুকরো ঘাসের কচিডগা চেটোয় লেগে-লেপটে থাকবে, বিন্দু বিন্দু জল টপে টপে নিচে পড়বে। তিনি আনন্দে আর বেদনায় মূক হয়ে সুন্দরকে অনুভব করবেন। আমি বলব, 'চলুন এবারে সর্ষে ফুলে হলুদবরণ প্রজাপতির চরণ স্পর্শ করানো দেখাই!' তিনি বলবেন, 'হ্যাঁ, চল।'

সামনে বহু দূরে গ্রামের প্রান্তসীমা পর্যন্ত রাই-কলাইএর আদিগন্ত ক্ষেতপ্রসার। বিশৃঙ্খলের মধ্যেও কোথায় যেন একটা শৃঙ্খলা নিঃসীম রং-তুলিতে আঁকা হয়ে ছড়িয়ে আছে। ঘনসবুজ কলাইক্ষেতের পত্র বক্ষে আবার রামধনু দেখে তিনি বিবশ হবেন। আমি তাঁকে রাই-সর্ষের হলুদ ফুলের আকাশমুখ হৃদয়খানির দিকে দৃষ্টি দিতে বলব। তিনি সচল-আর নিশ্চল ফুল দেখে প্রজাপতিকে চিনে নেবেন। আমি বলব, 'সকলের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কোনও একটাকে দেখুন। দেখবেন সুন্দর কেমন নিটোল হয়ে স্থির হয়ে যাবে।' তিনি বলবেন 'তুমি দেখাও'। আমি তখন তর্জনীর নির্দেশে দেখাবো। দেখাবো প্রজাপতি কেমন নম্রনত চিত্তে তার চরণদুখানি রাইকমলের হলুদবরণ হৃদয়ের মাঝে স্থাপন করে নিজের পাখনাজোড়াকে একত্রকরে বিশ্বচরাচরকে অনুনয় করে চলেছে। নির্বিঘ্ন সমাসন্নতার প্রার্থনায় এই অনুনয়। আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব রিম-ঝিম কম্প্রবক্ষ রাইকমলের বৃন্ত কম্পনের দিকে। বলব 'চেয়ে দেখুন প্রকৃতির অন্দরমহলে কী অসীমের গান ফুলের বৃন্ত বেয়ে প্রজাপতির পাখনা হয়ে নবীন সূর্যের অরুণ তাপের প্রার্থনায় উন্মুখ হয়ে ওঠে!' তিনি বলবেন, 'অপূর্ব, অভাবনীয়,

অনস্বাদিতপূর্ব !' আমি বলব, 'সূক্ষ্ম থেকে এবারে বিরাটের দিকে দেখুন। শত শত প্রজাপতি, মৌমাছি, ফড়িংরা ধরিত্রীর বুকের গভীর থেকে উৎসারিত বৃন্ত-শীর্ষ ফুলরাজি হয়ে মহাবিশ্বের নৈকট্য কামনায় অনাবৃতবক্ষ অপেক্ষমান। দেখুন বিশ্বাত্মা কেমন প্রজাপতি ইত্যাদির বর্ণসম্ভারে সেই নৈকট্য কামনাকে সার্থক করে তুলছে। চেয়ে দেখুন বিরাট প্রেক্ষিতে শতসহস্র সহচরীর মতো সাদা সাদা অতি ক্ষুদ্র পতঙ্গরা সূর্যালোকে কেমন এই মহামিলনযজ্ঞকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। এই অভিসার দীর্ঘস্থায়ী নয়, এখনই সূর্যতাপে হৃদয়ের নম্র-তাপটুকু হারিয়ে যাবে।' তিনি মন ভরে দেখবেন, প্রাণভরে সংগ্রহ করবেন আর তার পরে একদিন অনিবার্যের টানে আবার শহরের রথচক্রঘর্ঘরে হারিয়ে যাবেন !

তার আগেই আমরা অন্য গ্রামের পাশ দিয়ে গ্রামান্তরের মাঠে নেমে যাব। গ্রামের ছোটছোট কথা, ছেলে-মেয়েদের অকারণ খিলখিল হাসি আর হিসেবী কথায় দু'চার টুকরো ভেসে ভেসে আসবে গ্রামের জীবন ছাড়িয়ে পথিকের কান পর্যন্ত। পথিক, আমার আত্মীয়টি, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বেন। আমি বলব, 'কি হল ?' তিনি ভাববেন, 'শব্দ এমন নিটোল হয় ? এমন পরিষ্কার ?' আমাকে না শুধিয়ে তিনি নিজেই উত্তর খুঁজবেন। প্রকৃতি এখানে নিস্তরঙ্গ, নিরুপদ্রব। তাই এই শান্ত বক্ষ বাতাসের দিঘিতে বিন্দু-প্রমাণ শব্দও বোধহয় হারিয়ে যায় না ; শহরের শব্দ-ঘূর্ণিতে কোনও শব্দই বোধহয় আর কুমারী-পবিত্রতায় শ্রোতার কানে পৌঁছোনোর সুযোগ পায় না। শব্দের দূষণ-ধর্ষণ সেখানে এতোই সর্বতোসত্য যে গ্রামে না এলে কণ্ঠের আর শব্দের এই পবিত্র-নিটোল মধুরতা চেতনাকে সমৃদ্ধ করার অবকাশই পেত না। আমি বলব, কি হল, চলুন ?' তিনি বলবেন, 'হ্যাঁ চলো !'

বেলা বাড়তে থাকবে। আমরা আল পথ মেঠোপথ ছেড়ে District Board-এর চওড়া সড়ক বেয়ে হাঁটতে থাকব। নিচু-জমির ক্ষেত্র-প্রান্তরের বুক চিরে অনেক উঁচু এই জিলা-সড়ক দুধারে ঘাসের চাদর মুড়ে সটান সামনে পিছনে দূর-দূরান্তর পর্যন্ত চলে গেছে। পাশে পাশে কাছে-দূরে ছোট-বড় গ্রাম। কিছুদূর এগিয়ে পথিক প্রশ্ন করবেন, 'ঐ যে সামনে শূন্য-ঢিবি মাথায়-ছাতা হাহাকার ঘরগুলো সবাই মিলে একা একা দাঁড়িয়ে আছে ওটা কি ? ওরা কারা ?' আমি মনে মনে হেসে বলব, 'আমাদের হাট,

রবিবারে আর বুধবারে বসে। অন্যদিন এই রকম শূন্য-দৃষ্টি অপেক্ষা করে থাকে।' হাঁটতে হাঁটতে আমরা সেই হাহাকার হাটের মধ্যে এসে পড়ব, চারদিকে তাকিয়ে সেই উঁচু ভিটের চারধার দেখে নিয়ে তিনি বলবেন, 'এইটুকু ভিটের চত্বরে কতটুকু হাট বসে?' হাটের চারদিকের ঢালু ঘাসের পতিত জমি দেখিয়ে আর রাস্তার এপাশ ওপাশ নির্দেশ করে আমি বলব, 'বিরাট হাট বসে, অসংখ্য লোকের আনাগোনা ঘটে, লেনদেন হয়। দামাদামি, দরকষাকষি, চিৎকার চেঁচামেচি তো আছেই তার সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে খুঁজে পাবার চিৎকার, না-পাওয়ার কান্না—সব মিলিয়ে সে এক জমজমাট জীবন। মৌমাছির চাকের মতো ঘিঞ্জি, কর্মব্যস্ততা, সদাসন্ত্রস্ত ছুটোছুটি। তার মধ্যে আবার কখনও সখনও গ্রামে-গ্রামান্তরের ঝগড়া-মারামারি কাজিয়া কচকচি সীমানা সমস্যা গরু খোঁয়াড়ে দেওয়া এবং শতেক অন্য সমস্যার সমাধান খুঁজতে এই দলবদ্ধ শক্তি-সমাহার কেন্দ্রটিকে বেছে নেওয়া হয়। তখন মারামারি যতটা হয় তার চাইতে ছুটোছুটি অনেক বেশি হয়, আহত ব্যক্তির বেদনাবোধের চাইতে চিৎকার চেঁচামেচির বহর শতগুণ অধিক হয়ে ওঠে। গ্রামের হাটের এটি এক বিশেষ চরিত্র। জীবন এখানে প্রয়োজনের সংগ্রহে একত্র হয় কিন্তু অপ্রয়োজনের তেজে-জেদে-অহংকারেও প্রকাশ পেয়ে থাকে।' তিনি বলবেন, 'কিন্তু বর্ষাকালে? তখন স্থানসংকুলান হয় কি করে?' আমি বলব, 'সে তথ্য অন্যদিন অন্যসময়ে। বর্ষাকালের বাংলাদেশ না দেখলে বোঝা যায় না, বর্ষাকালে একবার আসবেন এখানে; আপনার সময়ের অপব্যবহার তো হবেই না বরং শীতের গ্রামপ্রান্তর থেকে যা সংগ্রহ করলেন তার শতগুণ বেশি সংগ্রহের সম্পদ নিয়ে শহরে ফিরতে পারবেন।'

হাটের ঢালু বেয়ে শীতের মিষ্টি রোদ সর্বাঙ্গে মেখে আমরা নিচে নামতে লাগলাম। এখানে ওখানে খুঁটোয় বাঁধা ক'একটি গরু। তাদের কাঁচকাঁচা বাচ্চারা অকারণ উত্তেজনায় দৌড়-ঝাঁপ করছে, কখনও বা ঘাড় টানটান করে দু'এক গাছি ঘাসের শিষ কামড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টায় একাগ্র হচ্ছে। হয়তো কোনও ধর্মের ষাঁড় নাদুস-নুদুস হৃষ্ট-পুষ্ট দেহভারটি চারপায়ে স্থির রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে। দূরে মাঠের মধ্যে কৃষকরা নিজ নিজ কাজে মগ্ন। কেউবা কাস্তেখানা কনুই থেকে হাত বাঁকিয়ে পিঠ চুলকানোর কাজে ব্যবহার করছে আর সাগ্রহ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে বার বার দেখছে। আমাকে

নিশ্চয়ই নয়, শহরের অতিথিকে অবশ্যই। আমরা আপন আপন মনের টানে সড়ক পার হয়ে, মাঠ ভেঙে আমাদের গ্রামের দিকের পথকে ছোট করে করে দ্বিপ্রহরকে কাছে টেনে আনছিলাম। আবার উঁচু রাস্তা, ক্রমশ উঁচু হয়ে অনেক উপরে ছোট্ট কাঠের পোল। আবার ঢালু রাস্তায় প্রায় সমতলের কাছে এসেই পতিত জমির মাঝবরাবর কোণাকুণি পার হয়ে দাসগুপ্তদের বৈঠকখানা। তার পরেই চক্রবর্তীদের সাতসরিকের প্রশস্ত ভিটে, আম জাম কাঁঠালের বাগান ভেদ করে নেমে এলাম সেনপুকুরের ধারঘেঁষে একেবারে সুপরিসর জাঙ্গালে। তার পরেই আমাদের বাড়ি এসে যাবে। আজ আর ভয়ে ভয়ে নয়, নির্ভয়ে মাকে বলতে পারব, 'অনেক দূর ঘুরিয়ে আনলাম, অনেক দূর'। আজ মা শুধু গম্ভীর মুখে আদেশ দেবেন, 'স্নান করে আসবে তাড়াতাড়ি!'

তার পর একদিন অতিথি চলে যাবেন। আমরা শূন্য বোধে কঞ্চি হাতে ঝোপ-ঝাড় পিটিয়ে মনের অসহায়-অবসন্নতাকে তাড়াতে চাইব। সকাল সন্ধ্যার স্বাধীনতা হীনতায় আমাদের নির্ধারিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল নির্দয় নিষ্ঠুর শাসনের আঘাতে আবার শক্ত হয়ে উঠবে! প্রকৃতির অফুরন্ত সম্ভার থেকে আমাদের দৃষ্টিকে অঙ্কের সমস্যায় আর উদয়-অস্ত-সূর্যের বর্ণচ্ছটা থেকে আমাদের মনকে টেনে আনার চেষ্টা চলবে গৃহাভ্যন্তরের যন্ত্রে ছাপা বর্ণমালার নিরস জগতে। বড়দের হাতে বাল্যের বিধিলিপি স্বয়ং বিধাতারও খণ্ডানোর অধিকার নেই!

।। জলবাংলার মনচিত্র ।।

বাল্যকালটাই যে শ্রেষ্ঠ কাল তা যেন ক্রমশই পরিষ্কার ধরা পড়ছে। নিজের বলে একটা জগৎ তৈরি হয়ে যায়, অথচ দায়-দায়িত্বের বোঝাটা ঘাড়ে চাপে না। সেই বোঝাটা বয়ে মরেন মা-বাবা। ভাবনা-দুর্ভাবনা, চিন্তা দুশ্চিন্তা, সংসারজীবন-ভবিষ্যৎ—সব তাঁদের দিনের শান্তি আর রাতের স্বপ্নকে তছনছ করে দেয়। আর বালক কালটা ? নিজ নিজ ছোট্ট জগতে, স্ব স্ব ক্ষুদ্র-বৃহৎ এলাকায় উদয়াস্ত নির্বাধ ; শাসন-পীড়ন যা কিছু কষ্ট-যন্ত্রনা তৈরি করে তা শরীরের উপর দিয়ে তাৎক্ষণিক বয়ে যায়, মনের খেলাঘরে ছায়া ফেলতে পারে না। যারা গোপালের মতো সুবোধ-সুশীল তাদের কথা আলাদা ; তারা মন দিয়ে লেখাপড়া করে, যা পায় তাই খায়, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে এবং বড়দের নির্দেশ মতো রেখাচিহ্ন ধরে ধরে জীবনের নামতা-পথে ভবিষ্যৎকে উৎসর্গ করে গাড়ি-ঘোড়া চড়ার স্বপ্ন দেখে। তারা সার্থক হয়, সক্ষম হয়, স্বীকৃত হয়। কিন্তু শত শত ধুলো মাখা, ঝড়ে-জলে ভেজা, রোদে-পোড়া যে দুরন্ত-গেছো বাল্যকাল গ্রামবাংলার মাঠে-বাটে জলে-জঙ্গলে সূর্যের আলোর মতো বেড়ে ওঠে, বর্ষার জলের মতো ভরে ওঠে আর প্রান্তরের প্রসারে মনের মধ্যে প্রকৃতির মনচিত্রকে একাত্ম করে নেয় সেই বাংলার উন্মুক্ত বাল্যকাল কালে কালে কোথায় গিয়ে পৌঁছোয় তার কোনও ঠিকানা থাকে কি ? সকলেই হারিয়ে যায়। হারানোটা সাধারণ জনের বিধিলিপি, কেউ সম্পদের সংগ্রহে হারায়, কেউ দারিদ্রের অসহায়তায়। তবুও বলা যায় যে গোপালরা বাল্যকালটাকেও হারায়, জীবনটাকেও হারায় ; আর দুরন্ত-দুষ্টু গেছোরা বাল্যকে ধরে রাখে বলে সব হারিয়েও কিছুকে স্মরণের গভীরে খুঁজে পায়। একদল গোপালরা সামনে-পিছনে সবই অন্ধকার দেখে, অন্যদল 'অক্ষমরা' সামনের অন্ধকারে অতীতের প্রদীপ জেলে আলো ফেলার সুযোগ পায়।

তাই কলকাতার আত্মীয়টি শীতের হাতছানিতে মুগ্ধ হয়ে যখন বর্ষার ডাকে সাড়া দিতে গ্রামবাংলার একেবারে ভিতর বাড়িতে আসতে চাইবেন, তখন আমি তাঁকে খুলনা থেকেই সঙ্গ দেব বলে মনে মনে স্টিমার ঘাটে অপেক্ষা করতে থাকব। কলকাতার chemical ধুলোকাদা আর অ-প্রেম

শব্দ-ব্রহ্ম ছেড়ে বরিশাল Express-এ খুলনার steamer ঘাটে এসে তিনি নিজেই মানচিত্রগত পরিবর্তন টের পাবেন। বর্ষার জলকাদা ঘাটের পথকে খুলনাতেও পিছল করে কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দূষিত করে না, কথাবার্তা ঝগড়া-ঝাঁটি, দরকষাকষি এখানেও ছোট-বড় হ্রস্ব দীর্ঘ শীৎকারে চিৎকারে আকাশ-বাতাস মুখর করে তোলে কিন্তু তা প্রসারিত নদীবক্ষের অন্তরে আর প্রশস্ত নদীতটের ঢালে কেমন যেন ঢেউ ঢেউ হারিয়ে যায়, কর্ণকে পীড়া দেবার সময়ই পায় না।

আত্মীয়টি ভিড়ের প্রকৃতি জানতে ঘোনাপাড়ার গন্তব্য স্থির করেন নি, স্থির কবেছেন বর্ষার আবাহনে গ্রামবাংলার ভগীরথ রূপটিকে প্রত্যক্ষ করতে। তাই স্টিমারের গর্ভে মানুষের মুর্গি-লড়াই, যাত্রীদের দাপাদাপি-হানাহানি-কান্নাকাটি, কুলিদের দৌরাত্ম্য-ধূর্ততা ধড়িবাজি আর শিশুদের কান্না তাঁর কাছে যোগান-চাহিদার অসম-বিষম দুঃসহ প্রতিক্রিয়া বলেই মনে হবে। এক পাশে রেলিং-এর ধারে কায়ক্লেশ স্থানটুকুতে নিজেকে কোনওক্রমে স্থির রেখে তিনি তাই উত্তীর্ণ সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকার আকাশে তারাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে ব্যস্ত হবেন। কিন্তু তারা কোথায় পাবেন, আকাশ যে মেঘে ঢাকা!

স্টিমার ছেড়ে দেবে। গাঢ়-গম্ভীর শত-শঙ্খের কম্বু-ধ্বনিতে যাত্রা ঘোষণার পর সকলেই নিজ নিজ স্থান-পাত্রাপাত্র গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। চেঁচামেচি থেমে যেতে যেতে এক সময়ে আলাপাচারিতে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে। ওদিকে নদীর বাঁকে স্টিমার ঘুরতে গিযে সদ্য অভিজ্ঞের মনে ভয় ধরিয়ে দেবে বুঝি বা চক্র-বেষ্টন পাড়ের ধারে ঘন বনরাজির মধ্যেই ঢুকে যাবে, ধাক্কা খাবে। স্টিমারের সুতীব্র আলোয় অন্ধকাবের আবছা থেকে গাছ-গাছালির আড়াল হারিয়ে গৃহ বালিকারা, অঙ্গন বালকেরা দৌড়ে আসবে আসমুদ্র নদীর পাড়ে। তারা জলে উত্তাল ঢেউ তুলে স্টিমারেব বাঁক নেওয়া দেখবে গোল গ্লোল চোখ করে। আমার আত্মীয়ের মনেও ঢেউ ঢেউ বিস্ময় দানা দানা হয়ে তারাবাজি ছিটকাবে।

বছরের অন্যান্য সময়ে স্টিমারযাত্রীরা পাড়ে 'ওঠেন', কারণ তখন জলযানটি থাকে জলের স্বল্পতল নিম্নতলে। বর্ষায় নদী যৌবনাক্রান্ত সুপুষ্টতায় উদ্ধত-বক্ষ, প্রায়ই দুকূল প্লাবী, উত্তাল। তখন যাত্রীদের 'নামতে' হয় স্টিমার থেকে তিরতির ঘাস জলের ভিজেয় অথবা বাঁশ-কাঠের মাচানের শুকনোয়।

দূরে, গাছের নিচে, আর কাছে, সিঁড়ির পাশে, মাঝিরা অপেক্ষা করে ; স্বজনেরা পরিজনদের খুঁজে নেয়। আমরা আমাদের আত্মীয়কে নিয়ে নির্ধারিত নৌকোয় উঠে খাল বেয়ে বাড়ির পথে লগি চালাব ; হ্রস্বপ্রস্থ খালের জলে তরতর এগিয়ে যাওয়া আমাদের জন্যে পাশের ঝুঁকে পড়া সবুজ ডালপালারা তাদের করস্পর্শে স্নেহ জানাবে, পত্র-পল্লবের ঘন আদরে হস্ত-বক্ষ চুম্বন করে ভালবাসার আবাহনটুকু শিহরণের মতো সর্বাঙ্গে, সর্বঅস্তিত্বে ছড়িয়ে দেবে। আমাদের আত্মীয়টি বিভোর আনন্দে জলস্থলবৃক্ষরাজির এই ঐকান্তিক আত্মীয়তায় মুগ্ধ হবেন। দূরকে দেখা যায় না কারণ আত্মীয়দের, সদ্যপরিচয়ের স্বজনদের ভিড়ে দূর অদৃশ্য থেকে যাবে, নিকট তাই যেন অনেক ঘন-নিকট হতে সুযোগ পাবে। আমি বলব 'কিছু বলুন ? কেমন লাগছে এই স-জল চলন ? সবুজের আত্মীয়তা ?' তিনি একটি কথাও বলতে পারবেন না কারণ কথা তার ততক্ষণে হারিয়ে যাবে। প্রয়োজনের কথা সহজে বলা যায়, কাজের কথায় কখনও টান পড়ে না। কিন্তু অপ্রয়োজনের অনুভব বোবা হয়ে যায়, অকাজের কথায় অভিধানও কৃপণের মতো ব্যবহার করে। হয়তো বা শুধুই বলবেন, 'সুন্দর ! অতীব সুন্দর !'

ঘন গাছের ছায়া ঘেরা গ্রাম ছাড়িয়ে যখন নৌকোখানা প্রান্তরের ঠিকানায় আলোকিত বোধ করবে তখন আমাদের আত্মীয়টি দ্বিতীয়বার হতচকিত বোধ করতে বাধ্য। কেন ? তখনও আলো-আঁধারির ঘেরাটোপে, তখনও গাছেদের হার্দ-স্পর্শ-নৈকট্য ছেড়ে যায় নি কিন্তু নৌকোর গলুই বরাবর সামনে দিগন্ত-ব্যাপী আলোর উদ্ভাস যেন অলৌকিক বলে মনে হবে ! মনে হবে এই ছায়াঘেরা সবুজেমোড়া জীবনের প্রান্তই কি পৃথিবীর শেষ আর সূর্যের সুরু ? আলোর মধ্যে হারিয়ে যাবার একটা সম্ভাবনা বোধহয় তখন সমূহ হয়ে সবুজের tunnel-এর প্রান্তে অপেক্ষা করে আছে—এমন ধারণা অনভিজ্ঞের মনে হতেই পারে ! এবং হঠাৎই যেন তমসা থেকে জ্যোতির্গমন ঘটবে, প্রান্তরের প্রশান্ত ব্যাপ্তির মধ্যে। আদিগন্ত সেই আলোর বন্যায় হারিয়ে যাওয়াটাই কি স্বাভাবিক নয় ?

জেলা-সড়কের পাশে পাশে সমান্তরাল কাটাখালের অনাবিল জলে তরতর করে নৌকো এগিয়ে যাবে। রাস্তার কোথায়ও নৌকোর তাড়ায় ঢেউ-ঢেউ জল গড়িয়ে গড়িয়ে রাস্তাকে স্নান করাবে, কোথায়ও রাস্তাটা উঁচু বলে জলের

ঢেউগুলো ঘাস-মাটির কাঁধে ধাক্কা খেয়ে আবার নৌকোর দিকেই ছুটে আসবে। নৌকোর গলায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে জলের রেখাগুলো সারিসারি একটা পশ্চাৎ রেখার আলপনা তৈরি করে করে ছড়িয়ে যেতে চাইবে। আর তখন ফিরে ফিরে আসা তরঙ্গ-ভঙ্গের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে, একে অপরের ঘাড়ে পড়ে, আনন্দে আটখানা হয়ে উঠবে। নৌকোর ঠিক মাঝখানে, পিছন বরাবর একটা furrow তৈরি হয়ে হয়ে নৌকোর সঙ্গে একই গতিতে যেন আমাদের সঙ্গী হয়ে পিছু নেবে। যেন আমাদের নৌকোটাকে ধরার চেষ্টায়, ছুঁয়ে দেবার বাসনায় সেই furrow-টি নিরলস ধেয়ে আসতেই থাকবে। আমি বলব, 'দেখুন, দেখুন! নিশ্চল প্রকৃতি সচল হলে কেমন সুন্দর হয়, কেমন চপলতা প্রকাশ করে তা দেখুন।' তিনি বলবেন, 'এমনটি আর আগে কোথায়ও দেখিনি, কখনও দেখিনি।'

আমরা সবাই সব দেখিনা। দেখিনা কারণ আমাদের দেখার চোখ আলাদা, কারণ দেখার পিছনে একটা মনের চোখ লাগে, প্রস্তুতি লাগে, অভ্যাস লাগে। কবিরা সুন্দরকে সহজেই দেখতে পান, বিজ্ঞানীরা সত্যকে, দার্শনিকেরা তত্ত্বকে আর সাহিত্যিক জীবনকে। প্রকৃতিব অন্দরমহলে আমাদের মন যেমন চেতনার রঙে বিষয়-বস্তুকে রাঙিয়ে নেয়, পান্না রঙে নিজেও তেমন নিজের চেতনাকে রঙ ধুবিয়ে নিতে পারে। জলে-সবুজে মাখামাখি সেই তেপান্তরের সিঁথি বেয়ে আমাদের ভাসমান যাত্রা পথে দৃষ্টির মহাভোজের যে আয়োজন আদিগন্ত ছড়ানো, আর মনের মনোহরণ অনুভবের যে ভূরিভোজের চিত্রকল্প ব্যবস্থা চারদিকে প্রসারিত তা দেখার চোখটি অবশ্যই শহরে তৈরি হতে সুযোগ পায় না। আমি বলব, 'ঐ দূরে, বহু দূরে তাকিয়ে দেখুন আবছা আবছা গ্রাম রেখাগুলো কেমন জলের গভীরে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে স্নানরতার তুলিতে-আঁকা-স্থিরচিত্র হয়ে অপেক্ষা করে আছে। আর এই কাছে, একেবারে নৌকোর ধারে ধারে, চপল জলপ্রাণীদের তীক্ষ্ণ গতি ছুটোছুটি দেখুন। নৌকোর তাড়ায় অথবা শত্রুর তাড়নায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুপোলী মাছেদের প্রাণ-ওষ্ঠাগত পলায়ন তৎপরতা দেখুন, দেখুন, যেখানে সড়কের উপর এক দেড় ইঞ্চি কাকচক্ষু জল সূর্যের তাপে পিঠ দিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, কেমন অনায়াস ত্বরিৎ-গতিতে চুচড়ো-পুঁটি-তেচোখা মাছের চঞ্চলমতি শিশু সন্তানেরা এপার-ওপার ছুটোছুটি করে খেলায় মত্ত!

কোথায়ও দু'চারটি দীর্ঘদেহ ঘাসের গোড়ায় অথবা এক-আধটুকরো কচুরিপানার গুচ্ছমূলের চার পাশে, মাতৃস্তনে দুগ্ধ পানের মতো, দলবদ্ধ মৎস্য শিশুদের জটলা। সরীসৃপ-লিকলিকে শরীর নাম-না-জানা জলজ প্রাণীদের দ্রুত পিছলে যাওয়া অষ্টবক্র বিদ্যুৎ চলন দেখুন। যেন এক একটা রোদের ঝিলিক্ হয়ে ওরা ছুটে চলে যাবে। আবার তারই পাশে দেখুন দু'একটা শামুক কেমন কুব্জ দেহ ন্যুব্জ পৃষ্ঠ অফুরন্ত-অবকাশ বৃদ্ধের গতিহীন চলনে এগিয়ে চলেছে। গতি আছে কিন্তু গন্তব্য আছে বলে মনেই হবে না!"

নৌকোর ডালার ধারে বসে আমার অতিথিটি এ-সব দেখে শুনে হয়তো নিজের মনের গভীরে ডুব দেবেন, আবার বাইরের প্রকৃতির অন্দরমহলে ভাসিয়ে দেবেন কল্পনার তরীকে। এমন সময়ে হয়তো হঠাৎই অনেক দূরে থেকে ভেসে আসা সাঁই-সাঁই শব্দে তাঁর তন্ময়তা কেটে যাবে। শব্দের উৎস খুঁজতে ইতি-উতি আন্‌চান্ তাকাবেন। আমি বলব, বৃষ্টি আসছে, ঝাঁক বেঁধে দলবদ্ধ ছুটে আসছে। ক্ষণমাত্র বিলম্ব হলেই ভিজে জব্‌জবে হয়ে যাবেন। দ্রুত ছৈ-এর মধ্যে চলুন!' আর তখনই ছর্-ছর্ করে সুরু করে ছড়্-বড়্ তড়্-বড়্ ছুটে যাবে বৃষ্টির ঝাঁক-ঝাঁক ফোঁটাগুলো। তারা নৌকোর কাঠে পড়ে খল্‌খল্ ছিট্‌কাবে, জলের অনাবৃত বক্ষে আঘাত করে করে খিল-খিল নেচে উঠবে। 'কোথায়ও কিছু নেই, আকাশে মেঘের দেখা মাত্র নেই, অথচ এই বৃষ্টি এলো কোথা থেকে? কেমন করে?' অতিথির মৌসুমী জ্ঞান ধোঁকা খাবে কিন্তু 'শিয়াল-কুকুরের বিবাহ-উপলব্ধি সজীব হয়ে উঠবে। আমি হয়তো আনন্দে মশগুল হয়ে, দেবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই জেনেও গেয়ে উঠবো, 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেবো মেপে।' প্রকৃত পক্ষে ধান পাবার কোনও সম্ভাবনা আছে কি নেই সে বিষয়ে দৃকপাত না করেই বৃষ্টি ঝেঁপেই হতে থাকবে। তবে কিছুক্ষণ। তার পরেই সে হঠাৎ উধাও হয়ে যাবে। নেই তো নেই, একেবারেই নেই হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ দ্রুত অপসৃয়মান সেই দলবদ্ধ ধোঁয়া-ধোঁয়া বৃষ্টি-দৃষ্টি আমাদের মনকে ধরে রাখবে, সবুজের frame-এ বাঁধাই, সূর্যালোকের রঙে রাঙানো সেই জলে-আকাশের মিতালিটুকু পাকাপাকি মনের দেয়ালে টাঙানো থাকবে। সেই ছবি কি শহরে গিয়েও খুলে ফেলা যাবে?

রাইতকান্দির পাশ দিয়ে, জনমানবহীন জলপ্রান্তর পার হয়ে, আমডহ-র ভিতর দিয়ে, দ্বীপস্থিত বিদ্যালয় গৃহসমূহকে ঐ দূরে রেখে আমরা এক সময়ে পেঁছে যাবো আমাদের বাড়িতে। নৌকো ছাড়া গতি নেই, জল ছাড়া পথ নেই, বর্ষার জলে জলমগ্ন গ্রাম দেখে দেখে আমার অতিথির মনে কি একটু একটু ভয় দানা বেঁধে উঠবে ? নিরপরাধ এই দ্বীপান্তর বাস ! স্বেচ্ছা নির্বাসন ! দেখে দেখে চিত্ত তাঁর হবে কি বিকল ? জল শুধু জল। ভূগোলের সব জ্ঞান কি সন্দেহের দোলায় দুলে যাবে ? তিন ভাগ নয়, শত ভাগ, সহস্রভাগ জল বলে মনে হবে না ? মাঠ নেই, ঘাট নেই, প্রান্তর গেছে হারিয়ে। যতদূর চোখ যায়, কাছে দূরে আরও দূরে, বহু দূরে, জলে জলে জলময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। মাঝে মাঝে আবক্ষ নিমজ্জিত মাইলের পর মাইল ব্যবধানে কায়ক্লেশ জেগে থাকা ধুধু গ্রামের চিহ্নগুলো যেন শুধু দূরত্বকে সসীম থেকে অসীমে বাড়িয়ে দেবার প্রতীক হয়েই প্রতিভাত। কোথায় সেই দূর্বাদলশ্যাম প্রান্তর, কোথায় গেল শস্যশীর্ষে বাতাসের সকাল দুপুর সন্ধ্যার আন্দোলিত আনন্দব্যজন ? কোথায় হারাল পাণ্ডুবর্ণ টাক্‌পড়া অবসন্ন মাঠের সেই বিষণ্ণ অস্তিত্ব ? কখন এলো, কেমন করে এলো এই অগাধ-অঢেল জলরাশি ? আগে বাড়ি-ঘর-গ্রামগুলো আশেপাশের এলাকাকে শাসনে রাখত ; এখন তারা সবই থৈ-থৈ জলের মত্তপাগল যৌবনের প্রাচুর্যে চারদিকে বাঁধা পড়ে গেল। এখন গভীর জলের পাতলা প্রান্তগুলো যেন উঠোনের মসৃণ দেহে আর দাওয়ার ঋজু শরীরে আদরে-আপ্যায়নে সরস-সজল করে রেখেছে। ঝাঁক বেঁধে মাছের দল মুক্তির আনন্দে সেই উঠোনের স্বল্প জলে আর দাওয়ার ধারের স্বচ্ছ জলে জল-কেলি করতে করতে ছুটোছুটি করছে। প্রত্যেক বাড়ির ঘাটে নৌকো, ডোঙ্গা, ছিপ বাঁধা। তারা জলের ছোট-বড় চঞ্চলতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নৃত্যরত। দর্শকের মনে আনন্দকে সঞ্চারিত করে দেবার কোনও ব্যবহারিক প্রয়োজন বোধ থেকে নয়, বাংলাদেশের ভরাট-জল যৌবন-মনটি নিজের আনন্দেই নিজে মশগুল। জল-স্থল-অন্তরীক্ষের সঙ্গে একাকার হয়ে সুন্দরের আবাহনে একাত্ম। বর্ষার টৈ-টম্বুর পূর্ণতায় বাংলার সজল-মন দিক্‌-হারা মিলনে সামিল হয়ে ওঠে।

সব দেখে শুনে তীব্রগতি বেগবান আধুনিক সভ্যতার মধ্যমণি শহরের অধিবাসী আমাদের অতিথি বলবেন, 'এতো অসীম একাকিত্বে নির্বাসন,

যোগাযোগহীন জীবনে প্রকৃতি-প্রক্ষিপ্ত অস্তিত্ব।' তাঁর কথা শুনে মৃদু-মৃদু তরঙ্গের হাসিতে বাংলার প্রশান্ত প্রাণটি নিজেকে প্রবাহিত-প্রসারিত করে বলে উঠবে, 'বেগ নয়, আবেগেই জীবন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে সমগ্রের সঙ্গে মিলনেই জীবনের সম্পূর্ণতা। ছোট ছোট প্রয়োজনের নিষেধের 'আইল'-গুলোকে তুচ্ছ করে, 'হালটের' বিভেদকে পার হয়ে, পুকুর-পাড়ের বাধাকে অতিক্রম করে এই যে গৃহের সঙ্গে গৃহের, গ্রামের সঙ্গে গ্রামের আর জলের সঙ্গে স্থলের, জল-স্থলে-আকাশের মিলন, এই মিলন নির্বাধ, নিঃসীম এবং সনাতন। বর্ষা সেই মিলনের কাল, প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সময়। মনের তরী বেয়ে বিভেদের তীর-উত্তরণের অবকাশ এনে দেয় বাংলার বর্ষাকাল। বর্ষা ঢেউ হয়ে হয়ে মনের কালিমা ধুয়ে দেয়, গান গেয়ে গেয়ে দূরকে করে নিকট, নৃত্যছন্দে মনের আনন্দে বহুকে করে এক। একাকিত্ব সৃষ্টিতে নয়, একাকিত্বের মুক্তিতেই অতলান্ত-আদিগন্ত জলতলের সত্যটি প্রকাশ পায়।'

শহরের অতিথি ভাববেন, 'তাইতো! এমন করে তো ভাবিনি। শহরে আমরা বহুর ভিড়ে হারিয়ে যাই। সকলেই সেখানে পাশাপাশি, কাছাকাছি থেকেও একা থাকি। শতসহস্র জনবহুলতার মধ্যেও সেখানে একাকিত্বটি ঘুচতে চায় না। আর এখানে? এখানে সবই একাকার। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মিলেমিশে একাকার। গ্রাম-মাঠ-জলের মহাসাগর কোথায় শেষ হয়েছে, কোথায় আকাশের সীমা এসে থেমেছে তাও যেমন বোঝা যায় না, তেমনি মানুষের মনের ঠিকানাও যেন এখানে-ওখানে-সেখানে ঘুরে ঘুরে একে অন্যের জন্যে আঁকু-পাঁকু করে।' মোহিত দৃষ্টিতে তিনি দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকবেন; বোধহয় নিজেকেই খুঁজবেন।

বাংলার গ্রামে বর্ষাকালে চাঞ্চল্য নেই কিন্তু গতি আছে। সবই হচ্ছে, সবই চলছে, সকলেই শত কাজে ব্যস্ত থাকছে। যা নেই তা হল হুড়োহুড়ি। ছেলে বুড়ো জেলে-দোকানী যে যার কাজে নৌকো করে একা একা বা সকলে মিলে চলেছে। পাঠশালা আছে বিদ্যালয় চলছে, মাছ ধরা আছে ধান কাটা আছে, এ-বাড়ি ও-বাড়ি কারণে-অকারণে যাতায়াত আছে, দোকান আছে, বাজার আছে, হাট আছে। সবই আছে এবং সবই হচ্ছে। আত্মীয়স্বজনদের আসা যাওয়া আছে, 'নাইওর' আছে উৎসব অনুষ্ঠান আছে। সবই আছে গ্রাম্য জীবনে। নেই শুধু হাড়ভাঙ্গা দৌড়ঝাঁপ আর ঘাড়-ভাঙ্গা হন্তদন্ত ভাব।

তাই কাজের মধ্যে মধ্যে ভাবভালবাসার দু'টো কথা এবাড়ি-ওবাড়ি, এনৌকো ও নৌকোয় ভেসে যেতে পারে, ভেসে-ভেসে আসতে পারে। কুশল বিনিময় দ্রুত পথ চলার শহর-অভ্যাসের মৃদু-হাস্যে শেষ হয় না। আনুষ্ঠানিক নয়, হার্দিক। তাই খুড়ো-জ্যেঠা থেকে ভাইপো-ভাইঝি হয়ে সদ্যজাত শিশু-প্রসূতি হয়ে তেমাথা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত অনায়াস সাবলীল হতে পারে। মুখের খবর-কথা নয়, অন্তরের বার্তাবিনিময়। ও-গ্রামের আহম্মদ সদলে নৌকো ভিড়ায় এ-গ্রামের চক্রবর্তী বাড়ির ঘাটে। এ-গ্রামের বোসেরা চলে যায় সে-গ্রামের জব্বারের খোঁজে। সনাতন-হাদান-গুরুবর-রা সঙ্গ দেয়, খোঁজ নেয়, খবর বিনিময় করে। শস্য-ফসলের, জল-মাছের, শিশুকিশোরের আর পরিচিত-অপরিচিত জনের। যারা আছেন তাঁদের, যারা এখন নেই তাঁদেরও। শহরের খবর পোঁছোয় গ্রামে, গ্রামের খবর রওনা দেয় শহরে। এ-সবের কিছুই পরি-কি-মরি ব্যস্ততায় ঘটে না, ধীরে সুস্থে হুঁকো-কলকের গুরুক্-গুবুক্ তালে, লয়ে, ছন্দে ঘটতে থাকে। এঁদের সময় ঘড়ির কাঁটার যান্ত্রিক চলনে টিক্‌টিক্ করে চলে না বলেই এঁরা সময়ে সম্পন্ন ; সূর্যের প্রাকৃতিক প্রহর গণনায় এঁদের সময়-বোধ পরিচালিত। তাই এঁরা নষ্ট হবার মতো সময় খুঁজে পান না।

বর্ষায় বাংলার গ্রামে গ্রামে ঢাউস ঢাউস গাদা নৌকোয় করে চরের মাটি আসে দূরদূরান্ত থেকে। সেই মাটি উঠোনকে উঁচু করে, বাড়ির সীমানাকে বাড়িয়ে ক্রমশ বেড়ে ওঠা পরিবারের গৃহ-সংস্থানের বন্দোবস্ত করে। আবার মালদার বড় বড় ফজলী আমের চালান নিয়ে এ গ্রাম সেগ্রাম এঘাট সেঘাট করে ব্যাপারী রসালের যোগান দেয়। রসাল ফল, রসাল বাক্যালাপ, রসাল জীবন উপাখ্যান। মনোহারী দ্রব্যসামগ্রীর চালান আসে ; কাঁচের চুড়ি, তেল আলতা সিঁদুর, চুলের ফিতে, বেলোয়ারীর ডজন ডজন চিক্‌মিক্। মেয়েরা ঝুঁকে পড়ে, গৃহিনীরা ভেঙে পড়ে, পুরুষেরা হাস্যমুখে প্রমাদ গোনে! বেনারস থেকে নৌকো বেয়ে আসে বেনারসীর সম্ভার, আসে ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল, আর যশোর খুলনার তাঁতের শাড়ী। বর্ষায় গ্রাম বাংলায় জাগরণ আসে, মেলামেশা বাড়ে, চেনাজানার প্রসার দীর্ঘ বাহু মেলে দূরদূরান্তকে কাছে টেনে নেয়। সম্বৎসরের বিবাহ উৎসব প্রীতি উপহার, পুজো গণ্ডার প্রয়োজন আর ঈদের উপঢৌকন—সবই পরিকল্পনা করে করে, আশা করে করে সংগ্রহকে

আনন্দভাণ্ডার করে তোলার সময় এই বর্ষাকাল। বর্ষাকাল তাই জলবাংলার অপেক্ষার কাল, প্রতীক্ষার অবসান।

থৈ থৈ জলে নৌকো করে বৌরা যাবেন বাপের বাড়ি। ছৈ ঢাকা নৌকোর দুই পাশে শাড়ী ধুতির পর্দা এঁটে ছেলে মেয়েদের নিয়ে মা যাবেন শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি। অন্য সময়ে দূরত্ব পার হওয়াও যেমন শক্ত, সময় বার করাও তেমনি কষ্টসাধ্য। বর্ষায় দীর্ঘ ছুটি, তাই নৌকোযাত্রায় শক্তকেও সহজ কবে কষ্টকেও আনন্দে ভরিয়ে দেয়। মাঝির কাজ দু'টি ; এক নৌকো চালনা কবা, দুই যেমন হোক তেমন গলায় গান গেয়ে মনকে মাতিয়ে রাখা। কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে মা-বাপের কোলমুখী বিবাহিতা কন্যারও দুটি কাজ ; মনের উথাল পাথাল আনন্দ শিহরণকে হৃদয়ের হাঁড়িতে পরিবেশের সরা দিয়ে ঢেকে রাখা, আর দুষ্টু ছেলেটির বা ছেলেদের নৌকোব সুরক্ষিত শাসনে রাখা। ওরাতো গলুইএ বসে শুয়ে জল ঘাঁটতে ঝুঁকে পড়বে! না হলে শাপলা ফুলের মাথা ধবে টান মারবে। যদি পড়ে যায় ?

সব বাড়ির বৌরাই তো বাপের বাড়ি যাবে, অনেকে আবার 'নাইওর' যাবে। এই যাতায়াত পথের মধ্যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তবের সম্পর্ককে তাজা করতে করতে যাবে। চেনা পরিচিত আত্মীয় স্বজনদের গ্রামে থেমে থেমে যাবে। খবর দেওয়া নেওয়ার এটাও এক গ্রাম্য মাধ্যম। মনের লেনদেনে প্রাণের স্পর্শ লাগে। জীবনে জীবন যোগ করা হয়, গ্রামবাংলার গানের পসরা সার্থক হয়ে ওঠে।

সব জেনে অতিথি বলবেন, 'গ্রামের বর্ষা-জীবন আরও শুনতে চাই, জানতে চাই, আর অনুভব করতে চাই প্রকৃতি-জীবন, সুন্দরের বিচিত্র প্রকাশ।' আমি শুনে বলব, 'তাহলে তো সময় চাই, নৌকো চাই এবং তার চাইতেও যা বেশি চাই তা অলস-নিরুদ্দেশ ভেসে পড়া।' অতিথি বলবেন, 'সময়ের অভাব পড়বে না। তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে জল জীবনের মাঝখানে নিয়ে চল, প্রকৃতির মধ্যে জল-সুন্দরের সঙ্গে একে একে পরিচয় করিয়ে দাও। আমার মন আনন্দে নেচে উঠবে। মনে হবে বর্ষার বাংলা-প্রকৃতি যেন আমার নিজস্ব ধন, আমার জীবন-সংগ্রহ, আর তাই শহরের অতিথি সেই আমার একান্ত আপনের জন্যে উতলা হয়েছেন, তাকে কাছে থেকে জানতে চাইছেন, সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে চাইছেন।

নৌকো নিয়ে দ্'জনে সকালেই ভেসে পড়ব। আজ আর লগি নয়। লগির প্রতিনিয়তর ধাক্কার মধ্যে নৌকোর যে গতি তা যেন ছন্দ হারায়; তাই বৈঠার ধীর গতি চলনকেই বেছে নেবো। বৈঠার ম্দ্ টানে যেন নৌকো নয় আমরাই গতি পাই, এগিয়ে যাই, অথচ কিছুই হারায় না। আমি বলব, 'প্রথমেই দেখুন বৈঠা কেমন জলের বুকে আমুন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে, কেমন তরঙ্গের ঘূর্ণিতে নিজেকে অবগাহন করায়, জল কেমন মৃদু আবেগে থৈ-থৈ কেঁপে কেঁপে বৈঠাকে জড়িয়ে ধরে, ঠেলে দেয়। আর যেই না বৈঠাখানাকে সেই জল ধাক্কা দিয়ে আকাশে তুলে দেয়, অমনি কেমন নিজেকে, নিজের আলুথালু তরঙ্গ-শিহরিত দেহ-বক্ষখানিকে বিস্রস্ত আঁচলের শান্ত আড়ালে আবার ঢেকে দেয়। লগি বা 'চ'ড়ে'-র সঙ্গে জলের এই তাল-মিতালি আপনি বড় একটা দেখবেন না। কারণ বোধহয় এই যে লগিকে ওরা আপন বলে মনেই করে না—'ওরা' মানে জলের নিটোল উপরিতল আর জলতলের নিচের নম্র-নত ধরনীতল। লগির ঘায়ে জল আহত বোধ করে, মাটি আঘাতে-আঘাতে বিক্ষত হয়। তাই বৈঠা ওদের উভয়েরই প্রিয়; জলের প্রিয় সে চঞ্চল করে বলে, মাটির প্রিয় সে আঘাত দেয় না বলে।'

গলুই এর কাছাকাছি 'চরাটে'-র উপর বসে অতিথি আমার কথা শোনার চাইতে জল-নৌকোর মৃদু-মৃদু কল-ভাষণে মন দিয়েছিলেন বোঝা গেল। বললেন, 'তোমার কথা পরে শুনব। চলমান নৌকোর গলায় লেগে স্থির জল কেমন ক্রমাগত চঞ্চলতা প্রকাশ করছে, নিম্নকন্ঠ কল-ধ্বনিতে মনের আনন্দকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে আর শিশু-সুলভ আহ্লাদে নৌকোর ধারে ধারে গড়িয়ে গড়িয়ে সুখের অনুভবকে তরঙ্গের অনুভঙ্গে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে! দেখে শুনে আমার মনে হচ্ছে আমিও নৌকো থেকে নেমে ওদের সঙ্গে, ওদের মতোই, নৌকোর গলার সংগে ভাব জমাই!'

আমার মনে হবে অতিথি নিজেই যখন জলের কলতান শোনার কাজটি পেয়ে গেছেন তখন ওঁর অন্তরের চোখটিও নিশ্চয়ই খুলতে দেরী হবে না। বললাম, 'চলন্ত নৌকো যখন জলের শান্ত বক্ষখানিতে গতির চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তা যেমন মধুর, তেমনি মধুর স্থির-নিশ্চল নৌকোখানির জলে অর্ধমগ্ন দেহপৃষ্ঠে ঢেউ-ঢেউ উছলে পড়া জলের আনন্দ-ভঙ্গ আছড়ে আছড়ে পড়ার দৃশ্য-শব্দ। সময় হলে আপনাকে সেই প্রকৃতি-প্রেমের, নৌকো-জলের, মিলন

সংগীত শোনাব, প্রেম-চঞ্চল দৃশ্য দেখাব। জলে শুধু স্রোত থাকলেই হবে না, প্রিয়ম্বদারূপ বাতাস-সখীর খিলখিল হাসিটিও চাই। নদীর ধারে যখন নৌকোগুলো নীরব দড়ি-বাঁধা দাঁড়িয়ে থাকে তখন তীরে বসে দূর থেকে ধেয়ে আসা ঢেউগুলো কেমন ছলাৎ-ছলাৎ করে নৌকোর দেহে আঘাত করে করে তাকে উতলা করে তোলে, কেমন মন কেমন কবা থিরি থিরি কম্পন তোলে তা সময় পেলে অবশ্যই দেখাবো। আব যদি তখন চারদিক শব্দহীন পাওয়া যায় তাহলে কান পেতে নৃত্য-রত সেই নৌকোর হৃদয়খানির অব্যক্ত গান আর ঢেউ-ভাঙগা ঢেউ-ভাঙগা সেই জলের মৃদু-উচ্চারিত তান-সঙগীত শুনবেন। জীবনে ভুলবেন না।' অতিথি বলবেন, 'নদী ছাড়া কি সেই দৃশ্য-শব্দ-সঙ্গীত আর কোথায়ও পাওয়া যাবে না ?' আমি বলব, 'কেন পাওয়া যাবেনা —নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আমাদেব বাড়িব ঘাটেই পাবেন। ঘাটে নৌকো থাকবে বাঁধা। আসমুদ্র-প্রসার জল-দিগন্ত থেকে বাতাসের প্রবাহ ঠেলে ঠেলে আনবে শকুন্তলাদের ; জল-বক্ষের মৃদু আন্দোলনে নৌকাখানির হৃদয় একবার উঠবে একবার নামবে। এই নৃত্যপর নৌকো জীবনই তো নৌকো জীবনের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। আর সেই হৃদয়ের আনন্দে ছন্দে ছন্দে আছড়িয়ে পড়া, দূরাগত প্রেয়সীর মত, তিরতির তরঙ্গ-শ্রেণী নৌকোকে করবে উদ্বেল, নিজেরা খিলখিল করে জড়িয়ে-ছড়িয়ে দৃশ্য-শব্দ-সঙ্গীতের হাট বসিয়ে দেবে। দড়িব বাঁধনে আর পাড়ের শাসনে নৌকোকে তখন হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাটি বিসর্জন দিতে হবে। কিন্তু যদি কোনও নৌকো সেই বাঁধন ছিঁড়তে পারে, পাড়ের শাসন উপেক্ষা করতে পারে তাহলে ? মাভৈঃ ! আলগা-দড়ি 'মনের' টানে আরও আলাগা হয়ে হয়ে এক সময়ে খুলে যেতে পারে, পাড়ের শাসন শতশত ঢেউ-এর আদরে ম্রিয়মান হয়ে আসতে পারে, আর তখনই নৌকো চলে যাবে ভেসে ভেসে, নেচে নেচে। শত-সখী তরুণী-তরঙ্গরা সকলে মিলে সেই প্রিয় নৌকোকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাবে একেবারে তাদের জীবনের মাঝখানে। তখনকার সেই আনন্দ-অভিসার যাঁরা না দেখেছেন তাঁদের জীবনই বৃথা !'

অতিথি তখন দূর গ্রামের ধূসর ছবিতে দৃষ্টি রেখে কল্পনাকে স্বাধীন করে দেবেন। চারধারের অথৈ জলরাশি আর অস্পষ্ট দিকচক্রবালের পটভূমিতে হয়তো একা একখানা তরীকে তিনি শত-সখী জল-তরঙ্গের লীলা-চাপল্যে উথাল-পাথাল দেখবেন। হঠাৎ প্রশ্ন করবেন, 'তুমি দেখেছো ? আমাকে

দেখাবে ? দেখাতে পারবে ?' আমি বলব, 'সে আর বেশি কথা কি ! এই খেলা তো প্রায় রোজই হয়, সর্বক্ষণই হতে পারে। প্রয়োজন মনকে সুন্দরের জন্যে একাগ্র করার। বাংলার বর্ষায় সুন্দর তো চারদিকেই ছড়ানো।' তার পরে অতিথির মনের হদিস্ পেয়ে বলব, 'সেই শত-সখী-বেষ্টিত একা একা ভেসে যাওয়া নৌকোখানা নেচেনেচে নিজের আহ্লাদকে সকলের মধ্যে তির-তির ছড়িয়ে দিতে দিতে বাতাসের টানে যে কোথায় কতদূরে চলে যাবে তা কে-জানে ? এই দড়ি ছেঁড়া শাসন-ভাঙ্গা উদাসী প্রেমিক কখনও কোন ধান ক্ষেতের ঘন সবুজ কার্পেট-গাত্রে, কখনও বা কোনও ঝাঁকড়া-পাতা ডাঁট-ডাল হিজল গাছের জটাজালে অথবা বেত-ঝোপের কণ্টকাকীর্ণ ঘেরাটোপে আটকে গিয়ে থেমে যাবে। থেমে যাবে আর বেদনাকে প্রক্ষিপ্ত একাকিত্বে পান করে বিমর্ষ হবে। হারিয়ে যাবে সব নাচ, সব আনন্দ সব গান। আর তখনই হয়তো মালিকের হেঁচকা টানে আবার ঘটবে দড়ির দৃঢ় বাঁধন। পাড়ের কঠিন শাসন।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অতিথি বলবেন, 'বড্ড ট্রাজিক! নৌকোর জীবনে এই ট্রাজেডিটুকু না থাকলেই কি চলত না ?' আমি বলব, 'তা হলে তো সুন্দরও তেমন করে সত্য হয়ে উঠতে সুযোগ পেত না !'

বোধহয় নৌকোর এই হারিয়ে যাওয়ার প্রতি মালিকের নির্মম মানাটুকু অতিথির মনে অসীম বিষণ্ণতা সৃষ্টি করে থাকবে। তিনি উদাস মনে অনির্দেশ্য তাকিয়ে তাকিয়ে তাই হয়তো কোনো একা তরীর সাত-সাগরের ফেনায় ফেনায়, দূরাগত ঢেউএর তালে তালে, হারিয়ে যাওয়াকে প্রত্যাবর্তনহীন করে ভাবছিলেন। আমি বললাম, 'আপনার দুঃখের কারণ নেই। নৌকোরা, বিশেষ করে ছোট ছোট, বয়সে নবীন স্বাস্থ্যে তরুণ তরীরা বীচি-ভঙ্গ জল-ছন্দে বেশিদূর ভেসে যাবার সুযোগ না পেলেও জলের গভীরে আকণ্ঠ আগলুই নিমজ্জিত থেকে অফুরন্ত জলকেলির সুযোগ পেয়ে থাকে। আপনাকে দেখাব, তখন জলপ্রেমের কাকচক্ষু পবিত্রতায় সেই সব তরীসকল ঢেউ-এর ঊর্মি-আঁচলের প্রিয়-পরশের নিচে কেমন আনন্দ-অবগাহন করে। আয়নার মতো দৃশ্যমান জল-মনের ধেয়ে ধেয়ে আসা তরঙ্গ-ভঙ্গ আদরে-আহ্লাদে জলমগ্ন তরীরা কেমন জলপরী জলপরী বলে মনে হয়। তখন সেই নৌকোর ঘুম ভাঙ্গাতে, তাকে টেনে তোলা কংসের নির্দয় হৃদয় ছাড়া আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয় !

ততক্ষণে আমরা অনেকদূর চলে যাব। জিলা-সড়কের ধার বেয়ে বেয়ে অনেক দূর চলে এসে আমরা কচুরিপানার দেখা পাব। একটা দু'টো করে করে একসময়ে অনেক, অনেক কচুরিপানা আমাদের প্রথম প্রথম অভিবাদন জানাবে, আমরা যখন নৌকো নিয়ে এগিয়েই যেতে থাকব তখন ওরা নানান ভাবে অভিমান জানাবে, প্রতিবাদ জানাবে এবং সব শেষে বিরোধ বাধিয়ে দেবে। অতিথি জানতে চাইবেন, ওরা, ঐ কচুরিপানারা, এতো সব করবে কি ভাবে?' আমি বলব, 'সেই মজাটাই এখন দেখুন এবং শুনুন। এতক্ষণ পরিষ্কার টলটলে জলে বৈঠার টানে তর-তর করে জলের মৃদু মৃদু কলকল ছলছল প্রেমালাপ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পান নি। নৌকোর তলদেশে বাধা পেয়ে পেয়ে বীচিভঙ্গ ঊর্মিমালায় তরঙ্গ সকল খিলখিল করে হেসে উঠেছে আর দূরে সরে যেতে গিয়ে অন্যসব ধেয়ে আসা ঢেউয়ের সঙ্গে জড়াজড়ি করে শত শত অনুভঙ্গে ঢলে ঢলে পড়তে দেখেছেন। এবারে কান পেতে নৌকোর গলায়-ঘাড়ে কচুরিপানার একটা দু'টোর স্পর্শ কেমন খস্ খস্ সির্ সির্ আওয়াজ তুলছে তাই শুনুন! আমাদের পেয়ে স্বজন আগমনের আনন্দে ঐ পানারা একে একে আমাদের অভ্যর্থনায় ওদের পানা-শ্যামল দেহখানি দিয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে। ওদের সংখ্যা যেমন বাড়ছে ততই ওরা দলবদ্ধ আলিঙ্গনে আত্মীয়তা ঘোষণা করেছে। আমরা ওদের কথা শুনছি না, এগিয়েই চলেছি। তাই ওদের অভিমান স্বাভাবিক নয়? ওদের স্পর্শ-কণ্ঠে তাই ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। এটা প্রতিবাদের ভাষা। এবারে ওরা তাই দধীচির মতো নৌকোর তলায় কাতারে কাতারে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রতিবাদের বজ্র নির্মাণে ব্যস্ত। ওরা শত-শহস্র একসঙ্গে মিলে নৌকোটিকে কণ্ঠরোধে সংঘবদ্ধ বিরোধিতায় মত্ত। আমাদের গতি হঠাৎই বন্ধ হয়ে যাবে। পানার সবুজে জলের প্রেমিক তরীখানি নিজেকে আবদ্ধ দেখবে।'

পানা সমূহের এ'মতো ব্যবহারে আমাদের গতি থেমে যাবে। অতিথি আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকবেন। হয়তো ভাববেন উদ্ধারের পথ কোথায়? আমি বলব, 'বিপদের মধ্যেও হাল ছাড়া উচিত নয়। আমরা এসেছি বাংলার জলজীবনে সুন্দরের খোঁজে। তাই তাকেই খুঁজুন!' অতিথি বিমর্ষচিত্তে আমার আশার কথা শুনবেন কিন্তু ভরসার দেখা পাবেন বলে মনে হয় না।

তাই পানা-নিবন্ধ-এর স্থির চিত্র-টি হয়ে আমি অতিথির দৃষ্টিকে প্রশস্ত পানা-সাগরের দিকে আকর্ষণ করে বলব, 'আপনি কি আপনার সামনে, সবুজের ঘনবুনোট কার্পেটের মধ্যে, পুঞ্জ পুঞ্জ পানা-ফুলের আকাশ-দৃষ্টি আনন্দ-শিখাগুলি দেখতে পাচ্ছেন না? সাদা-বেগুনী সুসজ্জিত কচুরি ফুলগুলো শত শত সহস্র সহস্র জলের উপর সবুজের হাসি হয়ে কেমন ফুটে আছে তা দেখুন। কিছুদূর দেখার পরে চোখ যত দূরে নেবেন ততই ফুল শুধু ফুল ; মনে হচ্ছে না যে দিগন্ত যেন ফুলের মোড়কে নিজের দেহখানিকে থরে-বিথরে সাজিয়ে তুলেছেন ?'

অতিথির মোহময় চোখের তারায় যেন ততক্ষণে কোটি কোটি কচুরিফুলের প্রতিফলন দেখতে পান। তিনি চোখ ফেরাতে পারছেন না, চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেছেন। আমি বলব, 'এই বর্ষাকালে জলের গভীর ঢেউকে হৃদয়ের অতলে উথাল-পাথাল শুষে নিয়ে এই কচুরিপানাদের জীবন যেমন ফুলসম্ভারে সুন্দর, জলের স্বল্প দোলদোলানিতে যেমন মনোগ্রাহী ঠিক তেমনি এরাই, এই সব পানারা জল সরে গেলে ভিজে জমির মধ্যে গুচ্ছ গুচ্ছ শিকড় প্রবেশ করিয়ে দিয়ে এমনই ফুলসাজে ধরণীর বক্ষটিকে সাজিয়ে রাখবে। কচুরিপানারা এখনও নরম, তখনও নরম থাকবে। তফাৎ এই যে ধরণী-পৃষ্ঠে বিগত-বর্ষাজীবন পানারা শিশু-কিশোরদের অত্যন্ত আদরের বস্তু হয়ে উঠবে। ওদের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে পট্-পট্ করে ওদের 'পেট' ফাটবে, হাতে তুলে নিয়ে দু'হাতে থাপ্পড় দিলে 'ফট্ফট্' করে ফাটবে। ক্ষীণ শব্দে কচুরিপানার প্রাণ ত্যাগে বাল্যকাল, বাংলাদেশের মাঠে-ঘাটে-বাটে, মুখরিত থাকে। এবং অবশ্যই এখনও।

বহু পরীক্ষিত প্রক্রিয়ায় সুকৌশলে নৌকোকে পানা-পুরী মুক্ত করে আবার আমরা টলটলে জলে ভেসে পড়লাম। রাস্তা ছেড়ে ধানজমির মাঝ-মধ্যিখানের সিঁথির মতো সরু জলে পথ খুঁজলাম! কোণাকুণি গ্রামের পথে পথকে ছোট করা যে উদ্দেশ্য ছিল তা নয়, অতিথিকে বৈচিত্র্যের স্বাদ দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। নৌকোর ডালিতে ধানগাছের পুষ্ট দেহ যখন স্‌স্‌-স্‌স্‌ করে ঘষা খেয়ে খেয়ে সরে সরে যায় তখন নৌকোর মধ্যে শস্য-শীর্ষরা যে উঁকি দেয়, ঝুঁকে প'ড়ে যাত্রীদের সন্ধান নেয় আর অট্টহাস্যে হেলেহেলে দুলেদুলে পিছনে চলে যায় তা দেখানোই আমার মনের বাসনা ছিল। ক্ষেতের মালিক

টের পেলে কচুরিপানার দামের নিচে যে চিরতরে পুঁতে ফেলবে তা আমার জানা কারণ শস্যের বড্ড ক্ষতি হয়। দ্রুত বেরিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত মনের পকেটে পুরেই ঢুকে গেলাম। এবং একটু দূরেই পথ করে আবার বাইরে, খালের টলটলে জলে বেরিয়ে এলাম। অতিথি বলবেন, 'এমনটি আর জন্মজন্মান্তরেও দেখতে পাব না ; এই যে ধানগাছের কাণ্ড-শীর্ষের সঙ্গে নৌকোর আলিঙ্গন, নৌকোর হৃদয়ের অভ্যন্তরে উঁকিঝুঁকি অনুসন্ধান, শান্ত নিঃশব্দ প্রকৃতির সংসারের মাঝখানে এই যে দেহে-মনে-প্রাণে এক গান একতা এ-যেন এক অবিস্মরণীয় অনুভব।' আমি খুশি হয়ে বলব, 'এই জন্মেই আপনি বার বার আসুন আর এই গান, এই মিতালি, এই অনুভবকে বার বার নিজের করে নিন। আর জন্মান্তরেও বাংলার মাঠে-জলে ঘেরা কোনও পরিবারে চলে আসুন। তাহলে তো আর ক্ষোভের কোনও কারণ থাকবে না!' অতিথি নিজের মধ্যেই তখন বোধহয় হারিয়ে যাবেন আর অস্ফুটে তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসবে, 'বাংলার মাটি বাংলার জল···ধন্য হউক ধন্য হউক হে ভগবান!' নীরবে ওঁর মুখের উদ্ভাসটুকুকে উপলব্ধি করতে করতে ধীর গতি তরী চালাব। যেন স্থির জলের নিশ্চল সবুজের ছায়ায় থেমে থাকবে দুটি প্রাণ, একটি নৌকো ; আর একটি শান্ত প্রতিফলন ; জলের বুকে আমাদের মৌন উপস্থিতির প্রতিফলন—আমরা আর আমাদের ছায়া, আমাদের প্রতিচ্ছবি।

আমার হাতের বৈঠা হাতেই ধরা থাকবে, তরীখানা আপনমনে ক্ষীণ স্রোতে চলবে কিন্তু মনে হবে যেন স্থির নিশ্চল ছবি হয়ে আছে। আমার দৃষ্টি অতিথির দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ফিরবে। একটা গঙ্গা ফড়িং আমাদের কাছেই সবুজ-ডাঁটি এক না'ল ফুলের মাথা ঘিরে স্থির উড়তে থাকবে। থালার মতো, জলের বুকে, বৃন্তের কাছটিতেই, গোল পাতাটি জলতলে পিঠ রেখে নিথর ভেসে থাকবে। অতিথির চোখে একটা ফড়িং-ই দু'টো হয়ে দেখা দেবে, একটা তার আকাশে উড়বে অন্যটি জলের গভীরে ছায়া হয়ে ডুব ডুব ভেসে থাকবে। আর তৎক্ষণাৎ তাঁর দৃষ্টি যাবে এখানে ওখানে কাছে দূরে সর্বত্রই। তিনি বোধহয় দৃষ্টি ভোজের অতলে হারিয়ে যাবেন। শাপলা ফুলের বৃন্ত দু'টি, পাতার পিঠে পিঠ লাগিয়ে পাতাও দু'টি, ঘাসের যে শিষটি বর্শার ফলার মতো আকাশে তীক্ষ্ণ মাথাটি তুলে বিশ্বপ্রকৃতিকে শাসনে উদ্যত সেও কেমন

জলের গভীরে নিজেরই ছায়াটিকে তীক্ষ্ন করে জলতলের জীবনকে একইভাবে শাসন করে চলেছে। একটি নয়, শত শত জলজ-ঘাসের নিটোল সরু দেহগুলো একইভাবে জলতলের শান্তি রক্ষায় যেন মৌন অনড় প্রহরীর মতো নিশ্চল। তারই এপাশে ওপাশে এধারে সেধারে দু'চারটি পোকা-মাকড় তাদের সরু সরু পায়ের পিছল দীর্ঘ পদচারনায় সামান্য একটু একটু ripple তুলে ছুটোছুটি করছে। স্তব্ধ নিথর, আকাশ-নীল সবুজ-জলতলে ঐ ঊর্মি-ঊর্মি জীবন লক্ষণ যেন মনের স্বচ্ছ আয়নায় একটুখানি তির তির প্রাণের সঞ্চার। খুব মনোযোগ দিয়ে না দেখলে যেন সেই স্পন্দন বোঝাই যায় না। তরুণীর নিটোল দেহে সদ্য-শিহরণের মতো। অনুভবে সংবেদ্য, প্রত্যক্ষে নয়। পোকাগুলো অত্যন্ত দ্রুত জলের বুকের উপর দিয়ে ছুটে ছুটে চলে যায়, থেমে যায়, ঘুরপাক খায়, আবার প্রাণের আনন্দে যেন ছুটোছুটি লাগিয়ে দেয়। বিরাটের প্রশস্ত বক্ষে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনের সতেজ চলাচলের গতি যেন আলোর মৃদু মৃদু ঝিলিক হয়েই উছলে উছলে পড়ে, উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। এদের মধ্যে আবার এক রকমের পোকা আছে যারা একই স্থানে ডন-বৈঠক করতে থাকে, যেন প্রায়-অদৃশ্য শরীরের স্বাস্থ্যচর্চায় বোধিলাভের বাসনা। এরা চঞ্চলতা প্রকাশ করে না, দৌড়-ঝাঁপে এদের প্রবণতা নেই। মনে হয় অনুশীলনের তন্ময় চেতনাই এদের মূলমন্ত্র। দেখে মনে হতে পারে হঠযোগী, অবধূত বা তান্ত্রিক। জলের মহাসাগরে যেটুকু সবুজের আসন পেয়েছে সেখানেই পদদ্বয় স্থাপন করে দার্শনিক নিবিষ্ঠতায় সাধনায় মগ্ন।

আবার এই হঠযোগী জলপ্রাণীদের একেবারে বিপরীতও আছে। এই-আছে-এই-নেই করে হঠাৎ হঠাৎ দীর্ঘজলতলে শুধুমাত্র ক্ষণিক পদচিহ্ন রেখে রেখে এক পাতার আড়াল ছেড়ে চপল চঞ্চল দ্রুততায় বহুদূরের অন্য পাতার আড়ালে চলে যায়, ছুটে যায়, হারিয়ে যায়। একেবারে বালখিল্য এদের আচরণ এদের চলন। এদের ছুটন্ত চরণ জলকে স্পর্শ করে বলে মনেই হবে না; কিন্তু স্পর্শ করে কারণ অতি-ক্ষুদ্র প্রায়-অদৃশ্য বৃত্ত-বৃত্ত ঊর্মি-চিহ্ন রেখে যায়। হতে পারে সেই ঊর্মি-চিহ্ন ওদের পদ-আঘাতে ঘটে না। বাতাসের আন্দোলনে সৃষ্টি হয়! ছুটে যায় ছুটে আসে। সোজা যায়, কেউ যায় বাঁকা পথে। ওরা যেন কানা-মাছি খেলে জলের শান্ত বুকের প্রিয় স্পর্শটুকুকে পায়ে মেখে মেখে। স্থির অচঞ্চল জল, উপরে স্থির অচঞ্চল আকাশ। মাঝখানে

এই প্রাণের মত্ত-পাগল লীলা-খেলা যেন মনকে অবশ করে দেয়, দেখা যেন আর শেষই হতে চায় না, গৃহ যেন আর ঘরে ফেরার ডাকটি মনের দ্বারে পেঁছে দিতেই পারে না।

আমরা দু'টি প্রাণী যেন অনেকক্ষণই হারিয়ে গেছি। হারিয়ে গেছি একে অপরের কাছে। হারিয়ে গেছি নিজের কাছে, নিজ নিজ অন্তরের অতলে যেন আমরা নিরুদ্দেশ। আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে? না কথা হারিয়ে গেছে? জলের এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত দেখা যায় না, উপরে নীল আকাশ যেন ধনুকের মতো অখন্ড মন্ডলাকারে আমাদের ঢেকে রেখেছে। সেই আকাশে সূর্যের আলো, সেই আলোতে নাল ফুলেরা উৎকর্ণ ঊর্ধ্বমুখ হয়ে যেন কাকে চুম্বনের মতো করে কাছে পেতে চাইছে। শত শত কচুরিপানার হৃদয় উদ্ভিন্ন করে সাদা-বেগুনী ঝাঁক ঝাঁক সিক্ত-ওষ্ঠ পাঁপড়িগুলো উতলা হয়ে বাতাসের সঙ্গে কম্প্র-বক্ষ মিতালি করে চলেছে! পোকা-মাকড়ের ছুটোছুটি যেন আলোর ঝিলিক হয়ে হয়ে জলের, সবুজের, আকাশের আর আলোর জগতে প্রাণের বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে। শতবার দেখা বাংলার এই আ-সমুদ্র প্রশস্ত জলজীবন আর একবার দেখে আমার মন যেমন তন্ময় হয়েছিল ঠিক তেমনি আমাদের অতিথির জীবনে এই প্রথম দর্শন যে কতোখানি গভীর আত্মস্থতার জন্ম দিয়েছিল তা অনুভব করে তাঁকে আর বাধা দিলাম না। তাঁকে হারিয়ে যেতে, নিঃশেষে মুছে যেতে সময় দিলাম। নৌকোর হালে বসে বৈঠাখানা অনেকক্ষণই কোলের উপর আড়াআড়ি রেখে বসেছিলাম। অতিথি অপর প্রান্তের চরাটে বসে অচঞ্চল দৃষ্টি জলশোভা দেখছিলেন। হঠাৎই ঝুঁকে পড়ে জলের গভীরে আমাদের দেখতে পেলাম। চিত্রার্পিত, একটা নিশ্চল ছবি। জলের মধ্যে বৈঠা কোলে আমারই আমিটি যেন আমার দিকে সাগ্রহ অপলক। ও-প্রান্তে পাথর মূর্তি অতিথিটি যেন জল-ছবি হয়ে স্থির হয়ে আছেন নৌকোর নিচে। তাঁর অচঞ্চল ছায়া-দেহখানির চারপাশে, ভিতরে, সর্বত্র, সূক্ষ্মদেহ ক্ষীণ-পদ কীট পতঙ্গরা তির-তির নড়াচড়া করছে। অতিথির ভ্রূক্ষেপ নেই!

সময় হিসেব হারিয়ে ফেলেছে। আমরা আমাদের হারিয়ে ফেলেছি। হঠাৎই প্রাণের সাড়া জাগিয়ে একটি জল-সাপ এঁকেবেঁকে নিরুদ্দেশ গন্তব্যে যাবার মুখে আমাদের নৌকোর কাছে এসে হয়তো থেমে যাবে। সেই সাপের উপস্থিতির কারণে সড়কের স্বল্প জলে মাছেদের ছুটোছুটি লেগে যাবে। চাচা

আপন প্রাণ বাঁচা-র তাড়নায় জলে গতির তরঙ্গ তুলে ল্যাজের ঝাপটায় জল ছিটিয়ে অপেক্ষাকৃত বড় মাছের দল ছুট দেবে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। দীর্ঘ দেহখানি জলমগ্ন সড়কের ঢালে শায়িত রেখে স্তব্ধ পাথরের প্রাণহীন নীরবতায় আমাদের সেই সাপটি নিজের মাথাটি শুধু জলের উপরে স্থির ধরে রাখবে। শিকারের সন্ধানে ক্ষুধার্ত সর্প ঘন ঘন জিভ নাড়বে। তার সেই লকলকে জিভের বিদ্যুৎগতি নড়াচড়ায় তার উত্তেজনার পরিমাপ করা যাবে। আবার কখনও বা কোনও সন্ধানী সাপ তার লিকলিকে কালো-বুটি দেহখানি কচুরিপানার সবুজে শুইয়ে রেখে সম্ভাব্য শিকারের খোঁজে প্রায় গতিহীন অগ্রগতিতে সামনে টেনে টেনে আনবে। শান্ত প্রকৃতির সুন্দরের প্রকাশে বাধা পড়বে। আমরা দেখব, অতিথির চোখে পড়বে। মনের মধ্যে একটা ছন্দ পতনের অনুভব বেদনার জন্ম দেবে। তাই হয়তো অতিথি বলবেন, 'আর নয়, সুন্দরের অপমৃত্যু আমার ভাল লাগবে না। মনোরম সুষমাটির বক্ষে বাস্তবের ছোবল বিষ ছড়ানোর আগেই চল আমরা এখান থেকে সরে যাই।' আমি বলব, 'তাই চলুন'।

সড়ক ছেড়ে আমরা ফাঁকা জলের বুকে বৈঠার ঘূর্ণি তুলব। নৌকোয় বেগ আসবে, জলে গতির আঘাতে গোল গোল পাক ধরবে। বৈঠার তাড়নায় শান্ত জলের বুকে ঘূর্ণি-বৃত্তগুলো ক্রমশই চিহ্ন চিহ্ন হয়ে দূর থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে। আলাদা আলাদা, একা একা, সেই সব জল-বৃত্তরা ছোট ছোট ঘূর্ণি থেকে বেড়ে বেড়ে বড় বড় বৃত্ত হয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাবে! বহমান তরীর পিছনে furrow-র জল-রেখা আমাদের ধরার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে যেন ধেয়ে ধেয়ে ছুটবে। সামনের গলুই-এর নিচে আবার কুলকুল শব্দ ধ্বনিত হবে, ধরা দেবে। আমরা আমাদের বাড়ির পাশে পুকুর ধারে হিজল গাছের কাছটিতে এসে আবার থেমে যাব। গাছের একটা ডাল ধরে নৌকোখানিকে গতিহীন থামিয়ে দেবো। অতিথি বলবেন থামালে কেন? থামলে কেন? আমি বলব কারণ আছে; বলুন তো কেন? আবিষ্কার করতে পারেন কেন থেমেছি? আমি মিটিমিটি হাসতে থাকব। অতিথি চারধারে নজর বুলিয়ে বুলিয়ে ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়বেন।

শীতকালে দেখেছেন আমাদের প্রশস্ত ভিটের উপর সাত সরিকের বাড়ি। এই পূর্বদিকে দেখেছিলেন প্রস্থে ও দীর্ঘে সমান টানা বিরাট পুকুর পাড়,

পাড়ের চারদিকে হিজল গাছের সারি। দেখেছিলেন সুপরিসর পতিত জমি, পতিত জমিতে চরে বেড়ানো গরু-ছাগলের পাল। তারপরে ছিল ধানের ক্ষেত। অতিথিকে স্মরণ করিয়ে দেবো এবং বলব, 'মনে পড়ে ?' তিনি ঘাড় নাড়বেন। কিন্তু এখন সে সব কোথায় ? বাড়ি আছে আবক্ষ জলের মধ্যে, হিজল গাছগুলো তো আকণ্ঠ জলমগ্ন আকাশ-ছাতা, ঝাঁকড়া-মাথা বেঁচে আছে। পুকুরের চিহ্নমাত্র নেই, পাড় অদৃশ্য, পতিত জমিতে জলজ উদ্ভিদ, না'ল পাতা আর ইতস্তত ছড়ানো দু'চারটে কচুরিপানা ভেসে আছে আকাশের নীলের খোঁজে। এখানে ওখানে জলজ-ঘাসের সাদা সাদা ফুল, দুধে-আলতা শাপলা ফুল আর পুঞ্জ পুঞ্জ পানা-ফুলের নয়ন ভোলানো সমাহার দেখা যাচ্ছে। এবং তারও পরে ধানের সবুজ-ক্ষেত। আমি বলব, কত যত্নে প্রকৃতিদেবী, বাংলার বর্ষাপ্রকৃতি, এই শ্বেত-শ্যামলের ফুলকাটা অঙ্গাভরণটি ধীরে ধীরে বয়ন করে চলেছেন তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ? টলটলে দিঘি-পাড় শাড়িখানির শ্যামল অঞ্চলে বিচিত্র-বিভিন্ন পুষ্প বয়ন কারুকার্য ? বয়ন শৈলীতে মসলীন, যত্নে মসৃণ, কৌশলে সুনিপুণ এই বঙ্গ-বর্ষার সুডৌল দেহ-আবরণটি কি আর কোথায়ও কোনদিনই সম্ভব ?

অভিভূত অতিথিকে নিয়ে গৃহাঙ্গনে নৌকো ভিড়াবো। মৌন মনে অনুভবেব সম্ভার নিয়ে তিনি ধীর পায়ে গৃহমুখী হবেন। তরীকে দেব দড়ির বাঁধন, পাড়ের শাসন!

বাংলাদেশের মানচিত্রে যেমন নিচু এলাকা আছে তেমনি আছে উঁচু এলাকা। আছে নদীর এপাড়ের খাড়া-ঢিবি-গ্রাম, ওপারে চরের জীবন। বর্ষা তাই বৈচিত্র্যে মনচিত্র ভরিয়ে দেয়। ঘোনাপাড়া-ভাটিয়া পাড়ার নদী-নদীসঙ্গমে বর্ষাকাল দুকূলের আদিগন্ত প্রসার ঘটিয়ে মনকে ভাবুক আর উদাস করে দেয়। নদীর স্রোতে সারি সারি নৌকো ভেসে ভেসে গন্তব্যে যায়। কোনওটা থেকে তোলা উনুনের ধোঁয়া আকাশের বুক চিরে উপরে পিছনে সরে সরে যায়। কোনওটা থেকে গানের সুর ভেসে নদীর চলমান জলে ঘা খেতে খেতে আন্দোলিত হয়ে হয়ে পাড়ের কানে মধু ছড়ায়। কখনও স্টিমারের যান্ত্রিক দৈত্য-গতি নদীকে অকারণে তোলপাড় করতে করতে ছুটে যায়। ওপাড়ের চর-জীবন কিছু মাত্র দেখা যায় না কারণ চরের সমস্ত দেহটিকেই জলে ঢেকে রাখে। আকাশ মিশে যায় জলের সঙ্গে, মাঝখানে

সূক্ষ্ম তুলির টানের মতো গ্রামের সবুজকে তখন ধূসর দেখায়।

আবার যে সব গ্রাম মাজড়া কাশিয়ানীর মতো অত্যন্ত উঁচু জমিতে নিজ নিজ বিস্তারকে শতেক বৃক্ষরাজির বৈচিত্র্যে আড়াল করে রেখেছে সেখানে বর্ষাকাল অবশ্যই মন-কেমন করার সময়। বৃষ্টির জল নালা বেয়ে বেয়ে নিচু জমি খুঁজে নেয়, ঐ সব গ্রামের পদতলে অপেক্ষা করে না। তাই বনজঙ্গল বেড়ে যায়, সবুজ হয় সবুজতর, গাঢ়, উজ্জ্বল এবং ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া। এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাতায়াতে সেখানে নৌকোর স্থান নেই। কাদা-প্যাচ-প্যাচে মেঠো পথ, মাটির সড়ক আছে মাত্র। এ-ঘর ও-ঘর করতে সকলেরই কষ্টের সীমা থাকে না। দাওয়ার মাটি ধ্বসে যায়, উঠোনে শ্যাওলা জমে, চালার ছিদ্র দিয়ে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে মনকেও স্যাঁতস্যাঁতে করে দেয়। বর্ষা সেখানে বিরহের কাল।

বর্ষাসুন্দরীকে দু'চোখ মেলে দেখতে হলে তাই সাজাইল-তারাইল রাইতকান্দি-সোনাকান্দি যাবেন। এ কথাটি সকল শহর অতিথিদের মনে রাখা চাই। তাছাড়াও ফাল্গুন চৈত্রে যাবেন পেলব প্রকৃতির মোহন রূপের পাশাপাশি রুদ্র-দানব প্রকৃতির কালবৈশাখীর ধেয়ে-আসা তেড়ে-আসা মসিকৃষ্ণ স্বভাবটিকে উপলব্ধি করতে।

আর যদি আধুনিক জীবনের খোলস-অস্তিত্বে কখনও অন্তরের শূন্যতাকে ভরাট করতে ইচ্ছে হয়, যদি শহর জীবনের প্রাত্যহিক সংগ্রামের ফলে প্রাণ ধারণকে গ্লানিময় বলে মনে হয় তাহলে যেকোনও সময়েই গ্রাম বাংলায় যেতে পারেন, যাবেন। কিছু না কিছু সংগ্রহের মতো খুঁজে পাবেন! সেই সংগ্রহকে মনের গভীরে স্মরণের মণিকোঠায় জমা করে দ্বিতীয় শৈশবের প্রাণহীন জীবনে কাজে লাগাবেন ; চলৎ-শক্তিহীন তখন মনচিত্রের স্পর্শে মনকে অন্তত সচল রাখতে পারবেন। লোককে যেমন ভূতে পায়, নিশিতে পায়, তেমনি বার্ধক্যকে কথায় পায়! তাঁদের কথা কেউ শোনে না তবুও তাঁরা কথা বলেন। অপরের বিরক্তি উদ্রেককারী এই কথা-সর্বস্বতা থেকে মুক্তির পথ? সেই পথের দিক্‌নির্দেশ রইল ঐ মনচিত্রে মন দেওয়ার মধ্যে। ছবি দেখতে কথা বলা লাগে না। চোখ লাগে, মন লাগে, অন্তর লাগে।

সময় থাকতে তাই এক-আধবার ঘুরে আসুন। পদযাত্রায় যদি নাই-বা হয় মন-যাত্রায় ঘুরে আসুন। দু'চার টুকরো ছবি আমাদের জন্যে আনতে ভুলবেন না—আমার জন্যে, আমাদের জন্যে, আমাদের সকলের জন্যেই।

———

এই লেখকের অন্যান্য বই

এবং ভাঙ্গাকুলো : পঞ্চাশোর্ধ্বের বর্জ্য অবস্থানে চিন্তাচেতনাকে ঝাঁকুনি দেওয়া অনুভবের অনুপুঙ্খ কিন্তু পীড়াহীন রম্য উপস্থাপনা। তপ্ত বিশ্লেষণ, জ্বলন্ত। কিন্তু আলো দেয় ছ্যাঁকা দেয় না।

এবং তুমি : ছোট-বড় চরিত্র চয়ন এবং চিত্রণে সনাতন মানবিকতার সংবেদ্য আতসকাচটি পাঠকের চোখের সামনে ধরা। তাই যা দেখেও দেখতে পাই না তাও যেন সটান সামনে আনন্দ বেদনার উজ্জ্বল বিন্দু হয়ে টল টল করে ওঠে।

এবং প্রেম-অপ্রেম : কাছের, দূরের ব্যক্তিজীবন হঠাৎ হঠাৎ স্পর্শের ঝলকে স্মরণ-সংগ্রহ হয়ে ওঠে। আমাদের মনের চলমান বর্তমানে সেই ছোঁয়াটুকু মাঝে মাঝেই ঊষাকিরণের অনুভব জাগায়। সেই সব অনুভবের বর্ণছবি, বর্ণমালায় আঁকা ছবি।

এবং ভূত : উদ্দেশ্য কিশোর কিশোরী; বিধেয়? পড়ুন তো জানুন!